বিদ্যাসাগর
ও বাঙালী সমাজ

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগর

ও বাঙালী সমাজ

তৃতীয় খণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক—শ্রী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদ
শ্রী সত্যজিৎ রায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

বারো টাকা

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' তৃতীয় খণ্ডেই শেষ হল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের সামাজিক ইতিহাসই হল এর পশ্চাদ্‌ভূমি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মজীবন এই সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভারত-সরকারের জাতীয় মহাফেজখানা (National Archives of India, New Delhi), পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষাবিভাগ ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত অনেক নতুন তথ্য বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের উপর নতুন আলোকসম্পাত করেছে। এই তথ্যাদির সংকলনে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

উনিশ শতকের বাংলা-ইংরেজী সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র থেকেও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেছি। সমসাময়িক ঘটনাবিচারে এই সব উপকরণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি দিয়ে উনিশ শতকের বাংলার এই সামাজিক ইতিহাসের উত্থান-পতন, এবং বিদ্যাসাগর-জীবনের ধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য কতটুকু হয়েছি জানি না, তবে এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা প্রথম বলে সুধী পাঠকরা এর দোষত্রুটি মার্জনা করবেন।

স্বাধীনতা দিবস
কলিকাতা

বিনয় ঘোষ

বিষয়

চিত্র

১১ রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১২ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষের নিকট পত্র
১৩ উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের আবেদনপত্র ॥ বিপক্ষে
১৪ ইয়ংবেঙ্গল দলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে
১৫ সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও হিন্দুদের বিধবাবিবাহের আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে
১৬ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে
১৭ নবদ্বীপ-ভট্টপল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের বাঙালী পণ্ডিতদের আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ বিপক্ষে
১৮ মেদিনীপুরের আবেদনপত্র, রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রেরিত ॥ সপক্ষে
১৯ বেথুন স্কুলের ভিত প্রতিষ্ঠা উৎসব

লেখকের অন্যান্য বই

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (তিন খণ্ড)

জনসভার সাহিত্য

বাদশাহী আমল

কলকাতা কালচার

কালপেঁচার বৈঠকে

কালপেঁচার দুকলম

কালপেঁচার নক্শা

যন্ত্রস্থ

নতুন শহর নতুন সমাজ

সাময়িকপত্রে সেকালের সমাজচিত্র (কয়েক খণ্ড)

আলোকচিত্রগুলি শ্রীজয়ন্তকুমার দে পুরনো ছবি থেকে তুলেছেন। 'বিশ্বভারতী'র সৌজন্যে প্রাচীন দলিলপত্রের ব্লকগুলি পেয়েছি। দলিলপত্রের আলোক-প্রতিলিপি লেখক কর্তৃক National Archives থেকে সংগৃহীত।

১ | পদক্ষেপ

বাইরের সমাজ-জীবনে যখন ঘটনার খরস্রোত বইছিল, ১৮৪১-৫০ সালে, তখন বিদ্যাসাগরের চাকুরিজীবনের দিনগুলি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা ও অবসর খানিকটা পরিমাণে না থাকলে তখনকার সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সহজ ছিল না। ইয়ংবেঙ্গল দলে বা ব্রাহ্মসমাজে কোথাও বিত্তহীন অসহায় যুবকদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। কাগজে-কলমে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে ছিল না। বিদ্যাসাগরের মতন অসহায় যুবকরা কতকটা বাইরের দর্শকের মতন সামাজিক ঘটনাক্রম লক্ষ্য করতেন। তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার সময় তখনও তাঁদের হয়নি। বিদ্যাসাগরেরও হয়নি। সংকীর্ণ চাকুরিজীবনের চার-দেয়ালের সীমানার মধ্যে থেকেই তিনি বাইরের লোকজীবনের কোলাহলের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। নির্লিপ্ততা তাঁর কাম্য ছিল না কোনদিন। তাই চাকুরিজীবনকে তিনি শেষ পর্যন্ত চার-দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। ধীরে ধীরে সামাজিক কর্মজীবনে তাকে রূপান্তরিত করেছেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্ররা মধ্যে মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার আদান-প্রদান হত পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যে। পুব-পশ্চিমের ভাবসংযোগের

অন্যতম কেন্দ্র ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। উনিশ শতকের সূচনা থেকেই সেখানে এই সংযোগ ও বিনিময় আরম্ভ হয়েছিল। বিদেশী সিবিলিয়ান ছাত্রদের সান্নিধ্য বিদ্যাসাগরের জীবনেও ভাব-বিনিময়ের সুযোগ এনে দিয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তরুণ সিবিলিয়ানরা কেবল তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সকল বিষয়ে যে আলোচনা করতেন তা নয়, তাঁকে দিয়ে নিজেদের নামে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়ে নিতেন। রবার্ট কস্ট নামে এক সিবিলিয়ান ছাত্র সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখেছেন : [১]

> ১৮৪২ খৃষ্টীয় শাকে, রবার্ট কষ্ট নামে, একটি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব সিবিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। আমি, সেই সময়ে, ঐ কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ হইলে, তিনি মধ্যে মধ্যে, কলেজে আসিয়া, আমার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সুশীল ও সৎস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, আমি সাতিশয় সুখী হইতাম। একদিন তিনি বিলক্ষণ আগ্রহ-প্রদর্শন পূর্ব্বক, সবিশেষ অনুরোধ করিয়া, আমায় বলিলেন, যদি তুমি, আমার বিষয়ে, সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হই। তদীয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি নিম্নমুদ্রিত শ্লোকদ্বয় তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি শ্লোক লইয়া, প্রফুল্ল চিত্তে প্রস্থান করিলেন।
>
> শ্রীমান্ রবার্ট কষ্টোঽস্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
> সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতবাং মামতোষয়ৎ॥
> স হি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
> প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী॥

বাইরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এইভাবে তাঁর দিন কাটত। বাড়িতেও তিনি ইংরেজীশিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদের সংস্কৃত শিক্ষা

দিতেন এবং নিজে তাঁদের কাছে ইংরেজী শিখতেন। বিদ্যাসাগরের চাকুরি-জীবনের এই প্রথম পর্বটিকে তাঁর নিজের জীবনের পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার লেনদেনের উদ্‌যোগপর্ব বলা যায়। যুগোপযোগী জ্ঞানার্জনের ফলে এই পর্বেই বিদ্যাসাগরের মানসিক ভিত গঠিত হয়েছিল বললে ভুল হয় না।

চাকরি করেও অবশ্য বিদ্যাসাগর কোনদিন তাঁর সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা করেননি। চাকুরিগতপ্রাণ তিনি কোনদিন ছিলেন না, তাই কেবল স্বার্থের ধান্ধায় কালাতিপাত করতেন না। তাঁর মতন দরিদ্র চাকুরিজীবীর পক্ষে তাই করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা কোনদিন তাঁকে বৃহত্তর মানবিক কর্তব্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত করতে পারেনি। প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যেও তিনি সেই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন। সংস্কৃত কলেজের পূজনীয় শিক্ষকদের সেবা-শুশ্রূষা করা, আদেশ পালন করা, অগ্রজ ও অনুজতুল্য বন্ধুবান্ধবদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, বিপদে-আপদে প্রতিবেশীদের যথাসম্ভব সাহায্য করা, এ-সব তাঁর চাকুরিজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক অতিরিক্ত কাজ ছিল। চাকুরি তাঁকে নিছক যন্ত্রে পরিণত করতে পারেনি।

তাঁর এই অতিরিক্ত কাজের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ১৮৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রের মতন স্নেহ করতেন। অসুখের খবর পেয়ে তিনি দুজন ডাক্তার সঙ্গে করে তর্কবাগীশের বাড়ি যান। দুজনেই তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার, একজন নবীনচন্দ্র মিত্র, আর-একজন তাঁর বিশেষ বন্ধু, তালতলা-নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা)। তিন দিন ধরে সারাক্ষণ তিনি তাঁর পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেন। গঙ্গাধরের পুত্রকন্যারা কেউ সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। ছাত্রদের মধ্যে দু-চার জন যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুধু দর্শকই ছিলেন। সংক্রমণের ভয়ে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষেননি। বিদ্যাসাগর কেবল গুরুর প্রতি ছাত্রের কর্তব্য করার জন্য যাননি, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের জন্য গিয়েছিলেন। এই প্রখর মানবিক কর্তব্যবোধ আজীবন তাঁর মধ্যে সজাগ ছিল।

তর্কবাগীশের মৃত্যুর কিছুদিন পরে পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে, তাঁর ভাগনে ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কলেরা হয়। তখনকার দিনে কলেরা হলে রোগীর সেবা না করে ঘরের এককোণে সরিয়ে রাখা হত। অনেকে ঘরের বাইরেও রোগীকে রাস্তার ধারে শুইয়ে রাখতেন। মৃত্যু নিশ্চিত, এবং রোগ সংক্রামক জেনে, কেউ রোগীর পরিচর্যা করতেন না। তর্কপঞ্চানন মশায়ও ভাগনেটিকে ঘরের এককোণে দরমা পেতে শুইয়ে রেখেছিলেন। ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে খবরও দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ডাক্তার-বন্ধু দুর্গাচরণকে নিয়ে নারকেলডাঙ্গায় যান এবং রোগীর সেবা ও চিকিৎসা করতে থাকেন। তাঁর মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বহুবাজারের বাসা থেকে, তাঁর আদেশে বালিশ-তোশক-মাদুর মাথায় করে নিয়ে নারকেলডাঙ্গায় আসেন। অল্পদিনের মধ্যে রোগীও সুস্থ হয়ে ওঠে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতে করতে বিদ্যাসাগর এই সব কাজও করতেন। তিনি তাঁর নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে লোকদের শিক্ষা দিতেন। তিনি মানুষের সেবা করতেন কেবল নিজের সেবাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য নয়, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের লোকের মনে স্বাভাবিক ও সুস্থ সমাজবোধ জাগিয়ে তুলবার জন্য। নিজের পদোন্নতির চিন্তা করাই চাকুরিজীবনের একমাত্র কাজ হবার কথা। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তা করেননি। কখনও করেননি এমন কথা বলা যায় না। যখন করেছেন তখন বৃহত্তর কর্তব্যের জন্য উন্নত পদের মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা দাবি করেছেন। চাকুরিজীবনে নিজের চাকরির চেয়েও পরের চাকরির জন্য তিনি কম মাথা ঘামাননি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নয়, সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময় তাঁর এই মাথাব্যথা প্রায়ই দেখা যেত। এখানে তাঁর প্রথম চাকুরিজীবন প্রসঙ্গে এই ধরনের দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করব।

১৮৪৪ সালের কথা। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যুর পর শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবকে উক্ত পদে

একজন যোগ্য পণ্ডিত মনোনয়ন করে দিতে অনুরোধ করেন। মার্শাল সাহেব উক্ত পদ বিদ্যাসাগরকে গ্রহণ করতে বলেন। বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হন না। তিনি বলেন, "আমি তো একটা চাকরি করছি। আমার চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন, যাঁকে আপনি স্বচ্ছন্দে ঐ পদে নিযুক্ত করতে পারেন।" পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম তিনি প্রস্তাব করেন। তারানাথ তখন স্বগ্রাম অম্বিকা-কালনায় নানারকমের স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর বংশগত শাস্ত্রব্যবসায়ও ছিল। কালনায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন তারানাথের নাম প্রস্তাব করেন তখন মার্শাল সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি চাকরি করতে রাজী হবেন কিনা সেটা আগে জানা দরকার। সেইদিনই বাসায় ফিরে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র হাটখোলার গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে পায়ে হেঁটে কালনা রওনা হন। পরদিন কালনায় পৌছে তিনি বাচস্পতি মহাশয়কে চাকরি গ্রহণ করতে রাজী করান এবং তাঁর প্রশংসা-পত্রাদি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। মার্শাল সাহেব তাঁর নাম অনুমোদন করে পাঠান। ১৮৪৫ সাল থেকে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মাসিক নব্বুই টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এই সময় ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ও পুস্তকাধ্যক্ষের দু'টি পদও খালি হয়। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত প্রস্তাব করেন যে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের ঐ পদে নিযুক্ত করা হোক। ময়েট সাহেব এ-বিষয়ে মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মার্শাল সাহেবের প্রধান পরামর্শ-দাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন। মার্শাল সাহেব তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর বলেন, "গ্রাম্য টোলের পণ্ডিতরা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতে পারবেন না। তাঁদের দিয়ে এ-কাজ ভালভাবে করানো যাবে না। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন যাঁদের নিযুক্ত করা উচিত।" মার্শাল সাহেব এই পরামর্শ দেন ময়েট সাহেবকে। ব্যাকরণের পরীক্ষা নিয়ে লোকনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথম এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৩২ সাল থেকে ১৮৪৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ১২ বছর ৭ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে, কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ নীলমাধব শর্মার মৃত্যুর পর, মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হন। মাত্র দেড় মাস তিনি গ্রন্থাধ্যক্ষের কাজ করেন। তারপর ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়ন করে ১৮৪৪ সালে জানুয়ারি মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, এবং প্রায় দু'মাস তিনি নিজে কঠিন রোগ ভোগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর চরম দুরবস্থা। গিরিশচন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র লিখেছেন : [২] "দুই এক মাস দেশে বাস করিয়া পিতৃদেব পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু তখন আর আয় নাই, টোলঘরে থাকিয়া কি খাইবেন, কিরূপেই বা খাজনা দিবেন; সুতরাং টোলঘরটি ছাড়িতে হইল। ছাড়িয়া যান কোথায়? দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং ৺হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে একটি বাসাগৃহে বাস করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেনঃ 'গিরিশ, ভাবিস না; যতদিন তোর কোন চাকুরি না হয়, আমার বাসায় থাক'।"

গিরিশচন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র লিখেছেন, "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।" তখন হরিশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্রের বয়স উনিশ বছর এবং বিদ্যাসাগরের বয়স চব্বিশ। বিদ্যাসাগর তখনও 'দয়ার সাগর' বলে পরিচিত হননি। 'দয়ার সাগর' বলে পরিচিত হবার বাসনাও অবশ্য তাঁর মনে ছিল না কোনদিন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁর অনুজতুল্য ও ছাত্রজীবনের বন্ধু। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও তাই ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে উভয়েরই চাকরি তাঁর পরামর্শেই হয়েছিল। অসহায় গিরিশচন্দ্রকে তিনি তাঁর বাসায় স্থান দিয়েছিলেন যে-কারণে, ঠিক সেই কারণেই অনাহূতের মতন অন্যের বাড়ি গিয়ে রোগীর পরিচর্যা করতেন। সেই কারণটি কি? সেই কারণ তাঁর গভীর সমাজ-

বোধ এবং মানবিক বেদনাবোধ। সামান্য বেতনে নিজের পোষ্যবহুল বাসার খরচ চালানো তাঁর পক্ষে তখন রীতিমত সমস্যা ছিল। তা সত্ত্বেও যে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন, "গিরিশ, তুই ভাবিস না, যতদিন না তোর কোন চাকরি হয়, তুই আমার বাসায় থাক,"—তার কারণ তাঁর মানবতাবোধ এত প্রখর ছিল যে সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধি কোনদিন তা মেঘাচ্ছন্ন করতে পারেনি। এ কেবল দয়ার প্রকাশ নয়, বদান্যতার বিলাসও নয়, মানুষের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা থেকেই এই বেদনা উৎসারিত। তা যদি না হত তাহলে বিদ্যাসাগরের মানবতাবোধ কেবল আত্মতৃপ্তির বালুচরে পথ হারিয়ে ফেলত, বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণকর্মে নির্ভয়ে বিলীন হয়ে যেতে পারত না।

ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন:[৩] "তর্কবাচস্পতি, বিদ্যা-ভূষণ ও বিদ্যারত্ন এই তিনজন উপযুক্ত লোক সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইলেন। দাদা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এ কারণ কৌশল ও অনুরোধ করিয়া, তিনজন উপযুক্ত লোককে কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব, মাসিক ৯০ টাকা বেতনের উক্ত পদ অগ্রজকে দিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকার না পাইয়া, বাচস্পতি মহাশয়ের দেশে গিয়া, তাঁহাকে অনুরোধ করাইয়া আনিয়া, কর্ম্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, ইহাতে বিষয়ী লোক মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।"

'বিষয়ী লোক মাত্রেই' ঈশ্বরচন্দ্রের আচরণে বিস্মিত হয়েছিলেন। হবারই কথা। বিষয়ী লোক তাঁদের বৈষয়িক বুদ্ধিকে অন্যান্য বুদ্ধির উপরে স্থান দেন। বিদ্যাসাগর তা দেননি। অথচ বিদ্যাসাগর বৈরাগী ছিলেন না, বৈরাগ্যসাধনে জীবনের মুক্তি তাঁর কাম্যও ছিল না কোনদিন। যে-কোন সুস্থ মানুষের মতন তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া আর্থিক সাচ্ছল্যের তাঁর প্রয়োজনও ছিল খুব বেশী। কিন্তু এ-সব থাকা সত্ত্বেও কোনদিন তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি বৃহত্তর সামাজিক ও মানবিক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

প্রায় পাঁচ বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটানা কাজ করবার পর

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করার সুযোগ পান। ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যালংকারের মৃত্যু হয়। শিক্ষা-কৌন্সিলের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব এর মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক সততার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রামমাণিক্যের শূন্যপদে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়োগ করবার প্রস্তাব করেন তিনি মার্শাল সাহেবের কাছে। মার্শাল সম্মত হন, এবং ঈশ্বরচন্দ্রও সন্তুষ্টচিত্তে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি যে আবেদনপত্রটি লিখে পাঠান তার খানিকটা অংশ এই :

Besides I have the honour to hold the office of Sheristadar of the Bengalee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the System of Sankhyha Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of education afforded by your College.

......This, together with my long connection with the College as a student has given me an intimate knowledge of the system of education pursued there, and inspires me with confidence that in any case my services are accepted I shall prove useful to the institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate

remuneration, and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties.

আবেদনপত্রটির এই অংশ উল্লেখযোগ্য তিনটি কারণে। প্রথম কারণ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঁচ বছর সেরেস্তাদারের চাকুরিজীবন ঈশ্বরচন্দ্র কিভাবে কাটিয়েছিলেন তার আভাস এই পত্র থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে এই সময় তিনি নিজের চেষ্টায় বিদ্যাচর্চা করে যতদূর সম্ভব জ্ঞান বৃদ্ধি করেছেন, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সাংখ্যদর্শন ও পুরাণশাস্ত্র পাঠ করেছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে এই সব বিদ্যাশিক্ষার কোন স্থযোগ তেমন পাওয়া যায় না এবং তিনিও পাননি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি সেই স্থযোগ পেয়েছেন এবং সাধ্যমতন তার সদ্ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় কারণ হল, এই পত্রের মধ্যে তাঁর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারের বাসনাও আভাসে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন যে সংস্কৃত কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন বলে সেই কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। সহকারী সম্পাদকের কাজ পেলে তিনি কলেজের শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে অনেক কাজ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। তৃতীয় কারণটি সাধারণ হলেও উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের যে স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধির কথা আগে বলেছি, সেই বুদ্ধিও তাঁর এই আবেদনপত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, সহকারী সম্পাদকের মাসিক বেতন অতি অল্প, কাজ এবং তার অনুরূপ দায়িত্বের উপযুক্ত নয়। তাই তিনি যোগ্য কাজের যোগ্য বেতনের জন্য আবেদন করতেও ভোলেননি। প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখ করেছেন যে বেতন না বাড়ালে তাঁর পক্ষে বর্তমান চাকরি ছেড়ে সংস্কৃত কলেজের চাকরি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পান, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের ধার্য বেতনও ৫০৲ টাকা। স্থতরাং আবেদনপত্রে বেতন-বৃদ্ধির জন্য চাপ দেবার স্থযোগ ছিল তাঁর। এই স্থযোগ তিনি ছাড়েননি। এ তাঁর স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয়, যা প্রকাশ করতে কখনও তিনি সংকোচ বোধ করতেন না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব তাঁকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। তাতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য গুণের প্রশংসা করে লিখেছিলেন : "On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character." প্রশংসাপত্রে তাঁর কাজ হয়েছিল। ১৮৪৬, ৬ এপ্রিল ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই সময় কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকারের মৃত্যু হয়। কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তের ইচ্ছা ছিল সাহিত্যের অধ্যাপকপদে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়োগ করেন। পরিচালনার কাজ থেকে তাঁকে অধ্যাপনার কাজে সরিয়ে দিতে পারলে হয়ত দত্তমহাশয়ের নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করবার সুবিধা হত। কিন্তু অধ্যাপক হওয়া নয়, শিক্ষা-সংস্কারক হওয়াই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যের জন্য তিনি সহকারী সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত থেকে তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারকে সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। মদনমোহন তখন কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন :[৪] "ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। আমি, বিশিষ্ট হেতুবশতঃ, অধ্যাপকের পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি।"

১৮৪৬, ২৭ জুন থেকে মদনমোহনই সাহিত্যের স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টেও ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহনের নিয়োগ সম্পর্কে লেখা আছে :[৫]

> The Institution has suffered severe loss by two casualties during the year, viz the death of Rammanikya Vidyalankar, the Assistant Secretary, in March, and

of Joygopal Tarkalankar, the Professor of Sahitya, in April last...

The vacancies however have been very satisfactorily filled up by the appointment of two of the most distinguished ex-students of this Institution, viz Ishwarchandra Vidyasagar to the post of the Assistant Secretary, and Madanmohan Tarkalankar to the Sahitya chair.

ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের ভাষায় 'বিশিষ্ট হেতুবশতঃ' তিনি সহকারী সম্পাদকের পদ ছেড়ে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে সম্মত হননি। বোঝা যায়, হেতু একটা কিছু ছিল। মার্শাল সাহেবের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন যে সহকারী সম্পাদকের কর্তব্যপালনের পথে বাধার সৃষ্টি হলে তাঁকে পদত্যাগও করতে হতে পারে। সেইজন্যই তিনি তাঁর সহোদর দীনবন্ধুকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর শূন্য পদে নিয়োগ করতে বলেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করা এইজন্যই ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। এতদিন তিনি সেরেস্তাদারের চাকরি করছিলেন এবং জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে আত্মোন্নতির চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। এবারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সামনে তাঁর শিক্ষাসংস্কারের বিস্তৃত পথ এবং সে-পথে বাধা অনেক। কিন্তু আদর্শ যাঁর কাছে বড়, বাধা তাঁর কাছে প্রেরণার পরোক্ষ উৎস ছাড়া কিছু নয়। এই বাধা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কারের দুর্গমপথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হলেন।

২ | প্রথম সংঘাত

গোলদীঘির সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের দীর্ঘ দ্বাদশ বছর কেটেছে, কৈশোরের স্বপ্নময় পরিবেশে পাশের হিন্দু কলেজও তখন ইয়ং বেঙ্গলের কোলাহলে মুখর। ছাত্রজীবনের শেষে বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে এসে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, এই দুই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, লালদীঘি থেকে গোলদীঘির এলাকার মধ্যে, তাঁর কর্মজীবনের চাকুরিপর্ব শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ রাজপ্রতিনিধিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত। সেখানে স্বাধীন চিন্তা ও উদ্‌যোগ প্রকাশের প্রেরণা তেমন কিছু ছিল না। সংস্কৃত কলেজ তা নয়। এদেশের লোকের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য জ্ঞানবিদ্যা প্রসারের আদর্শ নিয়ে এই বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার সংকল্প নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কর্মজীবনে অগ্রসর হলেন। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক, কোন আদর্শ বা সংকল্প নিয়ে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে চান, পদে পদে তাঁদের হাজার বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কেবল বাধা নয়, ব্যর্থ ও অকর্মণ্য প্রতিযোগীদের অনেক আক্রোশ, স্বার্থান্বেষী সাধারণের দীনতার অনেক দংশন তাঁদের সহ্য

করতে হয়। যাঁদের সহ্যগুণ অনেক বেশী তাঁরা এ-সব উপেক্ষা করে নীরবে কাজ করতে পারেন। যাঁদের সহ্যগুণ কম তাঁরা তা পারেন না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই সহ্যগুণের যে কিছুটা অভাব ছিল, তা তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। সংকল্প ও আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হননি বটে, কিন্তু বহুবার আঘাতে-দংশনে জর্জরিত হয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্যের পথ ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের কর্মজীবনের গোড়া থেকে শেষদিন পর্যন্ত এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করেছেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, মূঢ়তার প্রতিবাদ করেছেন, কোনটাতেই কোন ফল হয়নি। অবশেষে যখন একেবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে তখন তিনি পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন।

সংস্কৃত কলেজের হাতেলেখা প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের উদ্‌যোগপর্বের এই প্রথম সংঘাতের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে-কাহিনীর মর্মটুকু আমরা জানি, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ অপ্রকাশিত রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব সহকারী সম্পাদকত্বের, এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত, এক বছর তিন মাস। দ্বিতীয় পর্ব অধ্যক্ষতার, জানুয়ারি ১৮৫১ থেকে অক্টোবর ১৮৫৮, সাত বছর ন' মাস। এই ন' বছর শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার দুই কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। গোলদীঘির বিদ্যালয় থেকেই তিনি তাঁর সমাজসংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। একই সময়ে দুই ফ্রন্টে লড়াইয়ের মতন দুই কঠিন কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। একটির জন্য অন্যটিতে কোন শৈথিল্য দেখা দেয়নি। সেইটাই বিস্ময়ের ব্যাপার, এবং সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র পড়তে পড়তে এই বিস্ময় আরও বাড়তে থাকে।

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম পর্বের ও প্রথম সংঘাতের কাহিনী প্রথমে বলব। শিক্ষাসংসদ বিদ্যাসাগরকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন ২ এপ্রিল, ১৮৪৬। ৬ এপ্রিল বিদ্যাসাগর কাজে যোগ দেন। কলেজের নথিপত্র দেখে মনে হয়, ১৮৪৭-এর এপ্রিল মাসেই বিদ্যাসাগর

তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকদের একটি নিবেদনপত্র থেকে। এই অপ্রকাশিত নিবেদনপত্রটির অন্যদিক থেকেও গুরুত্ব আছে বলে এখানে সেটি আংশিক উদ্ধৃত করছি। নিবেদনপত্রটি ইংরেজীতে লেখা :

The Memorial of the Pandits and
teachers of the Sanscrit College.

Respectfully Sheweth,

That your memorialists beg to express their sincere regret at learning that Essur Chundra Biddasagore, Assistant Secretary to the Sanscrit College has for reasons unknown to them resigned his situation as they are really afraid that his resignation at a time when the College is, as it were being altogether remodelled, will prove very much prejudicial to its true interests.

বাকি অংশটুকুর মর্ম এই : "সহকারী সম্পাদক মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও উৎসাহ নিয়ে কলেজের উন্নতির জন্য যা করেছেন এবং এর মধ্যেই এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এমন সব সংস্কার সাধন করেছেন, যার ফলে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ভিত অনেক বেশী দৃঢ় হয়েছে বলে মনে করি। নিবেদকের অভিমত এই যে বিদ্যাসাগরকে এই পদে নিয়োগ করে আপনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন একজনকে আপনি সহকারীর পদে নিয়োগ করেছিলেন, যিনি সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী এবং ইংরেজীতেও যাঁর চলনসই জ্ঞান আছে। আমাদের ধারণা, উভয় ভাষায় ও বিদ্যায় এই জ্ঞান থাকার জন্য সহকারী সম্পাদকের পক্ষে শিক্ষাপদ্ধতির এই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। এই কারণে তাঁর পদত্যাগের বিষয় অবগত হয়ে আমরা গভীর দুঃখবোধ করেছি এবং যেহেতু এই সময় তাঁর অভাবে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভবনা, সেইজন্য আপনার কাছে আমাদের আবেদন এই যে আপনি যেন ঈশ্বরচন্দ্রকে

এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করে তাঁকে কাজে বহাল রাখতে চেষ্টা করেন। তাতে আমাদের বিদ্যালয়ের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হবে।

"পরিশেষে আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর পদত্যাগপত্র শিক্ষাসংসদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের কাছে পেশ করেছেন বলে আমরা অনুরূপ আর-একখানি নিবেদনপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়েছি। পাঠাবার উদ্দেশ্য হল যাতে ময়েট সাহেব দ্রুত সিদ্ধান্ত কিছু না করে বসেন, এবং পদত্যাগ মঞ্জুর না করে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যেন অনুরোধ করেন যে তাঁর নিজের স্বার্থে না হলেও, অন্ততঃ বিদ্যালয়ের স্বার্থে যেন তিনি কাজে নিযুক্ত থাকেন।"

তের জন পণ্ডিত ও শিক্ষক এই নিবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন: কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র শিরোমণি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগোবিন্দ তর্করত্ন, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালংকার, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যোগধ্যান মিশ্র (হিন্দী স্বাক্ষর), রসিকলাল সেন ও শ্যামাচরণ সরকার (ইংরেজীতে স্বাক্ষর)। নিবেদনপত্রের তারিখ ১০ এপ্রিল, ১৮৪৭।

মনে হয়, এপ্রিলের গোড়াতেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। সেই পত্র গৃহীত হতে আরও প্রায় তিন সাড়ে-তিন মাস সময় লেগেছিল। এই তিন মাস সম্পাদক ও তাঁর সহকারীর মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল মনে হয়। নথিপত্রেতেও তারই আভাস পাওয়া যায়। পদত্যাগের কারণ নিয়ে উভয়ের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল তা মধুর নয়। একটি-একটি করে পদত্যাগের সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বিদ্যাসাগর একখানি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন রসময় দত্তকে। পত্রখানি বহুমূল্য দলিল। তা ছাড়া, সংস্কৃত কলেজের পঠনপ্রণালীর যে উন্নয়ন-পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রসময়ের মতবিরোধ হয়েছিল, সম্পূর্ণ সেই পরিকল্পনাটিও আছে নথিপত্রের মধ্যে। এটিও দুষ্প্রাপ্য দলিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে এটি রচনা করা হয়েছিল, এবং তিনি এই পরিকল্পনারই উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন। এ-সম্বন্ধে মার্শাল তাঁর রিপোর্টে লেখেন: "The Assistant

Secretary consulted me sometime ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me highly judicious and the scheme altogether seemed well adopted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves; as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result will prove highly satisfactory."

পরিকল্পনাটি দীর্ঘ। শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপক সংস্কারের বিষয় সবিস্তারে পরিকল্পনার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তার মূল বক্তব্য এই :

ব্যাকরণের বিদ্যা আয়ত্ত করতে দু' বছরের বেশী সময় লাগা উচিত নয়, অথচ বর্তমানে তার দ্বিগুণ সময় প্রায় ছাত্রদের অপব্যয় করতে হয়। শিক্ষাও ভাল হয় না। ব্যাকরণের পাঠ্য ও পাঠপ্রণালী দুইই বদলানো প্রয়োজন। সাহিত্যশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকও বদলানো উচিত। বর্তমানে 'স্মৃতি'র আগে 'ন্যায়' পড়াবার যে রীতি আছে, তার বদলে স্মৃতি আগে পড়ান দরকার, কারণ ন্যায়ের তুলনায় স্মৃতি সহজবোধ্য। সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় বিজ্ঞান, কাব্য, দুটি অনুবাদ (সংস্কৃত ও বাংলা) এবং সংস্কৃত রচনার ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান, কাব্য ও সংস্কৃত রচনা যেমন আছে তেমনি থাকবে, দুটি অনুবাদ বাতিল করতে হবে। সংস্কৃত ও বাংলা দুই ভাষার রচনার ভিতর দিয়ে ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে, অনুবাদের প্রয়োজন হবে না। ইংরেজী বিভাগের পাঠ্য ও পাঠপ্রণালীর আমূল সংস্কার করতে হবে। এইভাবে কলেজের সমস্ত পাঠ্যবিষয় সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শেষকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> I have carefully studied the working of the system, and the suggestion made are brought forward with the view of facilitating the acquirement of the largest store of sound Sanskrit and English learning combined,

under the impression that such a training is likely to produce men who will be highly useful in the work of imbuing our Vernacular dialects with the science and civilization of the Western world.

সমস্ত পরিকল্পনার সারকথাটুকু এই শেষ বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ক্লাসিকাল সংস্কৃতবিদ্যার সঙ্গে নতুন পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটিয়ে, মাতৃভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ প্রসারিত করাই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যই তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের দুরূহ কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি, কাজে বাধা পেয়েছিলেন। যে-কোন কারণেই হোক, সম্পাদক রসময় দত্তের হয়ত মনে হয়েছিল যে তাঁর সহকারী সর্বব্যাপারে কর্তৃত্বের অধিকারী হতে চাইছেন। দত্তমহাশয় সেইজন্য তাঁর সম্পাদকীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ক্রমেই বেশী সজাগ হতে লাগলেন এবং সহকারীর দৈনন্দিন রুটিন কাজের মাত্রা এমন বাড়িয়ে দিলেন যাতে তাঁর চিন্তাভাবনার কোন অবসরই না থাকে। এই গতানুগতিক যান্ত্রিক কাজের বোঝা সহকারী বিদ্যাসাগরের স্কন্ধে কি প্রচণ্ড পরিমাণে চাপানো হয়েছিল, কলেজের নথিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতিবাধ্য কর্মচারীর মতন বিদ্যাসাগর যে সেইসব কাজকর্ম হৃষ্টচিত্তে করতেন তা মনে হয় না। তার উপর, কাজের বোঝার সঙ্গে ছিল অপমানের গ্লানি। স্বভাবতঃই সেই গ্লানি ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠল। ৬ এপ্রিল, ১৮৪৬ বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদকের কাজে যোগ দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ তিনি সংস্কার-পরিকল্পনা দাখিল করেন। তার ছ'মাসের মধ্যে, এপ্রিল ১৮৪৭এ, তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতামতের ঘাতপ্রতিঘাত যে কত দ্রুত চরম সীমায় পৌঁছেছিল তা এই সময়ের ব্যবধান থেকেই বোঝা যায়।

কলেজের পণ্ডিতেরা ১০ এপ্রিল নিবেদনপত্র পেশ করেন। তার দশদিন পরে ২১ এপ্রিল (১৮৪৭) দত্তমহাশয় চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগরকে তাঁর পদত্যাগের কারণগুলি পরিষ্কার করে জানাতে। চিঠির উত্তরে, ৩ মে ১৮৪৭, বিদ্যাসাগর লেখেন :

Sir,

Agreeably to your instructions dated 21 April I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.

I studied the Sanscrit language and literature in the Government Sanscrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study, and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods, but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded, I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step.

এর পর সুদীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর সবিস্তারে পদত্যাগের কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল আশানুরূপ ভাল না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য ও পাঠপ্রণালীর কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলেছেন: "সব সময় আমি আপনার অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা করে হয়ত সব কাজ করতে পারিনি। তার কারণ, আপনার বাইরের কাজকর্মের ঝামেলা এত বেশী যে আপনি কলেজেই নিয়মিত আসতে পারেন না। বাধ্য হয়ে আমাকে তাই পরীক্ষকদের মতামতের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু আপনি সেটা সুনজরে দেখেননি (মূল চিঠিতে 'bad spirit' কথা ব্যবহার করা হয়েছে)। গত এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছি, ছাত্রদের সুশিক্ষার জন্য।

অন্ততঃ চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। তার জন্য কত পরিশ্রম যে আমাকে করতে হয়েছে তা হয়ত কিছুটা আপনি বুঝতে পারেন। বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা সকলেই সেকথা জানেন, ছাত্ররাও জানে। দুঃখের বিষয়, এত সব ব্যাপার করা হয়েছে, অথচ আপনি সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। একজন মানুষ আন্তরিক পরিশ্রম করেও যদি তার কাজের সামান্য স্বীকৃতিও না পায়, তাহলে সে কি করে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং কেমন করেই বা তার পক্ষে এত কর্তব্যের বোঝা বহন করা সম্ভব!”

পাঠ্যবিষয়ের সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: “আমার মনে হয়েছিল যে পাঠ্যবিষয়ের আমূল সংস্কার করতে না পারলে বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্ভব হবে না। এ-বিষয়ে এপ্রিল-মে-জুন (১৮৪৬) এই তিন মাস ধরে আমি সর্বক্ষণ চিন্তা করেছি এবং জুলাই মাসে যখন অসুখবিসুখের জন্য তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে আমি দেশে যাই (বীরসিংহ গ্রামে), তখন অবসর সময়ে আমার চিন্তাধারাকে একটি অখণ্ড পরিকল্পনায় আমি কাগজে-কলমে রূপ দিই। কলকাতায় ফিরে এসে আমি কলেজের পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করি এবং তাঁরা একবাক্যে আমার পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। আপনার কাছে তাঁরা সেটি দাখিল করতে বলেন, যাতে সেটি শিক্ষাসংসদের কাছে, তাঁদের মতামত জানার জন্য, আপনি পাঠান। উৎসাহিত হয়ে আমি পরিকল্পনাটি আপনার কাছে পাঠাই এবং অনুরোধ করি সেটি সংসদের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব পেশ করতে। আমার ইচ্ছা ছিল পুজোর তিন সপ্তাহ ছুটির পরে কলেজ খুললেই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। আপনি প্রথমে পরিকল্পনাটি আগাগোড়া পড়ে একদিন আমাকে বলেন যে ওটা সংসদে পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ক্ষমতা আপনার আছে এবং প্রয়োজন বুঝলে আপনি নিজেই তা করবেন। পুজোর ছুটির পরে আমি যখন আপনাকে বললাম নতুন পাঠ্য-বিষয় চালু করতে, তখন আপনি বললেন যে কেবল ব্যাকরণশ্রেণীর পাঠ্য সম্বন্ধে আপনি নিজে দায়িত্ব নিতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাসংসদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা সম্ভব হবে না। তারপর একদিন আপনি আমার পরিকল্পনার খসড়াটি হাতে করে এনে বলেন যে কোন বিষয়ে, এমনকি

ব্যাকরণ সম্বন্ধেও, সংসদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা যাবে না, এবং সেইজন্য সংসদে আপনি কেবল ব্যাকরণের অংশটি আলাদা করে পাঠাতে চান। আমি তখন আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি পাঠাবার জন্য, কিন্তু আপনি তা পাঠাননি। আমাকে আপনি বুঝিয়ে দেন যে এত দীর্ঘ রিপোর্ট সংসদ পড়বে না, অতএব খানিকটা অংশ পাঠানোই ভাল। অতঃপর ১৬ অক্টোবর (১৮৪৬) আপনি ব্যাকরণের অংশটি পাঠান, কিন্তু তার ভিতর থেকেও আমার প্রস্তাবিত তিনখানি পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে তাকে বিকলাঙ্গ করেন।”

এই ঘটনার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর পরে যে অভিযোগ করেছেন তা আরও মারাত্মক। তিনি লিখছেন :

> Major Marshall at the close of his report on the scholarship examinations recommended to the Council to adopt the suggestions made by me which have been so often alluded to. On this in the Annual Report of the Sanscrit College for 1846-47 at page 6 you remarked: 'The report referred to by Major Marshall was prepared by direction of and mostly from data furnished by the Secretary to the College by whom the chief recommendations contained in it which accorded with his expressed views have already been submitted to and approved of by the Council of Education and are contained in the introductory portion of the Report.' Now I respectfully deny even having received from you any data for the preparation of that report and the only thing in the shape of direction I can remember was your instruction to devise a plan for reducing the number of sections in each class and introducing......and Abidhan

into the grammar classes. As to my 'chief recommendations' having been submitted to and approved of by the Council' that is briefly answered by referring to what has been shown before, namely that out of the numerous subjects referred to in my long report only part of one has been thought by you worthy to be laid before superior authority.

From the length to which this paper has extended I must bring it to a close, but I shall always be ready to meet any proper enquiry into the subjects mentioned. I think I have brought forward sufficient to show that my labours have not met and are not likely to meet with due appreciation and this is the ground of my resignation.

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিদ্যাসাগর, আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে হলেও যার গুরুত্ব আছে। তিনি লিখেছেন: "হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মধ্যে মধ্যে তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষার সময় আমাদের সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাত্রদের টুল ও ডেস্ক নিয়ে যান এবং তিন-চারদিন পর্যন্ত সেগুলি আটকে রাখেন। আমাদের ছাত্রদের অনেককে তার জন্য খালি মেঝেতে বসতে হয়। মেঝেতে মাদুর ও বিছানা নেই। আপনাকে বহুবার এ-বিষয়ে বলেছি এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের এই অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিকার করতে অনুরোধ করেছি। আপনি তাতে কর্ণপাত করেননি।" এই কথা বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন: "Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful."

পদত্যাগের এই কারণগুলির ভিতর থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি হল, দত্তমহাশয়ের অসহযোগিতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনুদারতা, গোড়া থেকেই বিদ্যাসাগরের ভাল লাগেনি। দ্বিতীয়টি হল, সম্পাদকের

বেগার খাটার মতন চাকরি করা তাঁর পছন্দ হয়নি। আসল জজিয়তির কাজ বজায় রেখে রসময়বাবু কলেজের সম্পাদকের কাজ কতকটা ঠিকে কাজের মতন চালিয়ে নিতেন। চাকরি করা ছাড়া তাঁর জীবনের আর কিছু লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের জীবনে চাকরিটা ছিল অত্যন্ত গৌণ, লক্ষ্যটাই ছিল মুখ্য। সংস্কৃত কলেজকে একটি আদর্শ শিক্ষায়তনে রূপ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রসময় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধকে কতকটা নিছক চাকরিজীবীর সঙ্গে একনিষ্ঠ আদর্শবাদীর বিরোধ বলা যায়। যাঁর কোন আদর্শের বালাই নেই, তিনি যে কেবল তাঁর পদলগ্ন ক্ষমতাটুকু প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবেন তা সহজেই বোঝা যায়। রসময়ের হয়ত আশঙ্কা ছিল যে বিদ্যাসাগর নিজগুণে ক্রমে কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে বেশী প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা পাবেন, এবং তা যদি পান তাহলে তাঁর ঠিকে কাজের বাড়তি কর্তৃত্ব ও উপরি আয়টুকু বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগর তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন বলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে পদত্যাগ করা সমীচীন মনে করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম সংঘাত শুরু হল এইখানে। শুরু হল, কিন্তু শেষ হল না। কারণ এ সংঘাত স্বার্থের সংঘাত নয়, আদর্শের সংঘাত। স্বার্থের সংঘাতের শুরু আছে, শেষও আছে। আদর্শের সংঘাতের শুরু আছে, শেষ নেই।

১৬ জুলাই, ১৮৪৭ বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। রসময়বাবু আড়ালে বলতে লাগলেন: "বিদ্যাসাগর যে চাকরিটা ছেড়ে দিলে, এখন খাবে কি?"

লোকমুখে কথাটা যখন বিদ্যাসাগরের কানে পৌঁছল, তখন তিনি নির্লিপ্তের মতন বললেন: "রসময়বাবুকে বলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"

৩ | বিদ্যা ও বাণিজ্য

আলু-পটলের ব্যবসা বিদ্যাসাগর অবশ্য করেননি। প্রয়োজন হলে তাও অবশ্য তিনি করতে পারতেন। জীবিকার জন্য যে-কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করতে তাঁর কুলগত বা শ্রেণীগত কোন সংস্কারে বাধত না। স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড। আলু-পটল বেচলে তা বিসর্জন দিতে হত না। রসময় দত্তের মন্তব্যের উত্তরে তাই তিনি ঐ কথা বলেছিলেন।

তখন তাঁর বাসায় আশ্রিতের সংখ্যা অনেক। অসহায় দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের প্রায় কুড়িটি ছেলেকে তিনি খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন। চাকরি ছাড়লেও তাদের ছাড়া সম্ভব হয়নি। ভরসা কেবল মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরির পঞ্চাশ টাকা আয়। তাই দিয়ে কলকাতার বাসার খরচ চলে যেত, বীরসিংহে বাবা-মা'র কাছে কর্জ করে টাকা পাঠাতে হত। এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাঁর বিদ্যানুশীলনের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য তিনি শোভাবাজারের রাজবাড়িতে তখন নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তার মধ্যে অর্থোপার্জনের কথাও তাঁকে চিন্তা করতে হত।

কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের পথ কোথায়? স্বাধীন বাণিজ্যের

পথই একমাত্র পথ। কেবল একমাত্র পথ নয়, যুগের উপযোগী পথ। নবযুগের বণিকশ্রেণীই ব্যক্তিস্বাধীনতার অগ্রদূত। কিন্তু বাণিজ্যের মূলধন কোথায়? তাঁর নিজের কোন মূলধন ছিল না, আলু-পটলের দোকান করার মতনও না।

বিদ্যাসাগরের মূলধন ছিল বিদ্যা। বিদ্যাই তাঁর স্বোপার্জিত মূলধন, এবং তিনি ছিলেন বিদ্যার ব্যাপারী। কিন্তু বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার সাদৃশ্য কোথায়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে? বিত্ত দান করলে কমে যায়, বিদ্যা যত দান করা যায় তত বাড়তে থাকে। বিত্ত অপহরণ করা যায়, বিদ্যা যায় না। বিত্তের মূলধন বাণিজ্যে খাটালে মুনাফার আকারে তা বাড়তে থাকে, কিন্তু বিদ্যার মূলধনে বাণিজ্যিক মুনাফা কি?

নবজাগরণের যুগের মূলমন্ত্র হল অবাধ বাণিজ্য এবং তার প্রধান মূলধন বিত্ত ও বিদ্যা দুইই। নবযুগ কেবল পণ্যবণিকের যুগ নয়, বিদ্যাবণিকেরও যুগ। নবযুগের বণিকের ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বিদ্যাসাগরের পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সুতরাং বিদ্যার মূলধন নিয়োগ করে তিনি বিদ্যাবণিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। তিনি মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হলেন।

ব্যবসায়ী না হয়েও স্বাধীন বাণিজ্যবৃত্তির প্রতি অনুরাগ সেকালে যে কেবল বিদ্যাসাগরেরই ছিল তা নয়। এ-পথ তিনি প্রথমে দেখাননি। তাঁর আগে রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে ইয়ংবেঙ্গল দলের অনেকে এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবাধ বাণিজ্যের উদ্যম তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল। সমাজের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে নবযুগের বণিক-শ্রেণীসুলভ এই স্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যোগের প্রকাশ হয়েছিল। এটা রেনেসাঁসের অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষণ। বাংলার নবজাগরণের ধারা বিচার-কালে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এই বাণিজ্যবৃত্তির উন্মেষের তাৎপর্য মনে রাখা উচিত। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের মানসিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিন বলেছেন :[১]

> The new conditions of life brought with them new attitudes and new valuations. The assertive self-consciousness of the *novus homo* made him reject any

> power which would impose limits. The free individual, free to dispose of his property, be it material or intellectual, as he thought fit, was the order of the day.

জীবনের নতুন পরিবেশ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলল। নতুন মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিচেতনা বাইরের সমস্ত নিষেধ ও বন্ধন ছিন্ন করতে চাইল। স্বাধীন মানুষ তার সম্পত্তির স্বাধীন মালিক হল এবং স্বাধীনভাবে তার লেনদেনের অধিকার দাবী করল, তা সে বিত্তগত সম্পত্তিই হোক আর বিদ্যাগত সম্পত্তিই হোক। এইটাই হল যুগের বৈশিষ্ট্য।

কথাগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীর। নবযুগের নতুন সামাজিক পরিবেশে নতুন করে যে রূপায়ণ ও মূল্যায়নের সূচনা হল, তার বনিয়াদ হল আত্মচেতনা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। বিত্ত বা বিদ্যা যে-মূলধনই হোক না কেন, তার নিয়োগের পথে সমস্ত নিষেধ অমান্য করাই হল যুগধর্ম। বিত্তবান ও বিদ্বানের এই মনোভাবের সাদৃশ্য উভয়শ্রেণীর মধ্যে সে-সময় এক ঐতিহাসিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। মার্টিন বলেছেন :[২] "Thus in many ways there was a close correlation between the mercantile classes and the intelligentsia."

বণিকশ্রেণী ও বিদ্বানশ্রেণীর এই আনুরূপ্য উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-জীবনেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। নবযুগের বাঙালী বণিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল দে প্রমুখ অনেক বাঙালী যাঁরা অবাধ বাণিজ্যের পথে দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন, সদাগরী স্বার্থে নিমগ্ন হয়ে তাঁরা সাংস্কৃতিক কর্তব্য ভোলেননি। সে-ক্ষেত্রেও তাঁদের উদ্‌যোগের অভাব ছিল না। যাঁরা প্রধানতঃ শিক্ষা সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে স্বাধীন বাণিজ্যে উৎসাহী ছিলেন। রামমোহন রায় বণিক ছিলেন না, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর সমাজসংস্কারের দুরূহ কর্তব্য পালনের ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীন বাণিজ্য করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা, বেনিয়ানি ও মহাজনি

করে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন। রামগোপাল ঘোষ ছিলেন সেকালের বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাজার মতন, তাই তাঁকে 'এজুরাজ' (educated-দের রাজা) বলা হত। রামগোপালও বাণিজ্যক্ষেত্রের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে, সার্থক বণিকের সম্মানও লাভ করেছিলেন সমাজে। জোসেফ ও কেলসল (Joseph and Kelsall) সাহেবের কোম্পানিতে সহকারীরূপে কাজ করে, ক্রমে নিজের বুদ্ধি ও একাগ্রতার জোরে তিনি তাঁর অংশীদার হয়েছিলেন। পরে সাহেব কোম্পানির নাম 'মেসার্স কেলসল অ্যাণ্ড ঘোষ' নামে পরিবর্তিত হয়। সাহেবের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি কিছুদিন পরে নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন। চালের ব্যবসা করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। আকিয়াব, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তাঁর চালের আড়ত ছিল। ব্যবসায়ীরূপে তিনি এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন যে ইংরেজ বণিকরা তাঁকে ১৮৫০ সালে 'বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স'এর সদস্যরূপে নির্বাচন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে এই সম্মান তখন দুর্লভ ছিল বলা চলে। রামগোপাল ঘোষ বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের সম্রাট হয়েও স্বদেশে বিদেশী বণিকসমাজের কাছে এই সম্মান অর্জন করেছিলেন।[৩]

প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী ইয়ংবেঙ্গল দলের দুজন প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। তাঁদের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজনীতির অনুশীলন। প্রধানতঃ তাঁরা বিদ্যাজীবী ছিলেন। কিন্তু বাণিজ্য-ক্ষেত্রে উভয়েই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :[৪] "তাঁহাতে যেমন সাহিত্যানুরাগ তেমনি বিষয়কর্ম্মে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ানের কর্ম্ম করিতেন, অপর দিকে তাঁহার বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতেন। এই কারবারে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইলে তিনি আপনার দুইপুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবার করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কারবারে তিনি যথেষ্ট উন্নতিলাভ

করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কলিকাতা বণিক-সমাজে এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানীর ডায়রেক্টর পদে বৃত হইয়াছিলেন।”

নবযুগের এই স্বাধীন বাণিজ্যস্পৃহা যে কেবল নব্য ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছিল তা নয়। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষার ফলে এবং পাশ্চাত্ত্য বণিকশ্রেণীর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা নবযুগের অবাধ বাণিজ্যনীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় সেকালের শিক্ষাদর্শে যাঁরা মানুষ হয়েছিলেন, সেই সব শাস্ত্রজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যেও দু-চার জন অবাধ বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়ে আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। যুগধর্মের প্রভাব থেকে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হলেন অম্বিকা-কালনার তারানাথ তর্কবাচস্পতি। সংস্কৃত কলেজ ও কাশীর পণ্ডিতদের কাছে সর্বশাস্ত্রে অনুশীলন শেষ করে, তারানাথ কালনায় ফিরে এসে বিদ্যাদানের জন্য যেমন টোল খুলেছিলেন, তেমনি বিত্ত উপার্জনের জন্য স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেও আরম্ভ করেছিলেন। কাপড়ের ব্যবসা করে তিনি তাঁর সমসাময়িক বহু ব্যবসায়ীর চেয়ে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কেবল কাপড়ের ব্যবসায়ে নয়, কাঠের ও ঘিয়ের ব্যবসায়েও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন। তাঁর চরিতকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন:[৫]

> তিনি প্রথমতঃ একখানি বস্ত্রের দোকান খুলিলেন। ঐ সময়ে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী ছিল না। অতএব বিলাতী সূতা ক্রয় করিয়া অম্বিকা কালনায় প্রায় দ্বাদশ শত সংখ্যক তন্তুবায়গণকে সূতা দিয়া ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহা নানা দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতেন। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কিছুদিন পরে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে বস্ত্র প্রস্তুত জন্য এক কুঠী প্রস্তুত করেন।…ঐ সকল বস্ত্র কাশী, মির্জাপুর, কানপুর, মথুরা, গোয়ালীয়র প্রভৃতি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতেন।

তৎকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমনের জন্য রেলের পথ প্রস্তুত হয় নাই। অধিক কি, তৎকালে এরূপ সুগম পথও ছিল না যে রাধানগর হইতে গোযান দ্বারা বস্ত্র প্রেরণ করেন। সুতরাং মুটের দ্বারা ঐসকল বস্ত্র নানা দেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবসায় করিতেন।···

বাচস্পতি মহাশয় কেবল বস্ত্রের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কিছুদিন ঐ ব্যবসা করিতে করিতে কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন এবং এই কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেন। ঐ সময়েই তিনি কালনায় প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালনা গ্রামের মধ্যে ওরূপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সময়েই তিনি অসংখ্য ঢেঁকি বসাইয়া, ধান্য ক্রয় করিয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করাইতেন ও ঐ সকল তণ্ডুল বিক্রয় করাইতেন। ঢেঁকির শব্দে প্রতিবেশীবর্গের নিদ্রা হইত না। এজন্য প্রতিবেশীরা বাচস্পতির পতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিতেন। দিবারাত্র ঐ সকল ঢেঁকির শব্দে লোকের কষ্ট হয় জানিয়া পিতার আদেশানুসারে তিনি গ্রামের দক্ষিণাংশে মাঠের মধ্যে ঐ সকল ঢেঁকি স্থাপন করিয়াছিলেন ”

তারানাথের ঢেঁকির শব্দে সেদিন যাঁরা বিরক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর উদ্দীপনার রহস্যের সন্ধান পাননি। পণ্ডিত-বণিক তারানাথ তর্কবাচস্পতির দৃষ্টান্ত নবযুগের বাংলার ইতিহাসে বিরল।

বাংলার সমাজ-জীবনে রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক লক্ষণ কিভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তখনকার কয়েকজন বাঙালীর চরিত্রের এই দৃষ্টান্ত থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে। 'Individual entrepreneur' কেবল বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যেই দেখা দেয়নি, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজীবী বাঙালীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য অর্থনৈতিক জীবনের অবাধ বাণিজ্যের আদর্শে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং অনেকে বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছিলেন। অনেকটা এই নবীন যুগাদর্শের প্রেরণাতেই

বিদ্যাসাগর স্বাধীন বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তবে তাঁর বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিদ্যাজীবীদের বাণিজ্যের পার্থক্য ছিল। তাঁরা বিত্ত মূলধন করে পণ্যের বাণিজ্য করেছিলেন বণিকদের মতন। বিদ্যাসাগর বিদ্যাকে মূলধন করে তারই যুগোপযোগী বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হিসেবে তিনি যে স্বাধীন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন তা তাঁর সমসাময়িক স্বশ্রেণীভুক্তদের মধ্যে আর কেউ বিশেষ করেননি। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এদিক দিয়ে বিদ্যাসাগরই ছিলেন এই ব্যবসায়ের অন্যতম পথ-প্রদর্শক।

মুদ্রিত বই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের মুক্তির প্রতীক। নবযুগেরও মুক্তির অগ্রদূত মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রিত বই। এতদিন যেন হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি ছিল পাতালের অতল অন্ধকারে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের মতন। মুদ্রণযন্ত্র তাকে মুক্তি দিল যেদিন, সেদিন জ্ঞানের আলোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। পুরোহিত, যাজক ও লিপিকরদের পুথিগত জ্ঞান হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে সকল মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এল। লিপিকরদের পারিশ্রমিক দিয়ে অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের পাঠাগারের জন্য নকল করিয়েছেন, কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে। কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার কারাগার থেকে মানুষের মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা যে হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির সাহায্যে সম্ভব হবে না তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। মুদ্রিত বইয়ের প্রাচুর্য ও প্রচার ভিন্ন তাঁর স্বপ্ন যে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয় তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সব রকমের মুক্তির আগে মানসমুক্তির প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসারের। শিক্ষার বাহন নবযুগের মুদ্রিত বইই হতে পারে, লিপিকরের লেখা পাণ্ডুলিপি নয়। শিক্ষার প্রসার ছাড়া সমাজসংস্কারেরও সার্থকতা কম। মুদ্রণযন্ত্র তাই নবযুগের জ্ঞানবিদ্যার প্রমিথিউস। গুরুগৃহের জীর্ণ-সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙে জনসমাজের মুক্ত অঙ্গনে জ্ঞানবিদ্যার আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে আসার প্রচণ্ডশক্তি যে মুদ্রণযন্ত্র ধারণ করে, সে এ-যুগের প্রমিথিউস বৈ কি? নবযুগের জ্ঞান, স্বর্গ থেকে অপহৃত প্রমিথিউসের অগ্নির মতন। মনে হয় যেন সেই যুগাগ্নির আরাধনার জন্যই বিদ্যাসাগর মুদ্রণ-

যন্ত্রের ও মুদ্রিত বইয়ের বাণিজ্যটি বেছে নিয়েছিলেন, অন্য কোন বাণিজ্য তাঁর মনঃপূত হয়নি।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার আগেই বোধ হয় বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত প্রেস' ও 'ডিপজিটারি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্ততঃ তাঁর প্রস্তুতির পর্ব শেষ হয়েছিল মনে হয়, ১৮৪৬ সালের শেষে, অথবা ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে। এ-বিষয়ে তিনি নিজে লিখেছেন :[৬] "যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম।"

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন মদনমোহন ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক। মনে হয় দুই বন্ধু মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা তখনই আরম্ভ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন ছিলেন এক বৃন্তের দুই ফুল। বৃহত্তর সমাজ-জীবন থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে, পারিবারিক জীবনে বন্দী হয়ে ছিলেন বলে, মদনমোহনের প্রতিভা বাইরে তেমন স্বীকৃতি পায়নি। স্বীকৃতির চেয়েও বড় কথা হল, মদনমোহনের চরিত্রেও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি, পারিবারিক পরিবেশের সংকীর্ণতার মধ্যে। মদনমোহনের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি এইখানে। তা না হলে, চরিত্র ও প্রতিভার দিক থেকে তিনি তাঁর সতীর্থবন্ধু বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ না হলেও, প্রায় সমতুল্য ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পারিবারিক জীবনের বদ্ধ চোরাগলিতে, সংকীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণে তাঁর চরিত্রের ঐশ্বর্য চূর্ণরশ্মির মতন চারিত হয়ে গেছে, অগ্নিশিখার মতন বহির্জীবনে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেনি। একবৃন্তে দুই ফুলের মধ্যে একটি তাই অনাঘ্রাত অবস্থায় মাটিতে ঝরে পড়ে গেছে।

দুই বন্ধু মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, পত্রিকা প্রকাশে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে, সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে, দুই বন্ধু নির্ভয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গি দুজনের প্রায় একই ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ অবশেষে দৈত্যের মতন দুজনের মধ্যে নেমে এল, এবং দুজনেরই

জীবনে গভীর বেদনার ছায়াসঞ্চার করল। অবশেষে বন্ধুবিচ্ছেদও হল, ছাপাখানা ও বইয়ের স্বত্ব নিয়ে। বিচ্ছেদ হল দুই বন্ধুর জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী স্বার্থান্ধ আত্মীয়স্বজনের জন্য। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ প্রসঙ্গে সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

ছাপাখানা করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ সঞ্চয় করা তখন মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। সামান্য চাকরি করে, বিরাট পোষ্যসংখ্যা প্রতিপালন করে, অর্থসঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না। ঋণ করে তাই শেষ পর্যন্ত ছাপাখানা করতে হয়েছিল। এ-সম্বন্ধে তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :[৭]

এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ৬০০৲ টাকায় একটি প্রেস্ ক্রয় করিতে হইবে ; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ টাকা ঋণ করিয়া, তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস ক্রয় করেন। ঐ টাকা ত্বরায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শাল সাহেবকে বলেন যে, 'আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয়, বলিবেন।' ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 'বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত ; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং ঐ একশতের মূল্য ৬০০৲ শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই পরিশোধ হইবে।' সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত

পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০৲ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন ; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। ইহার পর যে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগিল, তদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। ঐ টাকায় ক্রমশঃ ছাপাখানার ইষ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' নিয়েই বিদ্যাসাগর মুদ্রক ও প্রকাশকের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ-পথে তাঁকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের অনুগামী বলা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য মার্শাল সাহেব বইকেনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন ঠিক, কিন্তু কেবল সেই উৎসাহেই বিদ্যাসাগর 'অন্নদামঙ্গল' ছেপেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর আগে কেবল গঙ্গাকিশোর নন, আরও অনেকে 'অন্নদামঙ্গল' ছেপেছিলেন। ভারতচন্দ্র তখন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ঠিক ছাপাখানার আদিযুগে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল বলেই, কৃষ্ণনগরের রাজসভার বাইরে ভারতচন্দ্রের পক্ষে জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। পুথির যুগের রাজসভার স্তাবকদের গণ্ডির বাইরে তিনি জনসমাজে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার ও গানের একটা চাহিদা হয়েছিল তখন, বিশেষ করে তাঁর 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্গত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের। প্রথম যুগের বাংলা পুস্তক প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা সকলেই প্রায় তাই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ছেপেছিলেন। বটতলার প্রকাশকরাও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যাংশের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং মার্শাল সাহেবের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশের পক্ষে অন্য বাণিজ্যিক যুক্তিও ছিল।

'অন্নদামঙ্গল' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়ানো হত এবং বিদ্যাসাগর যখন সেই কলেজের পণ্ডিত ছিলেন তখন তিনিই

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তা পড়াতেন। 'বিদ্যাসুন্দরের' উপাখ্যান পড়াতে তিনি রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করতেন। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন :[৮] "বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সব বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এই কথা অমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।"

ছাত্রদের পড়াবার জন্যই যে ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তেন বিদ্যাসাগর, তা নয়। তাঁর রুচিবোধ সংযত হলেও, রুচিবায় ছিল না। সাহিত্যবোধ ও রসবোধ ছিল গভীর। বিদ্যাসুন্দরের খেউড় অংশ ছাত্রদের পড়াতে সঙ্কোচ হলেও, ভারতচন্দ্র তাঁর বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতা তিনি প্রায় আবৃত্তি করে শোনাতেন। কৃষ্ণকমল বলেছেন :[৯]

> বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা!'

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ পুথি সংগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগর নিজে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি যান। সেই সূত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। “নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। সতীশচন্দ্রের পিতা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে ভারতচন্দ্র প্রণীত গ্রন্থসংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর স্কুলের পরিদর্শনসূত্রে এই সংস্রবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় সখ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।…বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, পুলকপ্রীতিভরে সেই বেশভূষাহীন দরিদ্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন দিতে কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না।”

কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই বন্ধুত্ব পরবর্তীকালে আরও দৃঢ় হয়। কারণ, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে পরে যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের রাজারা অন্যতম। কেবল রাজবংশের সঙ্গে নয়, তাঁদের দেওয়ানবংশের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, তাঁর সমবয়সী ও বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। কোনদিক থেকেই কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সহযোগিতালাভে তাঁর বাধা ছিল না।

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ প্রকাশ করবার পর, বিদ্যাসাগর আরও অনেক পুথি-পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য কোন মুদ্রিত সংস্করণ তখন পাওয়া যেত না। অর্ধশিক্ষিত প্রকাশকরা সেগুলি কিছু-কিছু বিকৃত আকারে প্রকাশ করতেন মুনাফার লোভে। বিদ্যার দুর্ভেদ্য গর্ভগৃহ থেকে পুথিবন্দী সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির জ্ঞানভাণ্ডার মুদ্রিত গ্রন্থাকারে তিনি জনসমাজে প্রকাশ করে দেন। বিদ্যাসাগরের এ-কীর্তি ইয়োরোপের নবজাগরণের যুগের উদ্‌যোগী প্রিণ্টার-প্রকাশকদের সঙ্গে তুলনীয়।

বই ছেপে প্রকাশ করতে পারলে তখন নিশ্চিন্ত হওয়া যেত না। বাণিজ্যক্ষেত্রে তখন মুদ্রক (Printer), প্রকাশক (Publisher) ও পুস্তক-বিক্রেতার (Book-seller) স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুদ্রিত গ্রন্থের

বিক্রেতারাও তখন দোকান খুলে ব্যবসা করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিদেশী বই কলকাতা শহরে আমদানি হত, এদেশী ছাপা বইয়েরও কিছু চাহিদা বাড়ছিল পাঠকমহলে। কিন্তু তার জন্য স্বতন্ত্র বইয়ের দোকানের প্রচলন তখনও হয়নি। বটতলার প্রকাশকরা ক্যানভাসার নিয়োগ করে গ্রাম্য মেলায় ও লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। যাঁরা তা করতেন না, তাঁরা ছাপাখানা বা পরিচিত কোন গৃহের ঠিকানা প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দিতেন পত্রিকায় এবং ক্রেতাদের সেখান থেকে বই কিনে নেবার জন্য অনুরোধ করতেন। অল্পসংখ্যক বইয়ের দোকান যা গড়ে উঠেছিল, তা বটতলা ও চীনাবাজার অঞ্চলে, হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজের আশেপাশে (কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে) নয়। চীনাবাজারই ছিল বড় বইয়ের কেন্দ্র।[১০]

> Bookshops have attractions all their own, even in the China Bazar—The stock of books in some of these native shops is heavy and the authors are commonly of the first rank in literature and popular science; Shakespeare, Addison, Burns, Chalmers, Scott, Marryatt, indeed almost every author of note with general readers, has a place on the shelves of the bazar book-seller. If the visitor wishes to have a non-scientific work recently published in London and already popular, he is certain of obtaining it in the New or Old China Bazaar.

বাঙালী ব্যবসায়ী যাঁরা বইয়ের দোকান করতেন, বাণিজ্যই তাঁদের প্রধান পেশা ছিল। বিদ্যাসাগরের পেশা ভিন্ন হলেও, বইয়ের দোকান করেছিলেন তিনি, বই প্রকাশ করে বিক্রেতাদের বিক্রি করতে দেননি। বইয়ের দোকানের নাম ছিল 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি'। কেবল নিজের প্রকাশিত বই দোকান থেকে বিক্রি করতেন না, অন্যের প্রকাশিত বইও এজেন্সি নিয়ে

বিক্রি করতেন। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ অঞ্চলে কলকাতা শহরের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র গড়ে উঠছিল। এই বিদ্যাকেন্দ্রের অনতিদূরেই তিনি এই বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন এ-অঞ্চল গ্রন্থকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠেনি। বিদ্যাসাগরই বোধ হয় প্রথম এই অঞ্চলে বইয়ের দোকান করেন এবং তার পর থেকে ধীরে ধীরে এক শতাব্দী ধরে, কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র প্রধান গ্রন্থকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগর বিলাসী গ্রন্থব্যবসায়ী ছিলেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশনের বাণিজ্যে তিনি শখ বা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য অবতীর্ণ হননি। শিক্ষা তাঁর জীবনের প্রধান পেশা হলেও, এ-ব্যবসাকে তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যাপারে তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা তখনকার দিনে খুব কম ব্যবসায়ীরই ছিল। বিহারীলাল লিখেছেন :[১১] "ছাপাখানার কার্য-সৌকর্যার্থ তিনি যে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক, তাহা অবগত আছেন কি? ছাপাখানায় ইংরেজী বর্ণাক্ষরে ৭০।৭২টি ঘর; বাঙ্গালায় ৫০০ ঘর। 'র' ফলা, 'ঋ' ফলা, 'য' ফলা এমন কত আছে। এই সব অক্ষর-যোজনা সামান্য কষ্টকর নহে। কোথায় কোন অক্ষরটি থাকিলে অক্ষর-যোজকের যোজনাপক্ষে সুবিধা হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া তাহা নির্ধারিত করেন। ইহার পূর্বে অক্ষর-যোজনার এমন সুবিধা ছিল না। তিনি অক্ষরসংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাহা অনুকূল হইয়া থাকে। তাহার নাম 'বিদ্যাসাগর সার্ট'।"

মুদ্রণের টেকনিক্যাল ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের কতখানি আগ্রহ ছিল, তা তাঁর এই অক্ষরবিন্যাসের প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়। 'টাইপ-কেসে' বাংলা মুদ্রণাক্ষরের বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের জন্য বহু মুদ্রক দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছেন। অনেক ভুলভ্রান্তি ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার ক্রমোন্নতি হয়েছে। যাঁরা মুদ্রণের উন্নতির জন্য এইভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম। বাঙালী বিদ্বৎশ্রেণীর মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর সজাগ দৃষ্টি বাংলাভাষার মুদ্রণসমস্যার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। শৌখিন মুদ্রণ-ব্যবসায়ী, গ্রন্থকার বা প্রকাশক হলে, মুদ্রণের

প্রতি তাঁর এতখানি ব্যক্তিগত অনুরাগ প্রকাশ পেত না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন :[১২] "বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই উহার বাংলা পরিবর্ত্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন ; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে ? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া ছাপাইয়া লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন।"

মুদ্রক প্রকাশক গ্রন্থকার ও গ্রন্থবিক্রেতার কাজ বিদ্যাসাগর কিভাবে একাই করতেন, প্রত্যক্ষদ্রষ্টারা তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। একাজে তিনি তাঁর সহযোগী বন্ধুবান্ধবদেরও উৎসাহিত করেছেন। প্রথম থেকেই পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর অংশীদার ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর অনুজতুল্য বন্ধু পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর প্রেসেই কাজকর্ম শিখে, পরে স্বাধীনভাবে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণেরও বাণিজ্য-প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারির বাণিজ্যিক সাফল্যে তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। সবচেয়ে লক্ষণীয়, এই সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র লিখেছেন :[১৩] "যে সময়ে পিতৃদেব অর্থোপার্জ্জনের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি পিতৃদেবকেও ঐ যন্ত্রের একজন অংশী করিয়া লইলেন। কিন্তু তিন জনের মধ্যে কাহারও সঞ্চিত অর্থ ছিল না, সুতরাং ঋণ করিয়া উক্ত যন্ত্র ক্রয় করিতে হইল ; এবং তিনজনেই নূতন নূতন পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশ করিয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন…"

"কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কাজেই মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার ভার উভয়ের উপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপাল ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার হস্তে অনেক কার্য্যভার ছিল ; তিনি কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিতেন ; পিতৃদেব ঐগুলি মুদ্রিত করা, প্রুফ শোধন করা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। প্রুফশোধন বিষয়ে পিতৃদেবের ঈদৃশী শক্তি ছিল যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে কোনপ্রকার ভ্রমপ্রমাদই এড়াইয়া যাইত না।...

"কালক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থই অধিক সংখ্যক হইয়া উঠিতে লাগিল ; মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক কম হইল ; পিতৃদেবের প্রকাশিত গ্রন্থ ত অতীব অল্প ছিল। পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া মুদ্রাযন্ত্র চালাইতেন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকেও সমান অংশ দিতেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা পিতৃদেবের ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না। তিনি একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, 'আপনার রচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না ; মদনেরও এইরূপ মত হইবে ; আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানুন।' বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে মদন-মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পত্র লিখিয়া যখন তাঁহারও ঐরূপ মত জানিলেন, তখন অগত্যা পিতৃদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ও পিতৃদেব উভয়ে সংস্কৃত যন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই দিলেন এবং তৎকালে তাঁহাদের যাহা কিছু লভ্যাংশ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিলেন।"

এর পর গিরিশচন্দ্র নিজের নামে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্র পিতার চরিতকথায় এই 'গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-যন্ত্র' স্থাপনের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। সে-কাহিনী বাস্তবিকই রোমান্টিক। তখন গিরিশচন্দ্র গড়পার অঞ্চলে বাস করতেন। সেখানে লালচাঁদ বিশ্বাস নামে এক মুদ্রণব্যবসায়ী তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। বার্ধক্যের জন্য তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তখন বাড়িতে বসে থাকতেন। গিরিশচন্দ্র

তাঁকে ছাপাখানা করার পরামর্শ দেন এবং উভয়ে একটি ছাপাখানা করেন, 'সুচারুযন্ত্র' নামে। অল্পকালের মধ্যে লালচাঁদের মৃত্যু হয়। প্রেস বিক্রি করে গিরিশচন্দ্র নিজ অংশ ৮০০৲ টাকা পান এবং তাই দিয়ে এণ্টালি অঞ্চলের একটি মুসলমানের প্রেস নিজে কেনেন। সেই প্রেসে "বাঙ্গালা পাইকা অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তাঁবা, দেবনাগর পাইকা অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তাঁবা, এবং পার্শী পাইকা ও স্মল-পাইকা অক্ষরের প্রায় ১০০ ছেনি ও তাঁবা ছিল।" ছেনি ও তাঁবা মূল্যবান, তখন টাকায় দু'খানা করে বিক্রি হত। বিক্রি করলে গিরিশচন্দ্র ছেনি ও তাঁবা থেকে প্রায় এক হাজার টাকা পেতেন। "কিন্তু তাহা না করিয়া স্থির করিলেন যে পার্শী অক্ষর ও তাহার ছেনি ও তাঁবাগুলি কোন মুসলমান মুদ্রাকরকে বিক্রয় করিবেন; এবং বাঙ্গালা ও দেবনাগর ছেনি ও তাঁবা দ্বারা অক্ষর ঢালাইবার কারবার খুলিবেন; আর বাঙ্গালা, দেবনাগর ও ইংরাজি অক্ষর দ্বারা ছাপাখানার কার্য্য চালাইবেন।"

বিদ্যাসাগর সব করেছিলেন, কেবল টাইপ ফাউণ্ড্রি বা অক্ষর ঢালাইয়ের কোন ব্যবসা করেননি। ছাপা ও অক্ষর ঢালাইয়ের কাজে মুসলমানরাই তখন অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মন্ত্রশিষ্য গিরিশচন্দ্র তাতেও পশ্চাদ্পদ হননি। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুদ্রণবাণিজ্যে তিনি গুরুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। টুলো পণ্ডিতবংশের একজন সন্তানের পক্ষে, সব বাণিজ্য ছেড়ে, মুদ্রণ-বাণিজ্যের পথে এই দুঃসাহসিক অভিযান বিস্ময়কর মনে হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও কলকাতা থেকে দক্ষিণে চাংড়িপোতা গ্রামে 'সোমপ্রকাশ' প্রেস ও পত্রিকা স্থানান্তরিত করে নিয়ে গিয়ে যে স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

ইয়োরোপের যাজকশ্রেণী ও ফিউডাল অভিজাতশ্রেণীর একটা বড় অংশ দীর্ঘকাল ধরে মুদ্রণযন্ত্রের ও মুদ্রিত বইয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করে, লিপিকরদের দিয়ে পুঁথি নকল করিয়ে তাঁরা স্বল্পমূল্যে সেগুলি বিক্রি করে, মুদ্রিত বইয়ের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করতেও কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু সে অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়নি তাঁদের দ্বারা।

জ্ঞানবিদ্যার ভাণ্ডার তাঁরা পুঁথির মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারেননি। মুদ্রণযন্ত্র তাঁদের বিদ্যার 'মনোপলি' ধ্বংস করে সাধারণের সামনে জ্ঞানের প্রদীপ তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের জমিদার ও পণ্ডিতদের মধ্যে একটা বড় অংশ মুদ্রণের প্রসার কামনা করতেন না। পণ্ডিত-পুরোহিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রবিদ্যা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে জনসমাজে প্রচারিত হলে তাঁদের বংশগত শাস্ত্রবিদ্যার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁদের ভয়। নব-যুগের বিদ্যার বণিকদের, মুদ্রক প্রকাশক ও লেখকদের তাই তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। মুদ্রণের ঐতিহাসিক শক্তির তাৎপর্য বুঝেই বিদ্যাসাগর অন্য কোন স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হননি। কারণ আর্থিক আত্ম-নির্ভরতাই বা প্রতিষ্ঠাই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, জীবনের স্বাধীন বৃত্তিকে জীবনের ব্রতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তোলা। শিক্ষা ও সমাজসংস্কার যাঁর জীবনের ব্রত, স্বাধীন মুদ্রক প্রকাশক ও গ্রন্থকারের বৃত্তিই তার শ্রেষ্ঠ উপযোগী বৃত্তি। ব্রতের সঙ্গে বৃত্তির বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না এক্ষেত্রে। মুদ্রক ও লেখক যিনি, তিনি স্বাধীনভাবেও সারাজীবন শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। চাকরিজীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিশেষ নির্বাচিত বৃত্তির জন্য।

সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার পর, প্রেসের কাজকর্মে ও গ্রন্থ-রচনায় তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের চাকরি পান। ১৮৫০ সালের শেষদিকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে চলে যান। ডক্টরময়েট সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। তার অল্প দিন পরেই সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষপদ সৃষ্টি করা হয় এবং বিদ্যাসাগর সেই পদে নিযুক্ত হন।

রসময় দত্তের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি 'চাকরি কখনও করব না' এরকম কোন প্রতিজ্ঞা করে পদত্যাগ করেননি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করে দেশের কল্যাণের জন্য কোন কাজ করা যে সম্ভব হবে না, তা তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই যখনই অবসর পেয়েছেন, তখনই তিনি স্বাধীনভাবে ছাপাখানা ও গ্রন্থরচনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। মুদ্রক ও লেখকের পেশাই তাঁর এই স্বাধীন চিন্তার শক্তি যুগিয়েছে। বিদ্যার বাণিজ্যে তিনি ইতিমধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছেন। নবযুগের প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার মুদ্রণযন্ত্র ও লেখনী তাঁর আয়ত্তে। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারির মালিক, এবং একজন স্বাধীন লেখক। কোন চাকরিতেই আর তাঁর কোন ভয় নেই। বিদ্যায়তনে থেকেও তিনি নির্ভয়ে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ব্রত গ্রহণ করতে পারেন। চাকরি কোনদিন তাঁকে পরাধীন করতে পারবে না। তাঁর স্বাধীন চিন্তার পথে কোন অন্তরায়কেই আর মাথা হেঁট করে স্বীকার করতে হবে না।

আদর্শের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হবার জন্য বিদ্যাসাগরকে ঘটনাচক্রে আবার ফিরে আসতে হল সংস্কৃত কলেজে। জীবনের ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কখনো কখনো মনে হয় যেন ইতিহাসের একটা গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে। ঘটনার টানে বিদ্যাসাগর যখন আবার সেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ঘুরে সংস্কৃত কলেজের কাজে যোগ দিলেন তখন ইতিহাসের এই আপাত-রহস্যময় উদ্দেশ্যসিদ্ধির কথা না ভেবে পারা যায় না। নবযুগের বাংলার নতুন শিক্ষাদর্শ যিনি প্রতিষ্ঠা করবেন, দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা আমূল সংস্কারের কঠোর ব্রত যাঁকে উদ্‌যাপন করতে হবে, তিনি কেবল পথপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ঘটনার জোয়ার-ভাঁটার দৃশ্য দেখতে পারেন না। আবর্তের মধ্যেই তাঁকে নেমে দাঁড়াতে হয়।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড-রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের চাকরি করতেন। চাকরি বজায় রেখে অতিরিক্ত ছাত্র হিসেবে তিনি মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শুনতে যেতেন। জীবনের পেশাটাকে তখনও তিনি সঠিকভাবে বেছে নিতে পারেননি। ডাক্তারি পড়বেন এবং ডাক্তার হবেন, এই যখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, তখন কলেজের চাকরি তাঁকে ছাড়তে হল। ১৬ জানুয়ারি ১৮৪৯, তিনি মেজর মার্শালের

কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ১ মার্চ ১৮৪৯, পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর এই পদে নিযুক্ত হন।

তারপর দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়।

নবেম্বর ১৮৫০, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিতের চাকরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে যান। শিক্ষাসংসদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব এই শূন্যস্থানে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরকে তা জানানো হয়। চাকরির প্রয়োজন ছিল বলে বিদ্যাসাগর যে-কোন চাকরি যে-কোন শর্তে করার জন্য কোনদিনই উদ্গ্রীব ছিলেন না। বিশেষ করে, সংস্কৃত কলেজের মতন শিক্ষায়তনে তো নয়ই। সেখানে চাকরির চেয়েও তাঁর বড় লক্ষ্য হল শিক্ষাসংস্কার। তাঁর শিক্ষাদর্শকে তিনি সেখানে বাস্তবে রূপ দিতে চান। সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হলে তা হবে না। তার জন্য উপযুক্ত পদমর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তাই প্রথমে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। শেষে ময়েট সাহেবের বিশেষ অনুরোধে তিনি জানান, শিক্ষাসংসদ যদি তাঁকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন তাহলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে রাজী আছেন। ডঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এই মর্মে একখানি চিঠিও লিখিয়ে নেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৮৫০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে পরদিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। সেই মাসেই রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। ১৬ ডিসেম্বর, শিক্ষাসংসদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর আর-একটি শিক্ষাসংস্কার-পরিকল্পনা রচনা করেন। আগের পরিকল্পনার সঙ্গে (১৮৪৬-এর) এই পরিকল্পনার সাদৃশ্য আছে, মূল দৃষ্টিভঙ্গিরও মিল আছে। তবে আরও অনেক পরিণত চিন্তার ফল এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই এই পরিকল্পনাটিকে "গভীর চিন্তা ও বিবেচনা-প্রসূত" বলেছেন। কলেজ পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা এবং পাঠ্যপ্রণালী সংস্কারের ব্যাপারে অনেক কথা তিনি পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখও করেছেন। পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য শিক্ষাসংসদ বিদ্যাসাগরকে সর্বময় কর্তৃত্ব দেন। এই সময় রসময় দত্ত যখন পদত্যাগ করেন তখন সংসদ গবর্ণমেণ্টকে লেখেন:

"বাবু রসময় দত্ত গত দশ বছর ধরে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত আছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোন জ্ঞান নেই বললেই হয়। তার উপর অন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে সারাদিন তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কলেজের কাজের সময় ঠিক তিনি কখনই উপস্থিত থাকতে পারেন না। স্বভাবতঃই তাই কলেজের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হাজিরা খাতার উপর একেবারেই নির্ভর করা চলে না। নানারকমের অব্যবস্থার ফলে কলেজের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের ক্ষতিও হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাতে এই অবস্থার আশু প্রতিকার না করলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

"বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য সম্প্রতি যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, করিৎকর্মা লোকের হাতে পড়লে সংস্কৃত কলেজটিকে তার শক্তিশালী সহায়ক হিসাবে স্বচ্ছন্দেই গড়ে তোলা যায়।

"বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগের ফলে কলেজ পুনর্গঠনের প্রধান অন্তরায় দূর হল বলে মনে হয়। ক্যালকাটা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডঃ স্প্রেঙ্গার আরবী ভাষায় যেমন সুপণ্ডিত, সেরকম সংস্কৃতের পণ্ডিত কোন ইয়োরোপীয় যোগ্য ব্যক্তি কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষাসংসদ মনে করেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি যেমন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। শুধু তাই নয়, তাঁর মতন উদ্‌যোগী, কর্মতৎপর, বলিষ্ঠচিত্ত ব্যক্তি বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁর রচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'চেম্বার্সের বায়োগ্রাফি'র বাংলা অনুবাদ সমস্ত সরকারী স্কুল-কলেজে বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ান হয়। তিনি যদি কলেজের অধ্যক্ষ হন তাহলে বর্তমানের সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়ে দেওয়া হবে। দুই পদের বেতন এখন মোট ১৫০৲ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০৲ টাকা দিলেই চলবে। সুতরাং পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোন খরচ বাড়বে না।

"গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় আপাততঃ অস্থায়ীভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উপর সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হল।"

শিক্ষাসংসদের সুপারিশ ও প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন। মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে, ২২ জানুয়ারি ১৮৫১ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এইবার সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের এবং তার শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারের সমস্ত দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপর, এবং সেকাজ করার ক্ষমতাও তাঁকে দেওয়া হয়।

সর্বোচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং সর্বাধিক কর্তৃত্ব পেয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সমর্পণ করেন। সংস্কৃত কলেজের হাতেলেখা অপ্রকাশিত নথিপত্রের মধ্যে "Notes on the Sanscrit College" শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ ২৬ প্যারা সম্বলিত রচনা আছে। ঈশ্বরচন্দ্র এই Notes-এর রচয়িতা, রচনার তারিখ ১২ এপ্রিল ১৮৫২। মনে হয়, এটি বিদ্যাসাগরের অবসর সময়ের চিন্তাপ্রসূত একটি খসড়া। এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের সমগ্র রূপটি এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যা আর অন্য কোথাও ওঠেনি। তাঁর সমস্ত শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই আদর্শ। এই খসড়ার মধ্যে দেখা যায় তিনি লিখেছেন :

১। বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

২। যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশী ইংরেজীভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও, পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৬। পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে?

৭। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।

৮। অলঙ্কারশাস্ত্রে তাদের দু'একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ'...ও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দু'একটি অধ্যায়।

৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত-বিদ্যার ভিত্ দৃঢ় হবে।

১০। স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে: মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা—দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১। বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিতবিজ্ঞানের পক্ষে এই দু'খানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দু'খানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশী সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দু'খানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোন সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রম অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২। সেইজন্য সংস্কৃতে গণিতশিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩। এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু

বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীর মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪। হিন্দু-দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে,—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ঐ একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসবপার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬। "এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজী ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছে এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে।"

১৭। এই শিক্ষার আর-একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের "বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (Technical word) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

১৮। এ-সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এইগুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে: ন্যায়দর্শন—গৌতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি; বৈশেষিক-দর্শন—কণাদের সূত্র; সাংখ্যদর্শন কপিলের সূত্র এবং কৌমুদী; পতঞ্জল দর্শন—পতঞ্জলের সূত্র; বেদান্তদর্শন—বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; মীমাংসাদর্শন—জৈমিনির সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সব দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।

১৯। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তিনভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজীর জন্য দেওয়া উচিত। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজী। অর্থাৎ তিনভাগের দু'ভাগ সময় ইংরেজীবিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উচিত।

২০। বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সাহিত্য, অলংকার, গণিত, স্মৃতি, দর্শন ও সংস্কৃত গদ্যরচনা—এই বিষয়গুলি আছে। এগুলি এইভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে: সাহিত্য ও অলংকায় যেমন আছে তেমনি থাকবে। সংস্কৃত-গণিত ও সংস্কৃত গদ্যরচনা বাদ দিতে হবে এবং তার বদলে ইতিহাস, গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজীতে পড়াতে হবে এবং সেইটাই হবে সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষার বিষয়। দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রও বৃত্তিপরীক্ষার বিষয় হবে, এবং প্রতি বছরে একটি করে বিষয় নির্বাচন করা হবে।

২১। দু'জন শিক্ষক নিয়ে বর্তমানে যে ইংরেজীবিভাগ আছে, তা দিয়ে এই ধরনের শিক্ষাসংস্কার করা অসম্ভব। তা ছাড়া বর্তমান শিক্ষকরা গণিতে এবং বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংস্কৃত কলেজে এই ধরনের শিক্ষক দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাঁদের যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বদলি করে দেওয়া যায়, তা হলে ভাল হয়।

২২। এ বিভাগটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করতে হবে, চারজন শিক্ষক নিয়ে, যথাক্রমে ১০০৲ টাকা, ৯০৲ টাকা, ৬০৲ টাকা এবং ৫০৲ টাকা বেতনে।

এই বেতন দিলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা করতে হলে ইংরেজীবিভাগের জন্য মাসে ৩০০৲ টাকা খরচ করা প্রয়োজন।

২৩। সংস্কৃত-গণিতশ্রেণী তুলে দিলে দু'জন শিক্ষক মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে ইংরেজীবিভাগের জন্য পাওয়া যাবে। বাকি যে পঞ্চাশ টাকা মাসে লাগবে তা কলেজের বাৎসরিক গ্র্যাণ্ট ২৪০০০৲ টাকা, যা থেকে এখন ১৯০০০৲ টাকার কিছু বেশী খরচ হয়, তাই থেকেই নেওয়া যেতে পারবে।

২৪। যদি শিক্ষার খাতের তহবিল থেকে এই অতিরিক্ত ব্যয় এখন মঞ্জুর করা সম্ভব না হয়, তা হলে অন্য কোন উপায়ে এই ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে দু'জন 'রাইটার' আছে কলেজে, একজন বাংলার জন্য, একজন নাগরির জন্য। প্রত্যেকের বেতন মাসিক ১৬৲ টাকা। যে-সব পাণ্ডুলিপি তারা কপি করে তা অপ্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ পাণ্ডুলিপিগুলিতে ভুল থাকে যথেষ্ট এবং যতবার সেগুলি কপি করা হয় ততবার ভুল ও ছাড় দ্বিগুণ হতে থাকে। সুতরাং কপিস্টের দ্বারা লিখিত পাণ্ডুলিপি আর একবার কপিস্টকে দিয়ে লেখাবার ফলে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া যে দু'জন কপিস্ট সংস্কৃত কলেজে আছে, তারা মাসে পাঁচ-ছয় টাকার মতন কপি করে, অথচ মাসে ৩২৲ টাকা করে বেতন পায়।

এই কপিস্ট দু'জনকে বরখাস্ত করা উচিত এবং তাদের বেতনের ৩২৲ টাকা অন্য ভাল কাজে লাগানো উচিত। ইংরেজীবিভাগের জন্য মাসিক ৮৲ টাকা করে একটি জুনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যদি ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে ইংরেজী বিভাগের জন্য আলাদা করে ৮৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করার দরকার হবে না। দু'জন কপিস্টের ৩২৲ টাকা এবং বৃত্তির ৮৲ টাকা যোগ করলে মাসে ৪০৲ টাকা হতে পারে। আগে যে ৫০৲ টাকা ঘাটতি পড়ছিল তা থেকে এইভাবে ৪০৲ টাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুতরাং বাকি থাকে আর ১০৲ টাকা মাত্র এবং এই ১০৲ টাকা কলেজের তহবিল থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে।

২৫। ১৮৫০ সালে আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগ দিই তখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে আমার মতামত আমি একটি রিপোর্টে শিক্ষাসংসদের কাছে জানাই। তারপর কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমি আমার আগেকার মতামত কিছু কিছু অদল-বদল করার প্রয়োজনবোধ করেছি। এর থেকে বোঝা যাবে কেন আমার এই পরিকল্পনার সঙ্গে আগেকার পরিকল্পনার খানিকটা তফাত আছে।

২৬। আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আমি এখানে বলেছি, সেগুলি কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোন প্রকৃত উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও অসম্ভব।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

বিদ্যাসাগরের আসল শিক্ষাদর্শ এই পরিকল্পনাটির মধ্যে এমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, যা আর অন্য কোন রচনা বা পরিকল্পনার মধ্যে ওঠেনি। আগাগোড়া সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে একটি সুর মূলরাগিণীর মতন ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। সেই সুরটি হল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। তাঁর জীবনের জপতপধ্যান ছিল মাতৃভাষা। এই ভাষার গোড়া যাতে মজবুত হয়, ভিত যাতে দৃঢ় হয় এবং টবের শৌখিন ফুলের মতন মনোহর রূপ নিয়ে ফুটে উঠে যাতে তা না ঝরে যায়, তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দেশীয় ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে যাতে সেই ভাষা বিদেশী জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সমস্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাবানুভাবের প্রকৃত বাহন হয়ে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তার জন্য তিনি এই পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষভাবে আবেদন করেছেন। একদিন এই ভাষার ভিত্তির উপর নবযুগের বাংলা-সাহিত্য তার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সেইজন্যই তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ভালভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সত্যকার আদর্শ-সমন্বয় বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর তাই চেয়েছিলেন। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনাটির মধ্যে এমন সংহতরূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে যে তার স্পষ্টতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। বৈজ্ঞানিক যেমন তাঁর বীক্ষণাগারে নানা

রকম গবেষণার বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এই শিক্ষার আদর্শের বীজ নিজের হাতে বপন করে তিনি যদি আবাদ করার সুযোগ পান, তাহলে ভবিষ্যতে একদিন তাতে সোনার ফসল নিশ্চয়ই ফলবে।

কাজে কিছুদূর তিনি সার্থক হয়েছিলেন, সম্পূর্ণ হতে পারেননি, কারণ প্রতি পদে এত বাধাবিপত্তি ঠেলে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল যে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহও তাতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে এই পরিকল্পনাটি শিক্ষাসংসদে পাঠিয়েছিলেন তাঁর নিজের এই মন্তব্যসহ (৩০ জুন, ১৮৫২):

> The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanskrit College at my request.
>
> It is the result of several consultations I have held with the Principal and, I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration.

বিদ্যাসাগর নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছিলেন! শিক্ষাসংসদের অনেক সাহেব-সদস্য ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর গুণের জন্য। তাঁর রুক্ষ মেজাজ ও এক-গুঁয়েমিকেও তাঁরা যে খানিকটা ভয় করতেন, তাও বোঝা যায়। আরও মনে হয়, বিদ্যাসাগরের আদর্শের চেয়ে তাঁর চরিত্রকে তাঁরা অনেক বেশী ভয় করতেন। তাঁর আদর্শকে তাঁরা যে পছন্দ করতেন না তা নয়, তবে সব-সময় তাঁর মতামতকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারতেন না। এক বছর না ঘুরতেই তাই দেখা যায়, শিক্ষাসংসদ বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন সাহেবকে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। জুলাই-আগস্ট ১৮৫৩এ একজন পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ব্যালাণ্টাইন কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন।

ব্যালাণ্টাইন যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে পেশ করেন তার মর্ম এই :

"কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী দুইই পড়ানো হয় বটে কিন্তু বর্তমানে দুই ভাষার বিদ্যার মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়, তা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদের ঠিক করে নিতে হয়। এই ক্ষমতা ছাত্রদের সন্তোষজনক নয়। সেইজন্য কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়াও অতিরিক্ত আরও কিছু বই পাঠ্য করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।"

শিক্ষাসংসদ ব্যালাণ্টাইনের এই রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দেন (২৯ আগস্ট ১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর ব্যালাণ্টাইনের মতামত সমালোচনা করে নিজের একটি রিপোর্ট পাঠান সংসদের কাছে (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩)। এই রিপোর্টে তিনি লেখেন :

ব্যালাণ্টাইন যে-সব পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের কথা বলেছেন আমি সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। Mill-এর লজিকের যে সংক্ষিপ্তসার তিনি রচনা করেছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে তাই তিনি চালাতে চান। বর্তমান অবস্থায় আমার মতে সংস্কৃত কলেজে Mill-এর বই পড়ানো একান্ত প্রয়োজন। মিলের বই খুবই মূল্যবান, মনে হয় ব্যালাণ্টাইন সেইজন্যই তা পড়াতে বলেছেন। কিন্তু যে-জন্য তিনি তাঁর নিজের লেখা সংক্ষিপ্তসার পড়াতে বলেছেন তা ঠিক নয়। আমাদের কলেজের ছাত্রদের প্রামাণিক বই একটু বেশী দাম দিয়ে কিনে পড়ার অভ্যাস আছে। বেশী দাম বলে একখানি উৎকৃষ্ট বই পাঠ্য না করার কোন যুক্তি নেই। ব্যালাণ্টাইন বলেছেন, মিলের লজিক খুব বড় বই, ছাত্রদের প্রথমে পড়তে অসুবিধা হবে, তাই তাঁর সংক্ষিপ্তসার মুখবন্ধ হিসেবে পাঠ্য হতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখে গেছেন যে হোয়েট্‌লির তর্কবিদ্যা বিষয়ের বই তাঁর লজিকের সবচেয়ে ভাল উপক্রমণিকা। এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার আমি তাই সংসদের উপর ছেড়ে দিলাম। বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনের ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের কথাও তিনি বলেছেন। 'বেদান্তসার' আগে

থেকেই কলেজের পাঠ্য ছিল, এখন তার ইংরেজী অনুবাদ পড়াতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি ন্যায়-বিষয়ে যে 'তর্কসংগ্রহ' এবং সাংখ্য-বিষয়ে যে তত্ত্বসমাস পড়াতে বলেছেন তা আদৌ উল্লেখযোগ্য বই নয়। আমাদের পাঠ্যতালিকায় তার চেয়ে ভাল বইয়ের উল্লেখ আছে। বিশপ বার্কলের Inquiry বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্যপুস্তক-রূপে এ বই পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনা বেশী।

কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। কি কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এইগুলি পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতনই বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচনা করেছেন। ইয়োরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মতামত একজন ইয়োরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বাড়তে থাকবে। এই অবস্থায় বিশপ বার্কলের বই পাঠ্য হিসেবে প্রচলন করতে আমি ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে একমত নই।

ব্যালাণ্টাইন স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় প্রকারের পাঠপদ্ধতিই ভাল। অথচ দুই ভাষায় জ্ঞান-বিদ্যার চর্চার ফলে, 'সত্য দ্বিবিধ' এই ভুল ধারণা ছাত্রদের মনে জন্মাতে পারে, এ রকম আশঙ্কা প্রকাশও তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ ভয় অহেতুক নয়'। সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজী-বিদ্যাতে অভিজ্ঞ এমন বহু ব্রাহ্মণকে আমি জানি, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য লজিক ও এদেশী ন্যায়—এই দুইয়ের মতামত ঠিক বলে মনে করেন।

কিন্তু দুইয়ের মূল তত্ত্বগত ঐক্য সম্বন্ধে তাঁদের ধারণাই নেই। সেইজন্যই তাঁরা এক ভাষায় অন্য বিদ্যার চিন্তারীতি প্রকাশ করতে অক্ষম।

আমার বিশ্বাস, যে-ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজী এই দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মতন পাঠ করেছে এবং সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে, তার সম্বন্ধে এ রকম ভয় করার কোন কারণ নেই। যে সত্যকার ধারণা একবার করতে পেরেছে তার কাছে সত্য সত্যই। 'সত্য দু'রকমের', এ রকম ধারণা অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল। সংস্কৃত কলেজে আমরা যে শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করছি, তাতে কোন শিক্ষা থেকে ছাত্রদের মনে এ রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না। যেখানে দুটি সত্যের মধ্যে আন্তরিক মিল আছে সেখানে সেই মিল যদি কোন বুদ্ধিমান ছাত্র বুঝতে না পারে, তাহলে সেটা বাস্তবিকই আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে। মনে করা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই ছাত্ররা লজিক, অথবা দর্শনবিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ পড়া শেষ করল। এখন যদি তারা বলে, 'লজিকের পাশ্চাত্ত্য মতামতও সত্য, হিন্দু মতামতও সত্য', অথচ যদি তারা দুইয়ের মধ্যে কোন মিল খুঁজে না পায়, এবং না পেয়ে এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় ছাত্ররা বিষয়টা ভাল করে বুঝতে পারেনি, না-হয় যে-ভাষায় তারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাদের জ্ঞান সামান্য। একথা অবশ্য ঠিক যে হিন্দুদর্শনে এমন অনেক অংশ আছে যা ইংরেজীতে সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা যায় না। তার কারণ, সেই সব অংশের মধ্যে পদার্থ বিশেষ কিছু নেই।

ব্যালান্টাইন আরও বলেছেন,—'বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের পঠনরীতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী দুই ভাষায় শিক্ষাপদ্ধতি থেকে বোঝা যায়, এমন একশ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলা দরকার, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় দুই দেশের শাস্ত্রেই পণ্ডিত হয়ে উঠবেন এবং কতকটা দ্বিভাষী টীকাকারের কাজ করে উভয়ের মধ্যে যেখানে বাহ্য অনৈক্য আছে সেখানে সত্যকার অন্তর্নিহিত মিল কোথায়

তা দেখিয়ে দিয়ে অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করবেন। হিন্দুদের দার্শনিক আলোচনা যেসব মৌলিক সত্যে পৌঁছেছে, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে তাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুলে দেবেন।'

দুঃখের বিষয়, আমি এ-বিষয়ে ব্যালান্টাইনের সঙ্গে একমত নই। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। যদিও তা সম্ভব ধরে নেওয়া যায়, তবু আমার মনে হয়, প্রগতিশীল ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে সমাদরযোগ্য করা রীতিমত কঠিন। তাঁদের কুসংস্কারগুলি বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল। সেগুলি নির্মূল করা সহজ ব্যাপার নয়। কোন নতুন তত্ত্ব, এমনকি তাঁদের নিজেদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে তারই বর্ধিত রূপ যদি তাঁদের গোচরে আনা যায়, তাও তাঁরা গ্রাহ্য করবেন না। পুরনো কুসংস্কার তাঁরা অন্ধের মতন আঁকড়ে ধরে থাকবেন। আরব-সেনাপতি অমরু আলেকজান্দ্রিয়া জয় করে যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন—আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দেন, 'গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি হয় কোরানের মত অনুযায়ী, না হয় মতের বিরুদ্ধে লেখা। কোরানের মতের অনুরূপ যে-সব গ্রন্থ আছে, কেবল একখানি কোরান রেখে সেগুলি স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে ফেলা যেতে পারে। আর কোরান-বিরোধী যেগুলি সেগুলি তো এমনিতেই অনিষ্টকর, সুতরাং ধ্বংস করতে বাধা নেই।' আমার বলতে সংকোচ হয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি এই আরব খালিফের গোঁড়ামির চেয়ে কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে-ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত। কোন বিষয় আলাপ-আলোচনার সময় যদি পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞানের কোন সত্যের অবতারণা করা যায়, তাহলে তাঁরা সেটা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেন। সম্প্রতি আমাদের দেশে, বিশেষ করে কলকাতায় ও তার আশেপাশে, পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের

শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন, যেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয়নি। এই সব বিবেচনা করে, আমার মনে হয় না যে ভারতীয় পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করানোর কোন আশা আছে। ব্যালাণ্টাইন যে-প্রদেশের পণ্ডিতদের দেখে এই সব প্রস্তাব করেছেন, আমার ধারণা সেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাঁর মতামত খাটালে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

বাংলাদেশের কথা স্বতন্ত্র। "দুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করা উচিত এবং জোর করে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।" ব্যালাণ্টাইনের এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত। কিন্তু ভারতের এই অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা ভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এখানকার অবস্থা অমি সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে, এদেশের পণ্ডিতদের কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। তাঁদের তোষণ করারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ তাঁদের কোন সাহচর্য না পেলেও আমাদের শিক্ষাসংস্কারের কাজ চলবে। আজ এই সব দেশীয় পণ্ডিতদের মর্যাদাও প্রায় লোপ পেয়েছে। কাজেই তাঁদের ভয় করার কোন কারণ দেখি না। পণ্ডিতদের কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। মনে হয় না, তাঁরা তাঁদের আগেকার প্রতাপ-প্রতিপত্তি আবার ফিরে পাবেন। বাংলাদেশে যেখানেই শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাঙালীরা শিক্ষালাভের জন্য খুবই আগ্রহশীল। এদেশের পণ্ডিতদের মন যুগিয়ে না চলেও আমরা কি করতে পারি, তা দেশের নানা জায়গায় স্কুল-কলেজ স্থাপন করে আমরা শিখেছি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, আমাদের প্রথম প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে। এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষকের

দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে, এমন একদল লোক তৈরি করতে হবে, তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষকদের এই সব গুণ থাকবে ; তাঁরা নিজেদের ভাষায় সুশিক্ষিত হবেন, বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন। এই ধরনের একশ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত উদ্যম এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে চাই। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তাদের লেখাপড়ার কাজ শেষ করবার পর, আমার বিশ্বাস, এই শ্রেণীরই শিক্ষিত লোক বলে দেশের মধ্যে পরিচিত হবে। এ আশা আমার মিথ্যা কল্পনা নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই যে বাংলাভাষার আদর্শ শিক্ষক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংরেজীবিভাগের পুনর্গঠনের জন্য আমি যে প্রস্তাব করেছি তা যদি মঞ্জুর করা হয় তাহলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও তারা যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করবে এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবে। আশার কথা, সম্প্রতি তাদের চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করছি যে আমার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক সুশিক্ষিত ছাত্র দেশবাসীর প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে। এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছ থেকে ভবিষ্যতে কি আশা করা যেতে পারে, তার খানিকটা আভাস দেবার জন্য আমি একজন সিনিয়র ছাত্রের একটি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাঠালাম। এখনও এই ছাত্রটির উচ্চশ্রেণীর পাঠ শেষ করতে তিন বছর বাকি আছে।

অবশেষে আমি সবিনয়ে শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে চাই যে আমাকে যদি আমার নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে সংসদের কাছে এইটুকু আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে সংস্কৃত কলেজ কেবল যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শ পীঠস্থান হবে তাই নয়, মাতৃভাষা চর্চারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এমন একদল ভবিষ্যতের শিক্ষক তৈরী হবে এখান থেকে, যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের পথ সুগম করবেন।

ডঃ ব্যালাণ্টাইন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট দুটি পাঠান্তে সব দিক বিবেচনা করে শিক্ষাসংসদ মন্তব্য করেন : "ডঃ ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও উন্নতি সম্বন্ধে এমন সব আশাপ্রদ অভিমত প্রকাশ করেছেন যা দেখে আমরা সত্যই আনন্দিত হয়েছি। কলেজের অধ্যক্ষের জ্ঞাতার্থে আমরা জানাচ্ছি যে তিনি বর্তমানের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকুন। তবে এই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করবে অনেকটা তাঁর নিজের চেষ্টার উপর। যে-সব শিক্ষক ইংরেজীতে এবং সংস্কৃতেও, দর্শনশাস্ত্রের মতন উচ্চ বিষয় পড়াবেন, তাঁদেরও যদি যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকে তাহলে এ-শিক্ষার সফলতার সম্ভাবনা কম। অধ্যক্ষের নিজের উদ্‌যোগ ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সংসদের গভীর বিশ্বাস আছে, এবং তাঁরা আশা করেন তিনি ডঃ ব্যালাণ্টাইনের লেখা বইগুলি শিক্ষার কাজে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য কুণ্ঠিত হবেন না। তাঁর নিজের শিক্ষার কাজে এবং তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যাপারে ব্যালাণ্টাইনের বইগুলি খুবই কাজের হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ব্যালাণ্টাইনের বইগুলি পাঠ করে ছাত্ররা যে উপকৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যক্ষ মহাশয় ডঃ ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কে চিঠিপত্র লিখে ভাবের আদানপ্রদান করবেন। সংসদের একান্ত ইচ্ছা, বারাণসীর ও কলকাতার এই দুটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মতামতের আদানপ্রদান হোক এবং তার ফলে উভয়েরই ক্রমোন্নতি হোক। ইংরেজী থেকে সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে দার্শনিক বিষয় অনুবাদ করার সময় শব্দনির্বাচন ও প্রয়োগ যাতে নির্ভুল ও ভাবসম্মত হয় সেদিকে উভয়কেই নজর দিতে হবে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই ধরনের মানুষের মধ্যে একজন যাঁরা ঠিক হোক বা ভুল হোক, সকল বিষয়ে নিজের মতামতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, এবং অনেক সময় অন্যের মতামত বিবেচনার যোগ্য বলেই মনে করেন না। তার উপর শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর মতামত কেবল একটা অভিমত মাত্রই ছিল না, সেটা একটা মহান আদর্শের রঙে রঞ্জিত ছিল। সেই রঙে আঁচড় লাগার সম্ভাবনা দেখা দিল শিক্ষাসংসদের নীরস নির্দেশটিতে।

স্বভাবতঃই বিদ্যাসাগর বিচলিত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন, সংসদের কর্তৃপক্ষ বিদেশী পণ্ডিত ব্যালাণ্টাইনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে, তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি কিছুটা অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। একখানি আধা-সরকারী চিঠিতে তাই তিনি সংসদের সেক্রেটারি ডঃ ময়েটকে লেখেন :

> ডঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষাসংসদের নির্দেশ আমি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি। যদি এই নির্দেশগুলি আমাকে বর্ণে-বর্ণে পালন করতে হয়, তা হলে সংসদের সম্মতিক্রমে সম্প্রতি আমি নিজের যে পাঠ্যসূচী কলেজে চালু করেছি, তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে বলে আমার ধারণা। তার ফলে কলেজে আমার নিজের মর্যাদাই যে ক্ষুণ্ণ হবে তাই নয়, আমার শিক্ষার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতাও অনেকখানি কমে যাবে।
>
> কলেজ বন্ধ হবে বলে এবং ছুটির বন্ধে আমার দেশে যাবার তাড়াহুড়োর মধ্যে আমি আপনাকে সরকারীভাবে যা লেখা উচিত তা এখন লিখতে পারলাম না। তা হলেও কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবার আগে ডঃ ব্যালাণ্টাইনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমার দুই একটি গুরুতর অভিযোগ আমি আপনার কাছে নিবেদন করে যেতে চাই।
>
> এখানে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্নও আছে। আমার নিজের চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা সম্বন্ধে অথবা আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে আমি অন্য প্রতিষ্ঠানের একজন সমপদস্থ অধ্যক্ষের সঙ্গে মতামতের বিনিময় করব কিনা, এমন কোন শর্ত মেনে কোন আত্মমর্যাদা-বোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি কাজ করা সম্ভব? যা-ই হোক, আগেই বলেছি এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, এবং নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রকৃতির ব্যাপার। আমার তো মনে হয় না কোন শিক্ষিত ইংরেজ এই ধরনের শর্ত মেনে নিয়ে কাজ করতে রাজি হতেন। ব্যক্তিগত প্রশ্ন এ-চিঠিতে তুলব না। এবারে কাজের কথা বলছি।

আমার মনে হয় ডঃ ব্যালাণ্টাইন এই ধারণা থেকে তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেছেন যে যাঁরা ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় বিদ্যাই শিক্ষা করবেন, তাঁদের মনে সত্যের দ্বিবিধতা সম্বন্ধে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে তা তাঁর শিক্ষাধারা অনুসরণ করলে শুধরান সম্ভব হবে। আমি অবশ্য জানি না, বারাণসীর শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে ডঃ ব্যালাণ্টাইনের কি অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে আমাদের এখানে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি বলতে পারি, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন এমন একজন ইংরেজীশিক্ষিত লোকও বাংলা-দেশে নেই যিনি মনে করেন সত্য দ্বিবিধ।

আমার বক্তব্য হল, আমাদের সংস্কৃতশিক্ষা দিতে দিন, প্রধানতঃ বাংলাভাষার উন্নতির জন্য। তার সঙ্গে ইংরেজীভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ দিন। এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েকবছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যার প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজীবিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশী সাহায্য করতে পারবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে—আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম উদ্দেশ্য (বিদ্যাসাগর 'darling object' বলেছেন)—আমাকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, কোন রকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না (রূঢ় কথার জন্য মার্জনা করবেন, 'excuse the strong word')। ডঃ ব্যালাণ্টাইনের যে-সব বই বা সারগ্রন্থ আমি ভাল বিবেচনা করব, Novum Organum গ্রন্থের চমৎকার ইংরেজী সংস্করণ, তা আমি নিশ্চয়ই সাগ্রহে বিদ্যালয়ে পাঠ্য করব। কিন্তু তাঁর সংকলন বা রচনা পাঠ্য হওয়ার যোগ্য কিনা, বিশেষ করে আমার অনুসৃত শিক্ষানীতির সঙ্গে সেগুলি খাপ খাওয়ান সম্ভব হবে কিনা, তা বিচার করার এবং বিচারান্তে সাব্যস্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আমার

থাকবে। তা যদি না থাকে তা হলে আমার অধ্যক্ষতার প্রয়োজন কি? এছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অনুযায়ী চললে আমার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না। শিক্ষাসংসদের বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই দায়িত্ববোধ পর্যন্ত কমে যাবে, এবং আমার ভয় হয় নষ্টও হয়ে যেতে পারে।

আমি আশা করি, অত্যন্ত দ্রুতব্যস্ততার সঙ্গে লেখা আমার এই মতামতগুলি শিক্ষাসংসদের সহৃদয় ও উদার বিবেচনার যোগ্য বলে গৃহীত হবে, এবং সংসদ তাঁদের গত ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনা করে সংশোধন করবেন এই মর্মে যে, ডঃ ব্যালান্টাইনের প্রস্তাবিত পাঠ্যবিষয় আমি আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকব না।

যদি প্রয়োজন হয়, ছুটির পর কলেজ খুললে, এ বিষয়ে সরকারীভাবে আরও স্পষ্ট করে আপনাকে চিঠি লিখে জানাতে পারি।

ডঃ ময়েটকে লেখা এই বেসরকারী চিঠির মধ্যেও শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের কর্মজীবনের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলি পরিকল্পনা পেশ করেছেন, তার মধ্যে কেবল একটি সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সেই সুরটি হল সমন্বয়ের সুর—পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সঙ্গে ভারতবিদ্যার সমন্বয়। দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তিনি সেকালের শিক্ষাব্যবস্থাকে কখনও সমর্থন করেননি। সংস্কৃত-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের যতই বাহ্য আড়ম্বর থাকুক না কেন, তিনি টুলোপণ্ডিতদের বিদ্যাবুদ্ধিতে কোনদিনই অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন না। যাঁরা এদেশে প্রাচ্য-বিদ্যার প্রসারের আদর্শ সমর্থন করতেন (Orientalists), তাঁরা কোন-দিনই তাঁকে উৎসাহিত করতে পারেননি। আবার যাঁরা শিক্ষাদর্শের দিক থেকে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার ঘোর সমর্থক ছিলেন (*Anglicists*), তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপরেও তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল, মাতৃভাষার উন্নতি। তাঁর সমস্ত

শিক্ষা-পরিকল্পনার সার কথা হল তাই। ১৮৫২ সালে রচিত তাঁর 'Notes on the Sanscrit College' নামে যে পরিকল্পনাটির কথা আগে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি তার প্রথমেই তিনি বলেছেন : "বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।" এই কথাই, অর্থাৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার কথাই, তিনি নানাভাবে তাঁর অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যেও ব্যক্ত করেছেন। ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে মতবিরোধেরও মূল কারণ হল তাই।

মাতৃভাষা বাংলার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতি তাঁর জীবনের কাম্য ও লক্ষ্য হলেও, তিনি কখনও বিশ্বাস করতেন না যে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা, অথবা সংস্কৃতজ্ঞ টুলোপণ্ডিতরা এই কাজের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তবে এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী না হলে কারও পক্ষে বাংলাভাষার সমৃদ্ধির জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি কোন দেশীয় ও ভৌগোলিক সীমানা মানতে চাননি কোনদিন। সত্যই, জ্ঞানবিদ্যার কোন সীমানা, বা কোন রাষ্ট্রিক বন্ধন নেই। তাই তিনি প্রাচ্যবিদ্ ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্ দুই দলের পণ্ডিতদের কারও মতামতে কোনদিন সাড়া দিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে বিদ্যার আবার 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্ত্য' কি! যদি উৎস বা চর্চার দিক থেকে বিদ্যার ভৌগোলিক বিচার করতে হয় তা হলে সেই বিচারেরও কি কোন সার্থকতা থাকে? পূর্বের বিদ্যা কি পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে পাখা বিস্তার করতে পারে না? আর যে-বিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমে, পশ্চিমের পরিবেশে যার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়েছে, সে-বিদ্যা কি প্রাচ্যের, তথা ভারতের ও বাংলার মাটিতে পুষ্টিলাভ করতে পারে না? নবজাগরণের যুগে পশ্চিমে যে-সব নূতন বিদ্যার বিকাশ হয়েছে, বিদ্যাচর্চার যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, কেন আমাদের বাংলাদেশে তার বিকাশ ও চর্চা সম্ভব হবে না, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না। সংস্কৃত কলেজটিকে তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার সমন্বয়তীর্থরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দুই বিদ্যার মধ্যে ভেজাল দিয়ে তিনি একটি কিম্ভূতকিমাকার পাণ্ডিত্যের পিণ্ড পাকিয়ে বাংলার শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে

দিতে চাননি। ব্যালাণ্টাইনের পরিকল্পনায় কতকটা সেই নির্দেশই ছিল। তাই তিনি তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি, এবং গ্রহণ করার পক্ষে সংসদের যুক্তি ও অনুরোধ দুইই অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ডঃ ময়েটকে চিঠিতে তাই তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের সংস্কৃতশিক্ষা দিতে দিন এবং ইংরেজীতেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার সুযোগ দিন। তা হলেই আমরা এমন একদল শিক্ষিত যুবক গড়ে তুলতে পারব, যাঁরা আপনাদের প্রাচ্যবিদ্ ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্ উভয়ের চেয়ে শিক্ষা-প্রসারের ব্যাপারে অনেক বেশী সার্থক ও শক্তিশালী কর্মী বলে প্রমাণিত হবেন।"

বিদ্যাসাগরকে স্বাধীনভাবে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ দিয়ে শিক্ষাসংসদ 'বিদ্যাসাগর-ব্যালাণ্টাইনের' নীতিগত বিরোধের একটা মীমাংসা করেছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা সাময়িক একটা আপস করেছিলেন মাত্র। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত তিন বছর মাত্র বিদ্যাসাগর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন মনে হয়। এই সময়েই দেখা যায়, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কর্মতৎপরতা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছিল। পরে আমরা সেকথা বলব।

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহের সময় থেকে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সরকারী শিক্ষাবিভাগের মতবিরোধের আবার সূত্রপাত হতে থাকে। এবারে বিরোধ ডি. পি. আই. গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে। বিরোধ দিন-দিন বাড়তে থাকে এবং ক্রমে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত তাঁর অধ্যক্ষতার সরকারী চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করেছিলেন। সরকারের কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এ-বিষয়ে দার্জিলিঙ থেকে লেখা গর্ডন ইয়ঙের একখানি চিঠিতে দেখা যায় তিনি লিখছেন:

Upon the present occasion and on your reiterated recommendation, I have no objection to sanction the

following appointments, but I would wish you to bear in mind that in future, before such recommendations are made, full publicity should be given to the fact of the vacancies... and the rules referred to in my letter No. 119 dated 26th ultimo should not be overlooked.

সাহিত্যের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, গণিতের অধ্যাপক মোহিনী-মোহন রায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নচন্দ্র রায়, এই চারজনের চাকরির ব্যাপার নিয়ে ইয়ং এই চিঠি লেখেন। চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, নিয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাবিভাগ আগে থেকেই অনুরোধ করেছিলেন। কোন অধ্যাপক বা শিক্ষকের পদ খালি হলে তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে উপযুক্ত লোক বাছাই করে নিতে হবে, এই ছিল শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ। বিদ্যাসাগর সে-নির্দেশ মানতে রাজি হননি। মনে হয় তিনি তার চিঠির উত্তরে (৮ মে, ১৮৫৭) তাঁর এই মনোভাব শিক্ষাবিভাগকে জানান, কারণ গর্ডন ইয়ং প্রত্যুত্তরে লেখেন (১৬ মে, ১৮৫৭) :

মহাশয়,

আপনার ৮ তারিখের ১১২১ নম্বর চিঠি পেয়েছি। আমি স্বীকার করছি যে আপনি যে-সব লোক বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে ‘যোগ্য’ ব্যক্তি, কিন্তু তার জন্য এ কথা মানতে আমি রাজি নই যে তাঁরাই ‘যোগ্যতম’ ব্যক্তি। কর্মখালির বিজ্ঞাপন না দিলে কোন পদে ‘যোগ্যতম’ ব্যক্তি নিয়োগ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আপনি এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেননি বলে সত্যই আমি দুঃখিত। তবে তার জন্য আমি আপনার উপর কোন দোষারোপ করি না। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এখনও এই পদ্ধতিতে কাজ করতে কেন সম্মত নন। আপনি যখন এই নিয়মের ঘোর বিরোধী এবং নিয়ম মেনে চললে আপনার কাজকর্মের অসুবিধা হবে জানিয়েছেন, তখন এই বিষয়ে আর কোন অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক না করে আমি

আপনার সিদ্ধান্তই মেনে নেব ঠিক করেছি এবং চাকরির ব্যাপারে আপনার পাত্র-নির্বাচনও অনুমোদন করব। এবারেও তাই করলাম। ইতি—

বাইরে থেকে বিচার করলে বিদ্যাসাগরের এই আচরণ খুব সঙ্গত বলে মনে হয় না। বোঝা যায়, কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সর্বক্ষেত্রে সর্বময় কর্তৃত্ব দাবি করেছেন। যেকোন ক্ষেত্রেই হোক তিনি নিজের মতামতটাকেই সবসময় সবচেয়ে বড় বলে মনে করতেন এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দ ও খেয়াল-খুশিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেন। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের নিশ্ছিদ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ অনেক সময় উদ্ধত হলেও, খানিকটা তার প্রয়োজনও ছিল তখন। কারণ তখন বাঁকা মেরুদণ্ড নিয়ে বিদেশী শাসকদের অধীনে কাজ করে কোন সুফল লাভের আশা বিশেষ ছিল না। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে যিনি দুর্ভেদ্য মনে করেন এবং নিজের মতামতের প্রতি যাঁর আস্থা একেবারে অটল, তাঁর পক্ষে দীর্ঘকাল কারও অধীনে চাকরি করতে না পারাই স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের পক্ষেও তাই বেশী দিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বহাল থাকা সম্ভব হয়নি। শিক্ষক-অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারেও তিনি যে পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেছেন, তার কারণ মনে হয়, শিক্ষাবিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। তিনি জানতেন, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজে কাজ করার পথে অন্তরায় অনেক। তার উপর তাঁর সহযোগীদের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের কর্তারা যদি প্রকাশ্য মনোনয়নের সুযোগ নিয়ে নিজেদের তাঁবের লোক দু'-চারজন ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তা হলে পদে-পদে নানারকমের বাধা পেয়ে একেবারেই কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। এইজন্যই মনে হয় সংস্কৃত কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করতেন না।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে আরও অনেক বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধ ঘটেছিল। দার্জিলিং থেকে লেখা ইয়ঙের একখানি চিঠিতে দেখা যায় (১৩ এপ্রিল, ১৮৫৭), তিনি বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব 'স্কুল বুক সোসাইটি'কে দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করছেন।

মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সরকারী তত্ত্বাবধানে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করা। গর্ডন ইয়ং যুক্তি দিয়েছিলেন, পাঠ্যপুস্তক লেখকরা বই লিখে বেশী মুনাফা করেন, বাইরের প্রকাশকরাও মুনাফার জন্যই বই প্রকাশ করেন। অতএব শিক্ষাপ্রসারের জন্য সুলভ মূল্যের বই প্রকাশ করতে হলে 'স্কুল বুক সোসাইটি'র মতন প্রতিষ্ঠানের উপর তার ভার দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে গর্ডন ইয়ঙের মতামত-বিনিময় প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে বিদ্যাসাগর তখন একজন শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক লেখক তো ছিলেনই, অন্যতম পুস্তক-প্রকাশকও ছিলেন। তাঁর "সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি" তখন বাংলাদেশের অন্যতম প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান ছিল।

বিদ্যাসাগরের এই স্বাধীন বৃত্তির সাফল্য সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তারা বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। মনে হয়, গর্ডন ইয়ং এই প্রস্তাব করেছিলেন, পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অখণ্ড প্রভাব কিছুটা খণ্ডন করার জন্য। ইয়ঙের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও বিদ্যাসাগর তা সমর্থন করতে পারেননি। লেখক ও প্রকাশকের স্বাধীন বৃত্তিতে, এই প্রস্তাব মেনে নিলে সরকারী হস্তক্ষেপ করা হবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। গর্ডন ইয়ং তাঁর চিঠির উত্তর পেয়ে যে খুশী হননি, তা তাঁর পরবর্তী চিঠির (২ মে, ১৮৫৭) এই উক্তি থেকে বোঝা যায়: "...I am compelled to observe that it contains a very insufficient answer to the requisitions..." বোঝা যায়, ইয়ঙের প্রস্তাবে কোন গুরুত্বই আরোপ করেননি বিদ্যাসাগর। ইয়ং তার জন্য রীতিমত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে এই ধরনের নানাবিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের যখন বিরোধ চলছিল, তখন সিপাহীবিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রিটিশ শাসকরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। কলকাতা শহরের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের অট্টালিকা তাঁরা তখন সৈন্যসামন্ত মজুত করার জন্য দখল করছেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের বৃহৎ অট্টালিকাও তাঁরা দখল করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তও বিদ্যাসাগর সহজে মেনে নেননি। তাঁর চিঠির (১১ আগস্ট, ১৮৫৭) উত্তরে বাংলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি তাঁকে লেখেন (১৭ আগস্ট ১৮৫৭): "আপনার

১১ তারিখের চিঠির উত্তরে আমি ভারত-সরকারের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির একখানি চিঠির কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। সেই চিঠিতে আপনি দেখতে পাবেন, হিন্দু ও মাদ্রাসা কলেজের অট্টালিকা দুটি সৈন্যদের বাসের জন্য গবর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে দখল করবেন মনস্থ করেছেন। কলকাতায় শীঘ্র যে সৈন্যসামন্ত আসবে তাদের এইস্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আপনাকে তাই অনুরোধ করছি যে আপনি আর বিলম্ব না করে এখনই গ্যারিসান-কমাণ্ডারের হাতে আপনার বিদ্যালয়গৃহ ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করবেন।"

গর্ডন ইয়ং পরদিন ১৮ আগস্ট বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে লেখেন: "সৈন্যরা আপনার বিদ্যালয়গৃহ দখল করলে আপনি আপনার ছাত্রদের শিক্ষাসমস্যার এবং ক্লাসের সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করে যতশীঘ্র সম্ভব পত্রোত্তরে আমাদের জানাবেন।" মাসিক ১০৫৲ টাকা ভাড়ায় বিদ্যাসাগর দুটি বাড়ি ভাড়া করে সংস্কৃত কলেজের কাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ ভারত-সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করেন।

এর ঠিক এক বছর পরে, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ বাংলা-সরকার বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করে লেখেন: "পণ্ডিত মশায় শেষ পর্যন্ত খানিকটা অশোভনভাবে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করলেন, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। বিশেষ করে তাঁর যখন অসন্তোষের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যাই হোক আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে জানাবেন, এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করেছেন তার জন্য সরকার তাঁর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।" ৫ আগস্ট ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তাতে তিনি লেখেন:

> সরকারী কাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়েছে যে বাংলার ছোটলাটের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে আমি বাধ্য হলাম।

এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে যে অবিশ্রান্ত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, এখন আর তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলে সেই বিশ্রাম আমি পেতে পারি।

স্বাস্থ্য ভাল হলে আমার ইচ্ছা আছে আমার জীবনের বাকি সময়টুকু আমি বাংলা বই রচনা ও সংকলনের কাজে সম্পূর্ণ নিয়োগ করব। দেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের ব্যাপারে সরকারী কাজ-কর্মের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হল সত্য, তবু আমার বাকি জীবন এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। এ বিষয়ে আমার যে গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা থাকবে এবং মৃত্যুর পরে তার অবসান ঘটবে।

আমার পদত্যাগের এইটাই হল প্রধান কারণ। এছাড়া আরও যে দুই-একটি গৌণ কারণ আছে তা এই: ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির আর কোন আশা নেই। অন্ততঃ আমার তাই ধারণা। তা ছাড়া কর্তব্যনিষ্ঠ কোন আদর্শ কর্মী সরকারী বিভাগীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সহানুভূতি পাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করেন, আমি অনুভব করেছি আমার পক্ষে আর তা পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রথম কারণ সম্বন্ধে আমার কথা হল, বর্তমান পদের দায়িত্বের তুলনায় আমি অনেক অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে সময়ের অনেক বেশী সদ্ব্যবহার করতে পারব। অস্বীকার করতে পারি না, যে-ব্যক্তি এতদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেননি, তাঁর পক্ষে এরকম ভাবা কিছু অন্যায় নয়। এই কষ্টসাধ্য কর্তব্যের সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেরি হলে স্বাস্থ্যের এত অবনতি ঘটবে যে ভবিষ্যতে অন্নসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করাই সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল, আমি মনে করি সরকারের

ঘাড়ে আমার মতামত চাপিয়ে দেবার কোন অধিকার আমার নেই। তা হলেও, কাজের সঙ্গে আমার মনের কোন যোগাযোগ নেই, এ সত্য চাকরির খাতিরে গোপন করে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাতে আমার কর্মক্ষমতার হানি হত। কাজের সঙ্গে মনের সংযোগ না থাকলে চাকরি করা হয়, কাজ করা হয় না। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে ইচ্ছুক নই। আমার যতদূর ক্ষমতা আমি ততদূর সাধ্য মতন উৎসাহের সঙ্গে আমার কর্তব্য পালন করেছি। মনে এই তৃপ্তি নিয়ে আমি অবসর গ্রহণ করছি।

বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের ব্যাপার নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ছোটলাট হ্যালিডেকে লেখা একখানি চিঠিতে, সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান করে দিয়ে, তিনি তাঁর পদত্যাগের কারণগুলি আরও স্পষ্ট করে জানান। তিনি লেখেন : "অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। তা যদি হত তা হলে দীর্ঘদিনের জন্য বিশ্রাম নিয়ে আমি আমার উন্নতি করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে সরকারী চাকরি করা নানাকারণে আমার কাছে অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। যে পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলাশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা চলছে, আমার ধারণা তাতে শুধু অর্থের অপব্যয়ই হচ্ছে, আসল কাজ বিশেষ কিছু হচ্ছে না। একথা আপনাকে বহুবার বলেছি। আপনি জানেন কতবার কাজে আমি বাধা পেয়েছি। তা ছাড়া ভবিষ্যতে কাজের দিক থেকেও আমার পদোন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব আমার দিক থেকে পদত্যাগ করার যে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।"

বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তকে হঠকারিতা মনে করে বাংলা সরকার তাঁর পদত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। একথা ঠিক, ধীরস্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করে, বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কোন কাজ করেননি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি কোন কাজ করতেন না। তাঁর সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে গভীর চিন্তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই পরিকল্পনাগুলি রচনা করতে তিনি যে কত বিনিদ্র রজনী

কাটিয়েছেন এবং কি কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। একবার কোন বিষয়ে চিন্তা করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছলে, এবং ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বা ভাল-মন্দ সম্বন্ধে একবার কোন ধারণা জন্মালে, তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ও ধারণা সহজে বদলাত না। নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাঁর একটা অস্থিরতা ছিল বটে, কিন্তু সেটা একটা অত্যন্ত জীবন্ত ও সক্রিয় মানুষের বাধাবন্ধহীন পথে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলার অস্থিরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অস্থিরতাই বাইরের চোখে হঠকারিতা বলে মনে হত, এবং মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও কাজের মধ্যে সংশয়ের কোন ধোঁয়া ছিল না কোথাও। আদর্শ যাঁর কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় লোভনীয় বস্তু, লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচার তাঁর মনে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা জাগাতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তগুলি তাই বাইরে থেকে অনড়, রূঢ়, এবং অনেক সময় অশোভন বলে মনে হত। আসলে সেটা একজন অচঞ্চল আদর্শবাদীর মনের আবেগের চঞ্চলতা ও ক্ষিপ্রতা ছাড়া কিছু নয়।

১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮ সাল, এই বার বছরের মধ্যে দীর্ঘ ন' বছর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পরিচালনা ও শিক্ষার ব্যাপারে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই ন' বছরের মধ্যে তিনি শিক্ষাসংস্কারের চারটি পরিকল্পনা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছেন। যখন সহকারী-সম্পাদক ছিলেন তখন একটি, সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে একটি, অধ্যক্ষতার কালে হ্যালিডের মারফত একটি, এবং ব্যালাণ্টাইনের মতামত প্রসঙ্গে একটি, এই চারটিই হল তাঁর শিক্ষাসংস্কারের প্রধান পরিকল্পনা। এই সব পরিকল্পনার ভিতরে আলোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষাদর্শের যে মূলসুরটি সর্বত্র ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, সেটি হল মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নত বাংলাভাষার ভিত্তির উপর সুসমৃদ্ধ নতুন বাংলা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগরের সমস্ত শিক্ষাচিন্তার মূল উৎস ও প্রেরণা হল এই আদর্শ। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি সংস্কৃত-বিদ্যা ও ইংরেজীবিদ্যা, অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা দুয়েরই আন্তরিক অনুশীলনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'ওরিয়েন্টালিস্ট' বা 'অ্যাংলিসিস্ট' কারও পদাঙ্ক তিনি অনুসরণ করেননি, উভয়েরই যুক্তিতর্ক তাঁর

কাছে অসার ও ভ্রান্ত মনে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার এইটাই হল শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃত কলেজ ছিল তাঁর এই শিক্ষাচিন্তার ও শিক্ষাদর্শের বাস্তব পরীক্ষার প্রধান ল্যাবোরেটরী। আদর্শ চরিতার্থ করার পথে পদে-পদে অনেক রকমের অন্তরায় দেখা দিয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তাদের ও সহযোগীদের নানাবিধ চিন্তার ও নীতির অন্তরায়, এবং অনেক সময় তাঁদের চারিত্রিক দৈন্য ও বিদ্বেষের অন্তরায়। তার বিরুদ্ধে একাই তিনি দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করেছেন। নিজের স্বার্থে নয়, নবযুগের বাংলার নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে। তাঁর সারাজীবনের শিক্ষাচিন্তার সার কথা হল : এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং বিদেশের নতুন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানসম্পদ আহরণ করে বাংলাশিক্ষার, বাংলাভাষার এবং বাংলাসাহিত্যের পাকাপোক্ত বনিয়াদ রচনা করা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কেবল ইংরেজীবিদ্যা শিখে যাঁরা আধাফিরিঙ্গী হবেন, অথবা প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা শিখে টুলোপণ্ডিত হবেন, তাঁরা কেউ এ কাজের যোগ্য হতে পারবেন না। সংস্কৃত কলেজটিকে তাই বিদ্যাসাগর সেকালের টোল-চতুষ্পাঠী করতে চাননি, আবার তার সংলগ্ন হিন্দু কলেজের মতন 'দেশী সাহেব' তৈরির কারখানাও করতে চাননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিদ্যার সত্যকারের মিলনতীর্থ করতে চেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেজকে। কেবল সংস্কৃত কলেজ নয়, সারা বাংলাদেশ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনতীর্থ হোক, এই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা এবং সবচেয়ে রঙীন স্বপ্ন ছিল। সরকারী ও বেসরকারী বহু বাধাবিপত্তির জন্য তাঁর কামনা তিনি সম্পূর্ণ চরিতার্থ করতে পারেননি। যতটুকু পেরেছেন তাতেই নবযুগের বাংলার নব্যশিক্ষার ভিত ও কাঠামো দুইই দৃঢ় হয়েছে।

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাস অতীতের প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। বিদ্যাসাগরের বাংলাশিক্ষা প্রচলন প্রসঙ্গে তার অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে আমরা সংক্ষেপে তার বিভিন্ন পর্বগুলির বিবরণ দেব। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের পটভূমি হিসেবে এই ইতিহাসের কঙ্কালটুকু অন্তত জানবার প্রয়োজন আছে।

প্র থ ম প র্ব। কোম্পানির আমলে প্রথমদিকে এদেশের লোকের শিক্ষাসম্পর্কে বিদেশীদের কোন চৈতন্য ছিল বলে মনে হয় না। দ্রুত-পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাও বিশেষ ছিল না। তাছাড়া তখন যাঁরা এদেশের রাষ্ট্র-দুর্যোগের মধ্যে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা যতটা না রাজনৈতিক ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন লাভক্ষতির হিসাবসচেতন বণিক। সুতরাং রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠার চিন্তা ছাড়া তাঁদের একমাত্র অন্য চিন্তা ছিল বাণিজ্য ও মুনাফা। শিক্ষা বা সংস্কৃতির মতন অবাণিজ্যিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ ছিল না তাঁদের। ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পাবার পরেও বেশ কিছুকাল তাঁরা এ-বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেননি।

দ্বিতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে। ইংরেজ শাসকরা তখন এদেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃত ও আরবীবিদ্যার প্রতি অনুরাগী হয়ে, তার অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন। ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ক্লাসিকাল প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের সূত্রপাত হয়। এদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা তখনও মুসলমানী রীতিতে চলত। আদালতের জন্য এবং অন্যান্য কিছু-কিছু রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের জন্য শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু কর্মচারীর প্রয়োজন হত। কলকাতার মাদ্রাসা ও বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ প্রধানত এই শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান কর্মচারী সরবরাহের জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া ইংরেজদের ক্লাসিকাল বিদ্যার প্রতি অনুরাগের আর কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না।

তৃতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্বে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যমের কিছু-কিছু প্রকাশ দেখতে পাই। কিন্তু কোন সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময় থেকে এদেশের লোকের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোম্পানির প্রতিনিধিরা অবহিত হতে থাকেন। ১৭৯২ সালে চার্লস গ্রাণ্ট শিক্ষাসম্পর্কে তাঁর মতামত একটি দীর্ঘ প্রস্তাবাকারে রচনা করে 'কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর'দের কাছে পেশ করেন। এদেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, না ইংরেজীভাষার মাধ্যমে শিক্ষা—এই বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে যে প্রবল তর্ক-বিতর্ক হয়, গ্রাণ্টের এই প্রস্তাবের মধ্যে সর্বপ্রথম বোধ হয় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৭৯২ সালে গ্রাণ্ট শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত-সম্বলিত যে প্রস্তাবটি রচনা করেন তার দীর্ঘ শিরোনাম হল: "Observations on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain, particularly with respect to Morals; and on the means of improving it." তাঁর বক্তব্যের মর্ম এই:

"অন্ধকার দূর করতে হলে আলোর প্রয়োজন। হিন্দুরা ভুল করে, কারণ তারা অজ্ঞ; এবং তাদের ভুল কোথায় তাও তাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের জ্ঞানবিদ্যার আলোক তাদের দান করতে

হবে, তবেই তাদের ভুলভ্রান্তি ও সংস্কার দূর হবে। যদি স্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার প্রসার তাদের মধ্যে করা যায়, তা হলে ফলাফল নিশ্চয় শুভ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

"দুই উপায়ে আমি এই বিদ্যার প্রসারের কথা ভেবেছি। একটি উপায় হল, যাদের শিক্ষা দিতে হবে তাদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ; দ্বিতীয় উপায় হল, আমাদের নিজেদের ইংরেজীভাষা শিক্ষার বাহন করা।" এর পর নানারকম যুক্তির অবতারণা করে গ্রাণ্ট শেষ পর্যন্ত ইংরেজীভাষায় শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন : "অতএব আমাদের ধারণা হল, ইংরেজীভাষার মাধ্যমে হিন্দুদের নতুন শিক্ষা দিতে কোন বাধা নেই। ধীরে ধীরে তাদের ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। একটু ধীরে ও সাবধানে এই শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া ভাল, কারণ ব্যস্ত হলে বা তাড়াহুড়ো করলে এটা তাদের কাছে বিদ্রূপের ব্যাপারও হতে পারে। ইংরেজী সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন ও বিজ্ঞান সব বিষয়ই তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার, কিন্তু ধীরেসুস্থে দেওয়াই ভাল। এই শিক্ষা দিতে পারলে নানা-বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে।"[১]

চার্লস গ্রাণ্টের ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে এই যুক্তি পরে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই তর্কের অবসান হয়নি, এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও মধ্যে মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠে, শিক্ষার এই বহুপুরাতন সমস্যাটি প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে।

চতুর্থ পর্ব। এদেশের শিক্ষাসমস্যাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করা হল ১৮১৩ সালে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৩ সালের সনন্দে এদেশের শিক্ষার খাতে রাজস্ব থেকে কমপক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন। ১৮১৪, ৩ জুন ইংলণ্ড থেকে 'কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস' স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাবিষয়ে একটি নির্দেশপত্র পাঠান। তাতে ভারতীয়দের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তাঁরা নানাভাবে উৎসাহ দেবার কথা বলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী প্রায় দশবছরের মধ্যে ভারত-সরকার শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখনীয় কিছু করেননি।

পঞ্চম পর্ব। ১৮২৩-২৬ সাল, এই চার বছরকে শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র পর্ব বলে নির্দেশ করার কারণ হল, এই সময় সরকার জনশিক্ষার

প্রসারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তার মধ্যে প্রধান হল, কলকাতায় ১৮২৩ সালে 'কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন', ১৮২৬ সালে মাদ্রাজে অনুরূপ একটি কমিটি এবং ১৮২৩ সালে বোম্বাইয়ে 'এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা। কলকাতার শিক্ষা-কমিটিকে বরাদ্দ একলক্ষ টাকা খরচের ভার দেওয়া হয়। কমিটির আমলে শিক্ষার এমন কিছু উন্নতি হয়নি যা উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে পূর্বের শিক্ষাধারার কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ইংরেজী, না বাংলা, কোন্ ভাষা শিক্ষার বাহন হবে, তাই নিয়ে তখন শিক্ষিত-সমাজের মনে বেশ দ্রুত মেঘ জমছিল মনে হয়। মধ্যে মধ্যে উভয়দলের পণ্ডিতদের যুক্তিতর্কের ঘর্ষণে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল। শিক্ষিতশ্রেণীর মনের আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাসের সমস্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ১৮৩৫, ৭ মার্চ বেণ্টিঙ্ক তাঁর 'মিনিটে' লেখেন: "ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারই ব্রিটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষাবাবদ সমস্ত অর্থ কেবল ইংরেজীশিক্ষার জন্যই ব্যয় করলে ভাল হয়।" বেণ্টিঙ্কের এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই এদেশে শিক্ষার ধারা বদলে যায় এবং ইংরেজীই হয় উচ্চশিক্ষার প্রধান বাহন।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্র করে বাংলার শিক্ষিত-সমাজে এই সময় তর্কের ঝড় ওঠে। ইংরেজীশিক্ষার পক্ষপাতী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের যুক্তি মোটামুটি এই:[২]

"আমাদের সমাজে আরবী ও সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত, এবং সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ দেখলেই বোঝা যায়, সেই শিক্ষার ফল কি হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রভাবে পশ্চিমের দেশগুলির যে কত দ্রুত উন্নতি হয়েছে তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। ইংরেজীভাষার মাধ্যমেই ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমের সঙ্গে। ভারতের উন্নতি ও প্রগতি সেই কারণেই ইংরেজীভাষার চর্চার উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা ও ইংরেজীশিক্ষা ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

"আরবী ও সংস্কৃতশিক্ষার উপর যাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা

সেকালের অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের স্থায়িত্ব কামনা করেন। প্রাচ্য-বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের আরবী ও সংস্কৃতভাষায় কোরান, বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তাঁরা সেই শিক্ষা পেয়ে জবরদস্ত মৌলবী ও গোঁড়া পণ্ডিত তৈরি হন। নবযুগের সমাজে এই ধরনের গোঁড়া পণ্ডিতদের সামাজিক ভূমিকা প্রগতিশীল না হবারই কথা। নতুন জ্ঞানবিদ্যার প্রতি সাধারণত তাঁরা বিমুখ। ব্রিটিশ সরকার এতদিন এই ধরনের পণ্ডিতশ্রেণী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের পণ্ডিত ও মুনশীর পদে নিযুক্ত করে ও অন্যান্য সরকারী চাকুরি দিয়ে তাঁরা এই বিদ্যাচর্চাকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করেছেন। আরবী ও সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি ছেপে তাঁরা যে কি প্রচুর অর্থ অপব্যয় করেছেন তার হিসেব নেই। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ও গতানুগতিক চিন্তাধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য করা হয়েছে। ইংরেজী-শিক্ষার প্রসারের জন্য যদি তার সামান্য অংশও সরকার ব্যয় করতেন, তা হলে দেশের ও দশের অনেক বেশী কল্যাণ হত। প্রাচ্যবিদ্যাকে এইভাবে উৎসাহিত করে ব্রিটিশ সরকার কুসংস্কারের সমর্থক একদল দুর্ধর্ষ সৈনিক তৈরি করেছেন মাত্র।”

পাশ্চাত্ত্যবাদীদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রাচ্যবাদীরাও অনেক যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিদেশী পণ্ডিতরাও ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থনে বলেন:[৩] “কলকাতা শহরের সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর মধ্যে খুব বড় একটা অংশের ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁরা অনেকে ইংরেজীশিক্ষার প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে ভাল ভাল চাকরিও পেয়েছেন। কলকাতার বাইরে ইংরেজীশিক্ষার সুযোগ ও প্রেরণা বিশেষ কিছু ছিল না বলা চলে। ইংরেজীশিক্ষার ব্যাপক কোন পরিকল্পনা এই জন্যই করা সম্ভব হয়নি, এবং করলেও তা সফল হত কিনা বলা যায় না। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা উচিত, জাতীয় সাহিত্য কেবল জাতীয় ভাষার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞানবিদ্যার চর্চা যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা হলে সেটা সমাজের একদল মুষ্টিমেয় লোক, যাঁদের অর্থ ও অবসর দুইই আছে, তাঁদেরই বিলাসের বিষয় হয়ে ওঠে। একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেক

ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজীভাষার মৌলিক পার্থক্য এত বেশী যে ইংরেজী কখনই এদেশের শিক্ষার প্রধান বাহন হতে পারে না। ইংরেজীর চর্চা বিশেষভাবে করা হলেও তা কেবল এদেশে সংকীর্ণ শ্রেণীগত সাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করবে, কোনদিনই জনসাহিত্যের ভিত গড়ে তুলবে না।"

পাশ্চাত্ত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদী দুই দলেরই মূল বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। নতুন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রসারে ধীরে ধীরে এদেশের মানুষের মন থেকে নানারকমের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির মোহ যে কেটে যাচ্ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের বিশাল জনসমাজের কতটুকু অংশ সেই শিক্ষা পাচ্ছিলেন তা নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। যাঁরা শিক্ষার সেই সুযোগ গ্রহণ করছিলেন তাঁদের মধ্যে ক'জন যথার্থই পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে করছিলেন, এবং ক'জন রাজভাষা শিক্ষা করে ইংরেজের অধীনে চাকুরি পাবার প্রত্যাশায় করছিলেন, তাও বিচার্য বিষয়। প্রগতিশীল আদর্শের প্রেরণা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইংরেজীশিক্ষার ব্যাকুলতা বাংলার মধ্যবিত্ত-সমাজের একাংশের মধ্যে তখন যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রধান কারণ হল চাকুরির প্রলোভন। এ-সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রিকায় একজন পত্রলেখক লেখেন :[৪]

> এতদ্দেশস্থ মনুষ্যগণের স্বদেশীয় বিদ্যানুশীলনে অনাদর ও অমনোযোগ, অনুরাগ (?) ও অশ্রদ্ধা সম্পূর্ণরূপে জন্মিয়াছে, যে হেতু বঙ্গভাষাতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয় না, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ভাষাতে সুশিক্ষিত হইলেই অনায়াসে যথেষ্ট ধনার্জ্জন করিবার ক্ষমতা হইতে পারে, তজ্জন্য এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা স্ব স্ব তনয়বৃন্দকে শৈশবকালাবধি অর্থলোভে লুব্ধ হইয়া অত্যন্তিক যত্নপূর্ব্বক ইংরাজী পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রেরণ করেন, ইংলণ্ডীয় বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হইলে এইক্ষণে যাবতীয় রাজকীয় কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হওয়া যায়, ও উচ্চপদ প্রাপ্তদ্বারা সর্ব্বসাধারণের সমীপে অত্যন্ত মর্য্যাদা ও সম্মান ও প্রশংসালাভ করা যায় ও স্বদেশে কিম্বা বিদেশে খ্যাতাপন্ন ও মহাশয় ও মান্যবর ও সর্ব্বাগ্রগণ্য ও স্বদেশস্থ

লোকদিগের সাধ্যানুসারে মঙ্গল করিতে সক্ষম হওয়া যায় ও ধনী হইয়া আত্মসম্বন্ধীয় মানব সমূহকে ভরণপোষণ পরিধান প্রদান করত তাহারদিগকে নিয়ত সানন্দিত করা যায় ও যাহারা দীন দরিদ্র ও অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর হইয়া কঠোর জঠরজ্বালাতে সর্ব্বদা ব্যাকুল ও শীতকালে বস্ত্রব্যতিরেকে দুগ্ধপোষ্য বালক কোলে করিয়া রোদন করত শীতে থরথর কম্পিতকলেবর হয় তাহারদিগকেও স্বোপার্জ্জিত অর্থদান দ্বারা অব্যক্ত দুঃখ হইতে মুক্ত করা যায়, অতএব তন্নিমিত্তে অস্মদ্দেশীয় মানব মণ্ডলী ইংরাজী বিদ্যোন্নতি করিতে আসক্ত হয়েন। আমারদিগের এই বঙ্গদেশ ইংরাজ লোকেরদের হস্তগত হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত জাতীয় ভাষাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে তাঁহারদের সহিত বাক্যালাপ ও মিত্রতা ও সদুপদেশ বিষয়ে তর্ক ও বাণিজ্যেত্যাদি করিতে পারি?......ইংলণ্ডীয় ভাষা যৎকালীন এতদ্দেশে পদার্পণ করে নাই তৎকালে কোন পণ্ডিত ব্যক্তিও দেশীয় বৃত্তান্ত ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেশের নাম শ্রুত হয়েন নাই, অতএব ইংলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যয়নে জ্ঞানের প্রশস্ততা হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় লোকেরা স্বেচ্ছাতে উক্ত দেশীয় ভাষাভ্যাস করিয়া থাকেন।......

ইংলণ্ডীয় বিদ্যাভ্যাসে একাধিক উপকার কিন্তু স্বীয় ভাষাতে সর্ব্বাগ্রে নিপুণ হইয়া তদনন্তরে ইংলণ্ডীয় ও আর ২ অপরদেশীয় ভাষাভ্যাস করত সাধ্যানুসারে জ্ঞানোন্নতি করিয়া পারদর্শি হইতে চেষ্টা করা উচিত, কারণ স্বদেশীয় বিদ্যা অগ্রে না শিখিয়া পরদেশীয় ভাষাভ্যাস করিলে দেশীয় ও বিদেশীয় নর সমূহের সমীপে নিন্দনীয় উপহাসের যোগ্য ও লজ্জিত হইতে হয়।

ভাষা প্রাচীন ও জটিল হলেও পত্রলেখকের যুক্তির মধ্যে কোন জটিলতা নেই। ইংরেজীশিক্ষার সমর্থনে পাশ্চাত্ত্যবাদীরা গুরুগম্ভীর ভাষায় যে-সব যুক্তির অবতারণা করতেন তখন, তার প্রত্যেকটি যুক্তি এই পত্রের মধ্যে সহজ ভঙ্গিতে লেখক প্রকাশ করেছেন। ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে অনেক কথা বলেও পত্রলেখক শেষকালে বলেছেন যে নিজের মাতৃভাষা ভালভাবে শিক্ষা না করে কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশী ভাষার চর্চা করলে, দেশের লোকের কাছে

হাস্তাস্পদ হতে হয়। দুঃখের বিষয় যাঁরা প্রবল আগ্রহে ইংরেজীশিক্ষার দিকে তখন ঝুঁকেছিলেন, তাঁরা একথা প্রায় ভুলে গিয়ে নিজের মাতৃভাষাকে প্রকাশ্যে উপেক্ষাও করতেন। হিন্দুকলেজ তখন ইংরেজীশিক্ষার সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা শহরে। সেখানে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরাই লেখাপড়া শিখতেন। কেবল যে তাঁরা ইংরেজী শিখতেন তা নয়, বাংলাও তাঁদের শিখতে হত। কিন্তু হিন্দুকলেজে বাংলাশিক্ষার কি দুরবস্থা হয়েছিল, তা সমসাময়িক এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় :[৫]

> আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিত মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত তত্রস্থ ছাত্রগণের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই, ঐ ডিপার্টমেণ্টের নিম্ন চারি শ্রেণীতে কেবল গৌড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও অনুবাদ করণ দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষা হয়;··· আমরা জানিতে প্রার্থনা করি যে এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তক সংগ্রহার্থে সে সাব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কি করিলেন? এবং এক্ষণে এতদ্দেশে, কৌন্সেল আব এডুকেসনের অধীনে যে সকল পাঠশালা আছে তাহাতে গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষাদানের বিষয়ে কৌন্সিলেরই বা মত কি? এদেশের লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এদেশের ভাষার আলোচনা করা অতি কর্ত্তব্য আর এই ব্যাপার প্রয়োজনীয় ও উপকারক অতএব ইহাকে সফল করিবার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক।···

এই বিবরণটি 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একাংশ। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের অন্যতম মুখপত্র ছিল। ইংরেজীশিক্ষার প্রধান অধিবক্তা ছিলেন 'ইয়ংবেঙ্গল' দল। তাঁরা তাঁদের মুখপত্রে হিন্দুকলেজে বাংলা শিক্ষাপ্রণালীর কঠোর সমালোচনা করে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন, এটা লক্ষ্য করার মতন বিষয়। বোঝা যায়, অনাদৃত বাংলাভাষার প্রতি ইংরেজী-অনুরাগীদেরও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।

১৮৪৮ ও ১৮৫৬ সালে রাজনারায়ণ বসু বাংলাভাষার অনুশীলন সম্পর্কে

মেদিনীপুরে দুটি বক্তৃতা দেন। শেষোক্ত বক্তৃতাতে, আট বছর পরে হলেও, তিনি তাঁর প্রথম বক্তৃতার বিষয় পুনরুল্লেখ করেন। দীর্ঘ হলেও তাঁর এই বক্তৃতা আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে, তার অনেকটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :[৬]

> ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা সাধারণ লোককে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃত ও আরবি ভাষাদ্বয়ের বিদ্যালয় সকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। তৎকালে তাঁহারা উক্ত ভাষাদ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। ঐ ভাষাদ্বয়ের ছাত্রগণকে বহু মূল্য পারিতোষিক ও উচ্চ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে উক্ত দুই ভাষাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অনুবাদ জন্য অধিক বেতনে অনুবাদক সকল নিযুক্ত করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে ঐ সকল অনুবাদকের মধ্যে যাঁহাদিগের অনুবাদ অস্পষ্ট হইত, তাঁহাদিগের অনুবাদিত পুস্তকের ব্যাখ্যাতা পদে আবার তাঁহাদিগকেই বিলক্ষণ বেতনে নিযুক্ত করিতেন। বিশালাকার সংস্কৃত ও আরবি মূল গ্রন্থ ও উক্ত ভাষাদ্বয়ে অনুবাদিত গ্রন্থসকল এত অধিক মুদ্রিত হইল যে তৎকালের শিক্ষা সমাজের দীর্ঘপুস্তকাগারে সে সকল রাখিবার স্থানের অভাব হইয়া উঠিল, ও বৃহৎ বৃহৎ দারুনির্ম্মিত পুস্তকাধার সকল গ্রন্থভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু এত যত্ন ও এত ব্যয়ে অল্পই ফলোদয় হইল। ইউরোপীয় ভাষা হইতে নিকৃষ্ট-রূপে অনুবাদিত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোকের বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না; তদ্দ্বারা মনের দীনতা ও কুসংস্কার দূরীভূত না হইয়া বরং বদ্ধমূলই হইতে লাগিল। আরবি ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; উক্ত ভাষাদ্বয় প্রণীত পুস্তকাপেক্ষা ইংরাজি ভাষার পুস্তক সকল অপেক্ষা-কৃত অধিক বিক্রীত হইতে লাগিল; বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় ভাষা

তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগর

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রথম বিধবাবিবাহ করেন

শিক্ষা করাইবার জন্য মহাবিদ্যালয় হিন্দু কলেজ বিনা রাজ সহায়ে কেবল কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয়দিগের ব্যয়ে ও যত্নে সংস্থাপিত হইল। এমত সময়ে মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম বেন্‌টিন্‌ক সাহেব যাঁহার ন্যায় পারগ ও ধর্ম্মশীল গবর্ণর জেনারেল এতদ্দেশে কখন আগমন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য এই দেশ অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ঞি মার্চ দিবসীয় রাজবিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কর্ম্ম তদবধি ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত হইবেক ; এবং পূর্ব্বে যে অর্থ আরবি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজি-ভাষা-শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যালয় লোকসমীপে অত্যন্ত আদৃত, সেই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত ঐ প্রকার অন্য সকল বিদ্যালয় ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিণী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এই সময়াবধি ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল ; সাধারণ লোকে ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল ; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের গবর্ণর জেনারেল শ্রীযুক্ত লার্ড অকলেণ্ড সাহেব সাধারণ শিক্ষাকার্য্য সম্বন্ধীয় স্বকীয় অভিপ্রায় প্রতিপাদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে যদবধি বাঙ্গলা ভাষাতে বালকদিগের শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তকসকল প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষাকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। যখন ঐ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তখন জেলা ইস্কুলে আর ইংরাজিতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম প্রদেশোজ্জ্বলকর ও তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত টমাসন্ সাহেব দেশের প্রচলিত ভাষাতে অল্প ব্যয়ে

অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে ইহা স্থির করিয়া গ্রামে গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক ঐ দেশের প্রচুর হিত সাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন্ সাহেবের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এত দিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের যত্ন দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নূতন বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে এ প্রকার বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হইয়াছে। এত দিবস পরে এতদ্দেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জনগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহার পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর জেনরেল হার্ডিঞ্জ সাহেব ১০১ পাঠশালা এতদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভঙ্গ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব রাজকীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি উক্ত আপন বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে "তোমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে তোমরাই কেবল ইউরোপীয় বিদ্যানুশীলন করিতেছ; ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ সকল বাঙ্গলা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া স্বদেশস্থ লোকের অশেষ হিতসাধন করিতে পার"। ডিপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্ সাহেব হুগলি কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন "কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা

করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অথবা ইংরাজি গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।”

যাহা হউক এত দিবস পরে বাঙ্গলা ভাষা দ্বারা সাধারণ জনগণকে শিক্ষা প্রদান করিবার উপায় হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। পরিবারের ভরণ পোষণের উপায়ের জন্য সাধারণ লোকদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান আবশ্যক, যে হেতুক লোকে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় তত পর ভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকন্তু বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রূপ ইংরাজিতে শিক্ষা প্রদান হয় না। ইংরাজি ভাষার ইংরেজ শিক্ষক দিগের অত্যন্ত দূর দেশ হইতে এখানে আসিতে হয় এবং ঐ ভাষার এতদ্দেশজাত শিক্ষক দিগের পঠদ্দশা কালীন অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘকালে ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতে হয় এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজি শিক্ষক অল্প বেতনে দুর্ল্লভনীয়, অতএব সকল দিক্ বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা পল্লিগ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পল্লিগ্রামে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য, কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাচরণ ও কত পরস্পর অবিশ্বাস প্রবল রহিয়াছে।

পল্লিগ্রামস্থ লোকেরা বিদ্যা অভ্যাস করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ হইবেক, তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে, তাহারা রাজপ্রদত্ত স্বকীয় ক্ষমতা সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে এক্ষণাপেক্ষা অধিক ক্ষমবান্ হইবে ও ভূস্বামী ও রাজকর্ম্মচারি দিগের দ্বারা তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইবে। পরন্তু তাহারা জ্ঞাত হইবে যে কেবল ভূমি কর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখানে জন্মগ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে যাহার মার্জ্জন ও উন্নতির প্রতি তাঁহার সুখ অনেক অংশে নির্ভর করে।*

বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, সে সকল উপকার সকল লোকের বোধসুলভ কিন্তু তদ্দ্বারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা এরূপ বোধসুলভ নহে, অতএব তাহা বাহুল্যরূপে প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যত উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবে ততই উত্তমোত্তম কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অন্যূন আট বৎসর হইল আমি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্বরণার্থ সাম্বৎসরিক সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাতে আমি অনেক উদাহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবধি সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় হয়েন না আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদয় হইতে থাকেন।

রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতার মধ্যে বাংলাদেশে সরকারী শিক্ষানীতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং ইংরেজীশিক্ষার প্রতি অন্ধ

* শেষ কয়েক পংক্তিতে যে ভাব ব্যক্ত আছে তদনুযায়ী ভাব বঙ্গদেশ-হিতৈষী পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত হজসন্ প্রেট সাহেব কোন জেলাস্কুলের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

অনুরাগ থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষার আবশ্যকতা, বাংলার শিক্ষিতসমাজ কিভাবে ধীরে ধীরে অনুভব করছিলেন তারও পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সালে ইংরেজী ও মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয় নিয়ে শিক্ষাপরিষদে যখন আলোচনা হয়েছিল তখন পরিষদের অর্ধেক সভ্য ইংরেজীর পক্ষে, এবং বাকি অর্ধেক সংস্কৃত ও আরবীর পক্ষে ছিলেন। ১৮৩৫ সালের সরকারী প্রস্তাবে কেবল ইংরেজীর কথা উল্লেখ করা হয়, বাংলার কথা বলা হয় না। সাধারণের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে মনে করে শিক্ষা-কমিটি তাঁদের প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে যে মন্তব্য করেন তার মর্ম এই :[৭]

"আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব একেবারেই অস্বীকার করি না, এবং তাকে যে সর্বতোভাবে উৎসাহ দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট সচেতন। ৭ মার্চ, ১৮৩৫-এর প্রস্তাব গ্রহণের সময় এই কথা মনে রেখেই আমরা ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত করেছি। আমরা বিচার করে দেখেছি যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া অনেক ভাল। যদি ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত ও আরবীতে শিক্ষা দেওয়া হত, তা হলেও অবশ্য মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন থেকেই যেত। সংস্কৃত ও আরবী তো আর মাতৃভাষা নয়? সুতরাং আমরা পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিয়ে, কেবল এইটুকু সিদ্ধান্ত করেছি যে এই বিদ্যা আরবী ও সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া অনেক বেশী সহজ ও সঙ্গত। ভবিষ্যতে সমস্ত শিক্ষাই যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে হয়, সেদিকে আমাদেরও লক্ষ্য ছিল। মাতৃভাষার গুরুত্বকে আমরা কখনও অস্বীকার করিনি, করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই।"

কমিটির এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধেয়, কারণ শিক্ষার বিষয় নিয়ে ইংরেজী-বাংলার মধ্যে কোন বিতর্ক হয়নি, একদিকে সংস্কৃত-আরবী ও অন্যদিকে ইংরেজীভাষার উপযোগিতা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। তাই হবার কথা, কারণ মাতৃভাষা বাংলার এতদূর বিকাশ তখনও হয়নি যাতে তাকে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার বাহন করে তোলা যেতে পারে। ক্লাসিকাল সংস্কৃত-আরবীর সে-রকম কোন সমস্যাই ছিল না। এদেশের প্রাচীন ক্লাসিকাল ভাষাকে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষার বাহন না করে, ইংরেজীভাষাকে তার বাহন করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শিক্ষা-কমিটি খুব গুরুতর কিছু ভুল করেছিলেন বলে মনে হয় না। সংস্কৃত ও আরবী কোনদিনই এদেশের জনসাধারণের ভাষা ছিল না, মুষ্টিমেয় মৌলবী পুরোহিত ও অভিজাতগোষ্ঠীর ভাষা ছিল। সেই ভাষায়, পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা শিক্ষা দিলে জনসাধারণের বিশেষ কোন উপকার তো হতই না, পণ্ডিতদের মধ্যেও তার ফল বিপরীত হত বলে মনে হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনার মধ্যে এবং ব্যালাণ্টাইনের পরিকল্পনার উত্তরে, বিদ্যাসাগর এই কথাই শিক্ষাসংসদকে পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েছিলেন। পরে আমরা সে-বিষয়ে আলোচনা করব।

ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে গবর্নমেণ্ট নানাভাবে যে তাকে উৎসাহ দেবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জ ইংরেজী-বিদ্যায় কৃতী ছাত্রদের সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ করার প্রস্তাব করে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজীশিক্ষাকে উৎসাহিত করেন। তাঁর প্রস্তাবের মর্ম এই :[৮]

> বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষার অবস্থার কথা মনে করে এবং সেই শিক্ষাকে উৎসাহ দেবার জন্য, সরকার কৃতী ব্যক্তিদের উপযুক্ত রাজকার্যে নিয়োগ করতে সম্মত আছেন।

এই হার্ডিঞ্জই ১৮৪৪ সালে বাংলাদেশে কয়েকটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন এবং ১০১টি পাঠশালা স্থাপনও করেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর বক্তৃতায় তা উল্লেখ করেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এর আগে ১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্ক পাদ্রী উইলিয়ম অ্যাডামকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে গবর্নমেণ্টকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য কমিশনার নিযুক্ত করেন। অ্যাডাম ১৮৩৫, ১ জুলাই, ২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮, ২৮ এপ্রিল যথাক্রমে তিন খণ্ডে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারের কাছে পেশ করেন।[৯] কিন্তু অ্যাডামের অনুসন্ধানের ফলাফল ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত জানবার আগেই বড়লাট বেণ্টিঙ্ক, শিক্ষা-কমিটির সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলের পরামর্শে, ইংরেজী-শিক্ষার পক্ষে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পাঠশালাগুলির সংস্কার করে তারই উপর জাতীয় শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলার জন্য অ্যাডাম সাহেব যে

অভিমত প্রকাশ করেন, ওরিয়েণ্টালিস্ট ও অ্যাংলিসিস্টদের বিতর্কের তলায় তা চাপা পড়ে যায় এবং দীর্ঘকাল অজ্ঞাত থাকে।

হার্ডিঞ্জের পাঠশালাগুলি অল্পকালের মধ্যে, উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিদর্শকের অভাবে, প্রায় অচল হয়ে ওঠে এবং তাদের দ্রুত অবনতি হতে থাকে।[১০] হার্ডিঞ্জের এই প্রচেষ্টার পর, পরবর্তী নয়-দশ বছরের মধ্যে, সাধারণের শিক্ষার জন্য উল্লেখ্য আর কিছু করা হয়নি। হার্ডিঞ্জের পাঠশালাগুলির সঙ্গে শিক্ষক-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল ও বিদ্যাসাগর উভয়েই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হার্ডিঞ্জের পরে বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৫৪ সালে হ্যালিডের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এদিকে ১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ছোটলাট জেমস টোমাসন দেশীয় ভাষায় শিক্ষার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা খসড়া করে তাঁকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় টোমাসনের এই প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেছেন। টোমাসনের পরিকল্পনার সারকথা এই:[১১]

প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে 'মডেল স্কুল' স্থাপন করা হবে। চারিদিকের সব দেশী পাঠশালার আদর্শ হবে এই মডেল স্কুল। মডেল স্কুলের কাছ থেকে পাঠশালাগুলি উন্নত শিক্ষাপ্রণালীও নিজেরা গ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক জেলায় এইসব স্কুল পরিদর্শনের জন্য একজন করে ইন্‌স্পেক্টর থাকবেন, এবং দুটি তহ্‌শীলের জন্য একজন করে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর থাকবেন। স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী, পাঠ্যপুস্তক, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি তদারক করাই তাঁদের কাজ হবে। দেশীয় হিন্দী ও উর্দু ভাষা হবে শিক্ষার বাহন।

কেউ কেউ টোমাসনকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার আদিপ্রবর্তক বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু সুবিচার করতে হলে এই সম্মান পাদ্রী অ্যাডামের প্রাপ্য। অ্যাডাম কোন সরকারী সমর্থন বা উৎসাহ পাননি, তাই তাঁর সুচিন্তিত রিপোর্ট ও পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাজে-কাগজের স্তূপে সমাধিস্থ হয়েছিল। টোমাসনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সরকারী মহলে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল, তাই তাঁর পরিকল্পনার জন্য তিনি পর্যাপ্ত উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছেন। কে জানে, অ্যাডামের উপেক্ষিত রিপোর্টের খণ্ডগুলি টোমাসনের হাতে

পৌঁছেছিল কিনা এবং তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রসারের প্রেরণা পাদ্রী অ্যাডামের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা!

টোমাসনের পরিকল্পনার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেশের শিক্ষাব্রতীরাও তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের শিক্ষাসংসদের তাৎকালিক সেক্রেটারি ময়েট সাহেব সরকারের নির্দেশে উত্তর-পশ্চিমের স্কুলগুলি পরিদর্শন করার জন্য যান এবং একটি রিপোর্টও পেশ করেন। বড়লাট ডালহৌসি সেই বছরেই 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের' জানান যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে টোমাসনের শিক্ষাপরিকল্পনার অনুরূপ কোন পরিকল্পনা বাংলাদেশেও প্রবর্তন করা উচিত। এই সময় ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে ছোটলাটের পদ সৃষ্টি হয় এবং প্রথম ছোটলাট হন ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। ছোটলাটের পদে নিযুক্ত হবার দু'মাস আগে, শিক্ষাপরিষদের সদস্যরূপে হ্যালিডে বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত একটি 'মিনিটে' ব্যক্ত করেন। এই সময় বিদ্যাসাগরও হ্যালিডের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে, বাংলা-শিক্ষার প্রচলনের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করেন। হ্যালিডে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিটের' প্রেরণা পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার মর্ম এই :

১। বাংলাশিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না।

২। কেবল লিখন-পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলাশিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলাভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে, এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৩। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে এই বইগুলি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকরূপে গ্রহণযোগ্য : (ক) শিশুশিক্ষা—(পাঁচভাগ)। প্রথম তিনভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান ও পঠনশিক্ষা। চতুর্থভাগ—জ্ঞানোদয় বিষয়ে একখানি ছোট বই। পঞ্চমভাগ—চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স-এর অন্তর্গত নীতিপাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ।

(খ) পশ্বাবলী অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণ।

(গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের বইয়ের ভাবানুবাদ।

(ঘ) চারুপাঠ, অথবা প্রয়োজনীয় ও আর্কষণীয় বিষয় সম্বন্ধে পাঠমালা।

(ঙ) জীবন-চরিত—চেম্বার্স বায়োগ্রাফির অন্তর্গত কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল, লিনিয়স, ডুবাল, উইলিয়ম জোন্স, টমাস জেঙ্কিন্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর ভাবানুবাদ।

৪। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞানের বইও লেখা হয়েছে। ভূগোল, রাজনীতি, শারীরবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস হলেই চলবে।

৫। একজন শিক্ষক হলে চলবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত দুজন করে শিক্ষক দরকার। স্কুলগুলিতে সম্ভব হলে তিনটি থেকে পাঁচটি করে শ্রেণী থাকবে। কাজেই একজন শিক্ষক দ্বারা শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চলবে না।

৬। গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে পণ্ডিতদের বেতন কমপক্ষে তিরিশ, পঁচিশ অথবা কুড়ি টাকা হওয়া দরকার। আগেকার বইগুলি লেখা হলে যখন স্কুলের পাঠ্য হবে তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক অন্তত পঞ্চাশ টাকা বেতনে একজন করে হেডপণ্ডিত নিযুক্ত করতে হবে।

৭। কর্মস্থানেই শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে, অন্য কোন স্থান থেকে বেতন আনতে হলে চলবে না।

৮। হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারটি জেলা বর্তমানে আমাদের কাজের জন্য নির্বাচন করে নিতে হবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত বলে মনে হয়। চারটি জেলার মধ্যে, প্রয়োজন অনুসারে, এই বিদ্যালয়গুলি ভাগ করে দিতে হবে। নগর ও গ্রাম যেখানেই হোক, এই বিদ্যালয় যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে; দেখতে হবে তার কাছাকাছি যেন কোন ইংরেজী স্কুল বা কলেজ না থাকে। ইংরেজী স্কুল ও কলেজের আশে-পাশে বাংলাশিক্ষা যোগ্য সমাদর পাবে বলে মনে হয় না।

৯। বিদ্যালয়গুলি যদি সযত্নে তত্ত্বাবধান করা যায় এবং কৃতী ছাত্রদের যদি নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া যায়, তা হলে বাংলাশিক্ষার সাফল্য সম্বন্ধে

অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। কেবল বিদ্যার জন্যই বিদ্যা অর্জন করার মতন মনোভাব সাধারণ দেশবাসীর এখনও হয়নি। এইজন্য ছোটলাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব (চাকুরি), যা এতদিন চাপা ছিল, বিশেষভাবে কাজে লাগানো দরকার।

১০। বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের এই উপায়গুলি বিশেষ কার্যকর এবং অল্প ব্যয়সাধ্য হবে বলে মনে হয়।

১১। যাতায়াতের ব্যয় সমেত মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে দুজন বাঙালী পরিদর্শক রাখা প্রয়োজন। একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর-একজন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য। তাঁদের কাজ হবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজন মতন শিক্ষা-প্রণালী সংস্কার করা।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন। তার জন্য তাঁকে কোন আলাদা পারিশ্রমিক দিতে হবে না। কেবল যাতায়াতের খরচ দিলেই চলবে। এর জন্য বছরে তিনশ টাকার বেশী খরচ হবে বলে মনে হয় না। বছরে তিনি অন্তত একবার করে স্কুলগুলি পরিদর্শন করবেন এবং কর্তৃপক্ষকে একটি রিপোর্ট দেবেন। কর্তৃপক্ষের উপরেই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে।

১৩। গ্রন্থরচনা, পুস্তক ও শিক্ষক-নির্বাচনের ভার থাকবে প্রধান পরিদর্শকের উপর।

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ-শিক্ষার কেন্দ্র হয়েও বাংলা-শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য নর্মাল স্কুলরূপেও কাজ করবে।

১৫। এইভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, শিক্ষক নির্বাচন, পাঠ্যবই রচনা ও গ্রহণ এবং সাধারণ পরিদর্শনের ভার যদি একজন যোগ্য ব্যক্তির ওপর দেওয়া হয়, তা হলে অনেক অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

১৬। প্রধান পরিদর্শকের একজন সহকারী, মাসিক অন্তত ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করতে হবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে তিনি শিক্ষক-ট্রেনিং ও পাঠ্যবই রচনায় সাহায্য করবেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় যখন স্কুল পরিদর্শনের কাজে বেরুবেন তখন তাঁর স্থানে তিনি অস্থায়ীভাবে কাজ চালাবেন।

১৭। বর্তমানে গুরুমহাশয়েরা এদেশের যে পাঠশালাগুলি চালাচ্ছেন সেগুলি কোন কাজেরই নয়। যে-কাজে তাঁদের যোগ্যতা নেই, সেই কাজে তাঁদের নিযুক্ত করাতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। পরিদর্শকের কাজ হবে এই সব পাঠশালা দেখাশুনা করা এবং শিক্ষণরীতি সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশাদি দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা। আগে যে-সব পাঠ্যপুস্তকের কথা উল্লেখ করেছি, ক্রমে সেগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হবে। পাঠশালাগুলি যাতে আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৮। এদেশের লোক বা বিদেশী মিশনারীদের স্থাপিত যে-সব ভাল স্কুল আছে, সেগুলিকেও সাহায্য করা ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। কিভাবে তা করা যেতে পারে পরিদর্শকরা তা নিজেরা বিবেচনা করে ঠিক করবেন।

১৯। এইসব সরকারী স্কুলের আদর্শে শহরের ও গ্রামের অধিবাসীরা যাতে নিজেদের এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত হন, পরিদর্শকরা সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।—৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪

ছোটলাট হ্যালিডে এ-বিষয়ে তাঁর 'মিনিটে' যে অভিমত প্রকাশ করেন তার মূল অংশ এই :[১২]

"বাংলাদেশে অসংখ্য দেশী পাঠশালা আছে। এদেশের ও বিদেশের দুই শ্রেণীর লোকের কাছে অনুসন্ধান করে আমি জেনেছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ যাঁরা সেখানে শিক্ষা দেন তাঁরা অধিকাংশই অতি অযোগ্য ব্যক্তি। (২ প্যারা)

"এই পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতিসাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন ছোটলাট (টোমাসন) এ-বিষয়ে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, আমাদেরও তাই অনুসরণ করা উচিত। এমন কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন করা উচিত যা এই সব পাঠশালার কাছে আদর্শ-স্থানীয় হবে। নিয়মিত যদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এই মডেল স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা দেখে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা যাতে অনুপ্রাণিত

হয়ে নিজেদেরও উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন তার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। (২ প্যারা)

"এই বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অভিমত এই সঙ্গে পাঠালাম। সকলেই জানেন, বাংলাশিক্ষা প্রচারকার্যে বিদ্যাসাগর বহুদিন থেকেই বিশেষ উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী অনেক প্রাথমিক পাঠ্যবই রচনা করে তিনি এক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছেন। (৫ প্যারা)

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি তা মোটামুটিভাবে অনুমোদন করি। আমার ইচ্ছা, তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হোক। (৬ প্যারা)

"সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, তাঁদের সকলের মত এই যে, সরকারী মডেল স্কুলে প্রথমদিকে প্রবেশ-দক্ষিণা কিছু না থাকাই উচিত। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মতন মডেল স্কুলগুলিও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করতে পারবে। (১৩ প্যারা)

"শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু বলিনি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার ফলে এখন বেশ ভাল ভাল শিক্ষক গড়ে উঠছে। বর্তমান অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে সংস্কৃত কলেজই নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করেছে। (২৮ প্যারা)"

হ্যালিডের এই 'মিনিট' পাঠ করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, তাঁর প্রেরণার উৎস কোথায়? উৎস যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলাশিক্ষা-চিন্তা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের এই বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে হ্যালিডে, ছোটলাট হবার আগে থেকেই, শিক্ষাসংসদের সদস্যরূপে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। পূর্বে (৩০ জুন, ১৮৫২) হ্যালিডে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের যে বিখ্যাত 'নোটটি' শিক্ষাসংসদের কাছে পাঠিয়েছিলেন (পূর্বের অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তার মধ্যে তাঁর বাংলাশিক্ষার স্বপ্ন ও ধ্যানধারণা এমন সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল যা তাঁর আর অন্য কোন

পরিকল্পনার মধ্যে হয়নি। হ্যালিডে তখন 'নোটটির' সঙ্গে যে মন্তব্য করে পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের বাংলাশিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছিল। সুতরাং বাংলাশিক্ষার ব্যাপারে হ্যালিডে যে বিদ্যাসাগরের মতামতেরই প্রতিধ্বনি করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। হ্যালিডে তাঁর বাংলাশিক্ষার 'মিনিটে' মন্তব্য করেন :

"আমি জানি, মাথার উপর যদি কোন ইয়োরোপীয় পরিদর্শক বা কর্তা না থাকেন, তাহলে দেশীয় পরিদর্শকদের কাজকর্মের উপর খুব বেশী আস্থা রাখা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসামান্য ব্যক্তি, এবং তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের এই মডেল স্কুলের 'এক্সপেরিমেণ্টের' সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপর দেওয়া হয়েছে দেখলে আমি খুবই আনন্দিত হব। 'এক্সপেরিমেণ্টের' ফলাফল কি হয় তা দেখবার জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব, এবং আমি সত্যই মনে করি এ-কাজে তিনি সফল হবেন।"

শিক্ষাসংসদের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই—রামগোপাল ঘোষ, জেম্‌স্ কোলভিল প্রভৃতি—এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁদের মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করে তিনি অতিরিক্ত কাজ হিসেবে নতুন মডেল স্কুলের প্রধান পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করুন, এ-বিষয়ে তাঁদের আপত্তি ছিল। তাঁরা বলেন : "এই নতুন শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে-কোন দিক থেকে সংশ্লিষ্ট থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। পাঠ্যবই, শিক্ষক ও স্কুলের স্থান নির্বাচনে, শিক্ষণপদ্ধতি নির্ধারণে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁর উপদেশ খুবই মূল্যবান হবে।" একথা বলেও, স্কুলের প্রধান পরিদর্শকের পদটি তাঁকে দিতে তাঁরা সম্মত হননি। এর মূলে ব্যক্তিগত কোন কারণ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। বিরোধী সদস্যরা সত্যই হয়ত মনে করেছিলেন যে বিদ্যাসাগর এতগুলি দায়িত্বের গুরুভার একসঙ্গে বহন করতে পারবেন না। বিদ্যাসাগরের অফুরন্ত কর্মশক্তি সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক ধারণা ছিল বলে মনে হয় না, তাই সাধারণভাবে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাটাই তাঁরা বেশী করে ভেবেছিলেন। হ্যালিডে অবশ্য বিরোধীদের মতামত বিবেচ্য বলে

মনে করেননি, কারণ বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর অবিচলিত আস্থা ছিল। তাই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের নেতৃত্বেই তিনি বাংলাশিক্ষা প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

বাংলাশিক্ষা প্রচলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল দুটি—উপযুক্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তকের এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব। বিদ্যাসাগর তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সরকারী পোষকতার ফলে আর্থিক অন্তরায় দূর হলেও, এ দুটির অভাব দূর না হলে যে প্রকৃত বাংলাশিক্ষার পথ কখনই প্রশস্ত হবে না, বিদ্যাসাগরের এ-যুক্তির যাথার্থ্য তখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করতেন। এ-বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন : [১৩]

আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব সম্প্রতি শিক্ষা কৌন্সেলের অধ্যক্ষদিগের নিকটে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের জাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে যে যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহারা অবিলম্বে তাহার রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন, কারণ তিনি বেহার অঞ্চল ভ্রমণ করিবার পূর্ব্বেই তাহা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করিবেন, অতএব ইউনিবারসিটি, কালেজ ও স্কুল ও নানা স্থানের বাঙ্গালা পাঠশালার বালকদিগের বাঙ্গালা ভাষানুশীলন বিষয়ে কি কি নিয়ম করা কর্ত্তব্য, শিক্ষা কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বারগণ তাহাতে আশু মনোযোগি হইবেন, এবং তাহার পরেই তাঁহারদিগের পটল তুলিতে হইবেক।

বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ক নিয়ম নির্দ্ধারণের পূর্ব্বেই শিক্ষক ও পুস্তক নিরূপণ করা উচিত, উপযুক্ত শিক্ষক ও পুস্তক ব্যতীত শিক্ষার আধিক্য হইতে পারে না, অধুনা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তক পাঠার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আমরা তাহার সমুদয়ের প্রশংসা করিতে পারি না, পুস্তকাদি পরিবর্ত্তন করা অগ্রেই উচিত হইতেছে, এবং কতকগুলিন পাঠোপযোগি নূতন পুস্তকেরও আবশ্যক আছে··· রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যাকল্পদ্রুম পুস্তকও তদ্রূপ বলিতে হইবেক, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

> যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকদিগের শিক্ষার উপযোগি হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তৎপাঠে কোনরূপেই শিক্ষার আতিশয্য হইতে পারে না।
>
> আমারদিগের বন্ধুবর শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের বিরচিত চারুপাঠ দুই খণ্ড ও বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার পুস্তক সর্ব্ববিধায়েই উত্তম হইয়াছে, কিন্তু কি পরিতাপ! শেষোক্ত পুস্তকের অধিকাংশ কুম্ব সাহেবের পুস্তক হইতে অনুবাদিত হওয়াতে শিক্ষা কৌন্সেল তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, যাহা হউক ঐ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবেক, তাঁহার বিশিষ্ট রূপ বিবেচনা করা অতি আবশ্যক হইতেছে।......আমারদিগের বিজ্ঞ সহযোগি চন্দ্রিকা সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা সমাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতেও তিনি বিলক্ষণ সুপণ্ডিত, কিন্তু তিনি একাকী কোন দিক রক্ষা করিবেন।
>
> বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা বিষয়ে অধুনা যে যে অনিয়ম আছে তাহার কিয়দংশ আমরা উপরে লিখিলাম...বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষমহাশয়েরা জাতীয় ভাষানুশীলন নিমিত্ত যখন প্রচুরার্থ ব্যয় করণে সম্মত হইয়াছেন তখন তদ্বিষয়ক নিয়মাদি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করা কৌন্সেলের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে।

'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি একাকী কোনদিক রক্ষা করিবেন।" উপযুক্ত ব্যক্তিকে অনেক সময় 'একাকীই' সামাজিক সমস্যার সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে হয়। তা ছাড়া, সমাজে প্রায় সব সময়েই বড় বড় কথা বলার লোক যত বেশী পাওয়া যায়, কাজ করার লোক সেই তুলনায় দু-চার জনও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বিদ্যাসাগরের যুগও এর ব্যতিক্রম ছিল না, প্রকৃত কাজের লোকের তখনও বেশ অভাব ছিল। হ্যালিডে একথা ভালভাবেই

বুঝেছিলেন বলে সংসদের বিরোধী সদস্যদের মতামত বিশেষ গ্রাহ্য করেননি। তিনি বিদ্যাসাগরের উপরেই বাংলাদেশে মডেল স্কুলের স্থান নির্বাচনের ভার দিলেন। বিদ্যাসাগরকে এই কাজের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। ৩ জুলাই, ১৮৫৪ তিনি ছোটলাট হ্যালিডেকে একটি রিপোর্টে জানান যে ২১ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়, হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাঁতিহাল ভ্রমণ করেছিলেন, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলেন। আগ্রহ তাঁদের এত বেশী যে অনেকে নিজ খরচায় স্কুলগৃহ নির্মাণ করে দিতে সম্মত হন। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরিয়ে আসার জন্য তিনি হুগলী জেলার অন্যান্য স্থানে অথবা নদীয়া, বর্ধমান ও ২৪-পরগণা জেলাতে যেতে পারেননি। যেতে না পারলেও তিনি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রামের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। শেষকালে তিনি লিখেছেন, বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুমতি পাওয়া গেলে স্কুলঘর নির্মাণের জন্য দু-তিন মাস অপেক্ষা না করে, আমার নির্বাচিত স্থানগুলিতে অবিলম্বে যেন স্কুল খোলা হয়।[১৪]

ঠিক এই সময়, ১৯ জুলাই ১৮৫৪, 'বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের' সভাপতি স্যর চার্লস উড্ (Charles Wood) ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ' পাঠান। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এই 'ডেসপ্যাচ' একটি ঐতিহাসিক সনদের মতন। ভারতীয় এডুকেশন কমিশন (১৮৮২) এই 'ডেসপ্যাচের' উদ্দেশ্য সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :[১৫]

১। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ গঠন করা দরকার।

২। প্রেসিডেন্সি টাউনগুলিতে একটি করে 'ইউনিভার্সিটি' বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার।

৩। সকলশ্রেণীর স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত।

৪। বর্তমানে যে-সব কলেজ ও হাই-স্কুল আছে সেগুলি রক্ষা করা এবং তাদের সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক।

৫। নতুন মধ্য-বিদ্যালয় (Middle Schools) স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংলা পাঠশালা ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-গুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত।

৭। স্কুল-কলেজকে প্রয়োজন মতন সরকারী 'গ্রাণ্ট' দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চার্লস উডের এই শিক্ষা-সনদ এদেশে পৌঁছবার পর আগেকার শিক্ষা-সংসদের (Council of Education) বদলে 'ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' (Director of Public Instruction) নিযুক্ত হন এবং অল্প-কালের মধ্যেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর তার সদস্য ছিলেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর তিনি তার 'ফেলো' মনোনীত হন।[১৬]

১৮৫৩ সালে যখন নতুন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সনদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখন ভারতে কোম্পানির শাসনের ফলাফল ও অন্যান্য সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য লর্ডস ও কমন্সসভার দুটি 'সিলেক্ট কমিটি' গঠিত হয়। এই 'সিলেক্ট কমিটি' বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু পদস্থ ব্যক্তির কাছে থেকে নানাবিষয়ে যে-সব বিবৃতি ও আবেদনপত্র পান, তার অধিকাংশই ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। এই সময় শিক্ষা বিষয়ে বাংলার শিক্ষাসংসদের প্রেসিডেণ্ট চার্লস ক্যামেরন (Charles Hay Cameron) যে আবেদনপত্রটি পাঠান, আমাদের দেশে ইংরেজীশিক্ষার ইতিহাসে তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ক্যামেরন ভারতীয় কৌন্সিলের চতুর্থ সদস্য, ভারতীয় ল' কমিশনের সভাপতি এবং বাংলাদেশের শিক্ষাসংসদের সভাপতি ছিলেন। ক্যামেরন লেখেন :[১৭]

"শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে ভারতীয় যুবকদের ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কতখানি আছে, তা জানবার আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভাল শিক্ষা পেয়েছে তারা কোম্পানির সিবিল ও মেডিকাল সার্ভিসের, অথবা অন্যান্য বিদ্যাবৃত্তির কতখানি উপযুক্ত তাও আমি বিশেষভাবে জানি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও

বিজ্ঞানশিক্ষার পথে অন্তরায়ও আছে অনেক। তার প্রধান কারণগুলি এই :

১। প্রথম কারণ, ব্রিটিশ-ভারতে ইয়োরোপের মতন কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই যা শিক্ষার জন্য 'ডিগ্রী' দিতে পারে।

২। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় যুবকদের যাঁরা ইয়োরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা দেন তাঁরা কোম্পানির কোন কভনণ্টেড সার্ভিসে নিযুক্ত নন। সেইজন্য তাঁরা বিদ্বান ও প্রতিভাবান হলেও, ছাত্রদের কাছে তাঁদের সেরকম সামাজিক মর্যাদা নেই।

৩। তৃতীয় কারণ, ভারতীয় যুবকদের জাতিধর্মনির্বিশেষে ইংলণ্ডে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। এই কারণে আমার নিবেদন এই যে—

ব্রিটিশ-ভারতে একটি বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক।

সিবিল ও মেডিকাল সার্ভিসের মতন শিক্ষাবিভাগেও কভ্‌নণ্টেড সার্ভিসের প্রবর্তন করা হোক।

ইংলণ্ডে এমন দু-একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হোক যেখানে, এদেশের যুবকরা কভনণ্টেড সার্ভিসের উপযুক্ত হবার মতন শিক্ষা পেতে পারে।

•

ক্যামেরনের এই আবেদনপত্রের গুরুত্ব তাঁর এই সব দূরদর্শী শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষাকে ক্যামেরন কেবল বিদ্যাচর্চার বিশুদ্ধ বাসনার দিক থেকে, অথবা অন্তরের অনাবিল প্রেরণার দিক থেকে বিচার করেননি। তিনি প্রধানত ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শাসনের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে শিক্ষার উপযোগিতা বিচার করেছেন। তাই প্রকৃত শিক্ষার কথা তিনি আবেদনপত্রে প্রায় একেবারেই উল্লেখ করেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কথা বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 'মার্কা' বা ডিগ্রী দিতে পারে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করেছেন বলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কভনণ্টেড সার্ভিসের এবং ইংলণ্ডের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি ঐ একই কারণে অনুভব করেছেন। ক্যামেরনের প্রস্তাবিত পথেই পরবর্তীকালে দেশে ইংরেজীশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দুয়েরই অগ্রগতি হয়েছে, এবং আসল শিক্ষা যাই হোক, তার ফলে

দেশে 'ডিগ্রীধারী' শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমে বেড়েছে, ডিগ্রী হয়েছে কেবল চাকুরির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় পাসপোর্ট। এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময় বলেছিলেন: "আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাখা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি,—দেখাইয়া দিই এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এণ্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি. এ. হইয়া, কেহ বা এম. এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has; এক পাকের তৈরি কিনা!"[১৮]

চার্লস উডের ডেসপ্যাচের মধ্যে ক্যামেরন-নীতিরই জয় ঘোষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ইত্যাদি প্রধানত ইংরেজী উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় বাংলাশিক্ষা অনাদৃত ও উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বোক্ত 'সিলেক্ট কমিটির' কাছে হ্যালিডে এদেশে ইংরেজীশিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বাংলাশিক্ষার প্রতি সরকারী উদাসীনতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:[১৯] "There is an opinion also that education has not been extended sufficiently in the way of Vernacular teaching, and in that respect I see room for improvement..."

মাতৃভাষা বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে হ্যালিডের প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন বিদ্যাসাগর। একথা আগে বলেছি। তাই নতুন সরকারী নির্দেশ অনুসারে যখন ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (ডি. পি. আই.) নিযুক্ত হন, তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের উপর বাংলা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়ার অসুবিধা হয়। কলেজের কাজ করে বিদ্যাসাগর অবসর সময়ে মধ্যে মধ্যে বাংলা মডেল-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাইরে যেতে পারেন, এ-সম্বন্ধে বড়লাটের বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ থাকা-কালে তাঁকে এই সব বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করাতে

তাঁর আপত্তি ছিল। বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে অবশ্য মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন যে বিদ্যাসাগরের মতন একজন উদ্‌যোগী চিন্তাশীল ব্যক্তির আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাশিক্ষার কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না। সেইজন্য তিনি নতুন ডি. পি. আই.-কে অনুরোধ করেন যেন অন্তত গোড়ার দিকে কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগরকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। ডিরেকটরকে একখানি পত্রে লেখা হয়: [২০]

"শিক্ষাবিভাগের নতুন ব্যবস্থা সত্ত্বেও, অন্তত কিছুদিনের জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন একজন গুণী ব্যক্তিকে বাংলাশিক্ষা পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত করা উচিত বলে ছোটলাট মনে করেন। ছোটলাটের অনুরোধ, সংস্কৃত কলেজের কাজকর্মে কোনরকম বাধার সৃষ্টি না করে কি উপায়ে বিদ্যাসাগরকে বাংলা স্কুল-প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানো যায়, সে-সম্বন্ধে ডিরেক্টর যেন চিন্তা করেন।" (২৩ মার্চ, ১৮৫৫)

এই পত্রের উত্তরে ডি. পি. আই. প্রস্তাব করেন যে স্থায়ী কর্মচারী মিঃ প্র্যাটকে না পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে অস্থায়ীভাবে 'ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলের' কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ-প্রস্তাব ছোটলাট হ্যালিডের পছন্দ হয়নি। তিনি তাঁর 'মিনিটে' লেখেন: [২১]

> পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অস্থায়ীভাবে কাজে নিযুক্ত করে কোন লাভ নেই। তিনি একজন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, সেইজন্য বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি দৃঢ় মতামতও আছে। যদি তাঁকে তাঁর নিজের মতামত অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়, তবেই তিনি উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন, এবং নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যে পরিণত করতে। তিন মাস বা তিন সপ্তাহ পরে মিঃ প্র্যাট যখনই আসবেন তখনই তাঁকে বিদায় নিতে হবে, এরকম কোন শর্তে তাঁকে নিযুক্ত করলে তিনি কোন কাজ করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।
>
> আমার বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা ভারত-সরকার অনুমোদন করেছেন, তাতে তিন-চারটি জেলার উল্লেখ আছে মাত্র। সেই

জেলাগুলিতে নতুন বাংলা শিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে পরিণত করবার জন্য নির্দিষ্ট বেতনে যদি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রতিনিধি-সাবইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হয়, তা হলে তাতে আমি অন্তত কোন আপত্তির কারণ দেখি না। মিঃ প্র্যাটেরও তাতে কোন অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না, কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছাড়াও এমন অনেক ইংরেজী ও ইঙ্গবঙ্গ স্কুল ও কলেজ এইসব জেলায় আছে যা তিনি দেখাশুনা করতে পারবেন। ইনস্পেক্টররূপে কাজ করবার তাঁর যথেষ্ট সুযোগ থাকবে।

বাংলাশিক্ষার সমস্যা, আমি মনে করি, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করে এ-সম্বন্ধে আমি যা ঠিক করেছি তাই আপাতত সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে প্রথম রূপ দেবার সময় যদি তার একজন প্রধান উদ্‌যোগীকে এমনভাবে কাজে নিযুক্ত করা হয় যাতে তা বাধা পেতে পারে, এমনকি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, তা হলে সেটা রীতিমত আফশোসের কারণ হবে।

এর পর বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ডি. পি. আই.-কে এই মর্মে একটি পত্র লেখেন :[২২]

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মতন একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ছোটলাট কোন অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করার বিরোধী। বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে এত অল্পদিনের মধ্যে পণ্ডিত কিছু কাজ করে উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না। তাঁর চরিত্র ও গুণ বিচার করে এইভাবে তাঁকে কাজে নিয়োগ করাও অন্যায় হবে। যে-কোন মুহূর্তেই তাঁকে বিদায় করে দেওয়া যেতে পারে, এরকম শর্তে তাঁকে নিয়োগ করলে তাঁর প্রতি সরকারের অবিচার করা হবে।

সেইজন্য ছোটলাটের মত এই যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে এখনই যেন অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করে, কলকাতা শহরের কাছাকাছি তিন-চারটি জেলা তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে দেওয়া হোক। তাতে এই সময় অন্তত পণ্ডিতের কলেজের কাজকর্মে কোন অসুবিধা হবে না।···সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ছাড়া পণ্ডিতমহাশয়কে

এই কাজের জন্য মাসিক ২০০৲ টাকা বেতন ও যাতায়াতের খরচ দেওয়া হোক।

ছোটলাট হ্যালিডের এই মতামত জানতে পেরে ডি. পি. আই. বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। হ্যালিডের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী-ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ ছাড়াও, ১ মে ১৮৫৫ থেকে তিনি এই কাজের জন্য ২০০৲ টাকা উপরি মাসিক বেতন পেতে থাকেন।

বিদ্যাসাগরের কাজের উৎসাহ অফুরন্ত, বিশেষ করে সেই কাজ যদি তাঁর মনের মতন কাজ হয়। সমস্ত মনপ্রাণ তিনি সেই কাজে সমর্পণ তো করতেনই, তার জন্য অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রম করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি নিজের পছন্দ মতন কয়েকজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর বেছে নিলেন এবং মডেল-স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য তাঁদের গ্রামাঞ্চলে পাঠালেন। হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে তিনি সাব-ইনস্পেক্টর মনোনীত করেন। এঁদের বেতন হয়, পথখরচ ছাড়া, মাসিক ১০০৲ টাকা।

বিদ্যাসাগরের প্রধান কাজ ছিল এইসব মডেল-স্কুলের জন্য যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন করা। প্রকৃত গুণী শিক্ষক না হলে বাংলাশিক্ষার সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে তা তিনি জানতেন। অথচ সুযোগ্য শিক্ষক পাওয়াও তখন এক রীতিমত সমস্যা ছিল। তাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য হল, যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজে বাংলা-শিক্ষক মনোনয়নের জন্য একটি পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে মে মাসে (১৮৫৫) বিজ্ঞপ্তি দেন। কাছাকাছি স্থান থেকে প্রায় দুই শতাধিক পদপ্রার্থী পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফল দেখে বোঝা গেল, অন্তত আরও কিছু বেশী শিক্ষা না পেলে প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই মডেল-স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। এই সময় শিক্ষকদের শিক্ষাবিষয়ে ট্রেনিং

দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন। শিক্ষকদের একটি ট্রেনিং স্কুল বা নর্মাল স্কুল স্থাপনের ইচ্ছাও হয় তাঁর। পূর্বে হিন্দু-কলেজের সঙ্গে 'পাঠশালা' নামে একটি বাংলা-স্কুল ছিল। ১৮৪৩ সালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার পরে লিখেছিলেন :[২৩]

> উক্ত পাঠশালায় পাঠনারম্ভ হইবামাত্র ভূরি ২ বিদ্যার্থীগণের শিক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনার গোলযোগ হইল, পরে কতিপয় শিক্ষক ও গুরুমহাশয় নিযুক্ত হইলে বালকদিগের শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক পাঠ্যপুস্তক অবধারিত হইল এবং একজন মান্য ক্ষমতাপন্ন সংস্কৃতশাস্ত্রের পারদর্শি মহাশয় পাঠশালার রক্ষণাবেক্ষণার্থে ও ছাত্রগণের প্রতি নীতিবিদ্যার উপদেশার্থে নিযুক্ত হইলেন…পরে কতিপয় বাঙ্গলা পুস্তক রচিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইল এবং ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যার কোন ২ শাখা বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তুত করণার্থে কতিপয় ব্যক্তির…ভারার্পণ হইল এবং নিরন্তর বিদ্যালয়ের উন্নতির অনুসন্ধান হইতে থাকিল…

১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ সাল, এই দশ-এগার বছরের মধ্যে হিন্দুকলেজের এই পাঠশালার কল্যাণে বাংলাশিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। ১৮৪৩ সালেই পাঠশালার অবনতি লক্ষ্য করে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' লিখেছিলেন : "পূর্ব্বে এই পাঠশালায় প্রায় পঞ্চশত বিদ্যার্থী ছিল কিন্তু এক্ষণে বালকদিগের পিতামাতা ও অভিভাবকেরা অনেকে পাঠশালা হইতে স্ব ২ বালকদিগকে বাহির করিয়া লইতেছেন এখন তাঁহাদের বোধ হইয়াছে যে পাঠশালায় এক বৎসরে যত শিক্ষা হয় বাটীতে শিক্ষকের নিকটে অধ্যয়ন করিলে ৩ মাসের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা হইতে পারে; আমাদের বোধহয় উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি উত্তমরূপে অবলোকিত না হওয়াতেই এই খেদজনক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে এই বিদ্যামন্দিরে ১শত মাত্র বালক আছে।" ১৮৫৫ সালের মধ্যে পাঠশালার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হয়েছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল এই পাঠশালাটিকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা। তিনি ডি. পি. আই.-কে জানান, পাঠশালাটি তাঁর বিশেষ কাজে লাগবে। যাঁরা গ্রামাঞ্চলের স্কুলের শিক্ষক হতে চান তাঁরা এই

পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিচালনব্যবস্থা দেখে অনেক কিছু শিক্ষা করতে পারেন ; মধ্যে মধ্যে নিজেরা ক্লাসের ছাত্রদের পড়িয়ে এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। ১৮৫৫, ২ জুলাই তারিখের একটি পত্রে বিদ্যাসাগর তাঁর নর্মাল স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ডি. পি. আই.-কে জানান। তিনি লেখেন :[২৪]

"নর্মাল স্কুল হলে, আমার ইচ্ছা, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সর্বজনখ্যাত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রথমশ্রেণীর বাংলা-লেখক খুব অল্পই আছেন। যে দু-একজন উৎকৃষ্ট লেখক আছেন, অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম। ইংরেজীতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এবং সাধারণজ্ঞানের তথ্যাদিও তাঁর আয়ত্তে। শিক্ষকতার কাজেও তিনি দক্ষ। আমার ধারণা, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি বর্তমানে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।...দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করছি।"

বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সকলেই তখন বোধ করছিলেন। বাংলা-পাঠ্যপুস্তকের মতন বাংলা-শিক্ষকেরও অভাব ছিল। বাংলা-সরকার এবং ডি. পি. আই. উভয়েই সেইজন্য বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ছয় মাস অন্তর যদি ৬০ জন করে গুণী শিক্ষক স্কুল থেকে তৈরি হয়, তা হলে তার জন্য মাসিক ৫০০৲ টাকা ব্যয় এমন কিছু বেশী নয়। ১৮৫৫, ১৭ জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হয়।[২৫]

নর্মাল স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র কোন বাড়ি না পাওয়া যাওয়াতে সকালে দুঘণ্টা করে সংস্কৃত কলেজে ক্লাস হত। স্কুলটি দুইশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ-শ্রেণীর ভার ছিল প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্নশ্রেণীর ভার ছিল মধুসূদন বাচস্পতির উপর। স্কুল আরম্ভ হয় ৭১টি ছাত্র নিয়ে, তার মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৭ বছরের কম অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সের ছাত্র ভর্তি করা হত না। বোধোদয়, নীতিবোধ, শকুন্তলা, কাদম্বরী, চারুপাঠ ও 'বাহ্যবস্তু' ছাত্রদের পড়ানো হত। ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যাও ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। মাসে-মাসে পরীক্ষা

হত, এবং অমনোযোগী ও অক্ষম ছাত্রদের তাড়িয়ে দেওয়া হত। কৃতী ছাত্রদের নিযুক্ত করা হত শিক্ষকের কাজে।

১৮৫৬-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকায় প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করে স্কুল স্থাপন করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা করে খরচ পড়ত। গ্রামবাসীরা নিজেরা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের ব্যয় বহন করতেন। ডি. পি. আই.-এর নির্দেশ ছিল, ৬ মাস পর্যন্ত ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হবে না, তারপর সম্ভব হলে কিছু-কিছু বেতন নিতে হবে।

সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারটি জেলার মডেল-স্কুল ও বাংলা পাঠশালা, সবগুলি একসঙ্গে তত্ত্বাবধান করার ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। ভারত সরকারের নির্দেশে, যে-পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তার নাম হল—দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়ের স্পেশাল-ইনস্পেক্টর।[২৬] তাঁর উৎসাহের দীপশিখা যেন একসঙ্গে বহু গুরুদায়িত্বের চাপে আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ হল, এবং মনে হল যেন তাঁর কর্মশক্তি অপরিসীম। তাঁর অফুরন্ত উদ্যমের অনির্বাণ দীপশিখা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্র আলোকিত করে তুলল। বিদ্যাসাগর জানতেন, হার্ডিঞ্জের প্রচেষ্টা আগে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আন্তরিকতার সামান্য অভাব ঘটলে তাঁর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোন কাজ আরম্ভ করবার সময় তার ফলাফলের বা ব্যর্থতার চিন্তায় তিনি কখনও মুশ্‌ড়ে পড়েননি। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ৩৫-৩৬ বছর, পূর্ণ যৌবনকাল বলা চলে। যৌবনের সমস্ত উদ্যম তিনি এইসময় শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে নিয়োগ করেন। ব্যর্থ কোন ক্ষেত্রেই তিনি হননি। বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার তিন বছর পরে তিনি তাঁর রিপোর্টে লেখেন :[২৭]

> বাংলাদেশের মডেল-স্কুলগুলি প্রায় তিন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের বেশ আশাপ্রদ উন্নতি হয়েছে। ছাত্ররা সব বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করেছে। বাংলাভাষায় তাদের বেশ দখল আছে দেখেছি। প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তারা বেশ জ্ঞানলাভ করেছে।

যখন এই কাজ আরম্ভ করা হয় তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে গ্রামের লোকেরা মডেল-স্কুলের মর্ম বুঝতে পারবে না। কিন্তু স্কুলের সাফল্য সেই সন্দেহ দূর করেছে। যে-সব গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব গ্রামের ও তার আশপাশের গ্রামবাসীরা স্কুলগুলিকে আশীর্বাদ বলে মনে করে, এবং তার জন্য তারা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট সমাদর হয়েছে, ছাত্রসংখ্যা দেখলে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

আধুনিক যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে শহর ও নগর। উপেক্ষিত গ্রাম অশিক্ষার অন্ধকারেই বন্দী থাকে। শহর-নগরের মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে গ্রামের মানুষকে কতকাল ধরে যে অজ্ঞতার অভিশাপ বহন করতে হয় তার ঠিক নেই। আধুনিক যুগের মর্যাদার দুটি মানদণ্ড বিত্ত ও বিদ্যা থেকে গ্রাম বঞ্চিত হয় এবং ক্রমে শহর ও গ্রামের ব্যবধান দুস্তর হতে থাকে। শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোক ধীরে ধীরে শহর থেকে গ্রামের দিকে বিচ্ছুরিত হয়। উনিশ শতকে এই বিচ্ছুরণের পথ, বাধাবিঘ্নের বহু কাঁটা পরিষ্কার করে যাঁরা খানিকটা সুগম করেছিলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। কেবল আধুনিক শিক্ষার আলোক নয়, মাতৃভাষা বাংলাকে সেই শিক্ষার যোগ্য বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করার বার্তা তিনি গ্রামবাসীদের শুনিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের গ্রামে আধুনিক শিক্ষার আলোক বিদ্যাসাগরই যে প্রথম বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তা নয়। তার আগে খ্রীষ্টান মিশনারীরা পথ দেখিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাংলার গ্রামাঞ্চলে (হুগলী, চুঁচুড়া) উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে প্রতিষ্ঠিত পাদ্রী রবার্ট মে'র পাঠশালাগুলির কথা মনে পড়ে। বর্ধমান অঞ্চলে ক্যাপটেন জেমস স্টুয়ার্ট এই সময় কয়েকটি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। শ্রীরামপুর অঞ্চলে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের উদ্যমও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালার কথাও স্মরণীয়। হার্ডিঞ্জের বঙ্গবিদ্যালয়গুলির কথাও ভোলা যায় না। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারের এত

প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কলকাতা শহরের বাইরে একটা বৃহত্তর সমাজ-বৃত্তের মধ্যে এইসব প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ মানুষের মনে জেগেছিল। কিন্তু সেই আগ্রহের বীজ অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেত, কোন ফসল ফলত না, যদি বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে এইভাবে বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে মডেল-স্কুলের পরিকল্পনা নিয়ে অবতীর্ণ না হতেন। মিশনারীদের চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁদের ধর্ম-নীতিশিক্ষা দানের অত্যুৎসাহটাই জ্ঞান-দানের চেয়ে বৃহত্তর সত্য ছিল। তা ছাড়া, বিদেশী পাদ্রীসাহেবরা বাংলার গ্রামবাসীদের শিক্ষক হিসেবে কতখানি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বা হতে পেরেছিলেন, তাও ভাববার বিষয়। এছাড়া কলকাতা শহরের বাইরে, ছোট ছোট নগরের সীমানার মধ্যে, এবং তার আশেপাশে, পাদ্রীসাহেবদের শিক্ষা-দানের উদ্যম অধিকাংশই ব্যয় হয়েছে। এই ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বাংলা মডেল-স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, গ্রামাঞ্চলের সুদূর অভ্যন্তরে পর্যন্ত, বিদ্যাসাগর আধুনিক শিক্ষার কম্পমান দীপশিখাটি সযত্নে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই কম্পমান শিখা স্থির হয়ে জ্বলে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। অনেক ঘূর্ণিবাত্যায় শিক্ষার সেই ক্ষীণ শিখাটি মধ্যে মধ্যে নিভ-নিভ হয়েছে। কিন্তু যে-শিক্ষার আলোকবর্তিকা বিদ্যাসাগর নিজের হাতে বাংলার গ্রামে জ্বেলেছিলেন, আজ থেকে শতবর্ষ আগে, তা পরবর্তীকালে একেবারে নিভে যায়নি, নির্বাত নিষ্কম্প দীপ্তিতে ক্রমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে আজ তাই বাংলা মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনরূপে তার যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে।

৬ | স্ত্রীশিক্ষা

এদেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতবিদ্যার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিদ্যার যোগসূত্র স্থাপন এবং বাংলাশিক্ষা প্রচলন, শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি হল বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর তৃতীয় কীর্তি হল, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা। ১৮৪৯-৫০ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের অন্যতম সহযোগীরূপে তিনি বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। আগেকার অনেক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার কোন সামাজিক অন্তরায় তখনও দূর হয়নি। সাধারণ লোকের মন থেকে তো বটেই, দেশের উচ্চশিক্ষিত-শ্রেণীর মন থেকেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলির একটিও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। অথচ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই পুরুষ ধরে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন চর্চা চলেছে। দেশের উচ্চসমাজের মধ্যে এই বিদ্যাচর্চা সীমাবদ্ধ থাকলেও, তার ফলাফল (সুফল ও কুফল দুইই) অন্তত সেই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রকাশ হবার কথা। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক চেতনা তখন ধীরে ধীরে বাংলার এই নাগরিক উচ্চ-সমাজের মধ্যে জাগছিল। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের এত কুসংস্কার বংশ-পরম্পরায় তাঁদের চেতনাস্তরে স্তূপীকৃত হয়েছিল যে মাত্র কয়েক বছরের পুঁথিগত বিদ্যার জোরে হঠাৎ তাকে ঠেলে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। তাই

চেতনা তাঁদের মনে জাগলেও তা এত তরল ছিল যে কোন সুচিন্তিত কর্মক্ষেত্রে তাকে তাঁরা পরিচালিত করতে পারেননি। তাঁদের দুর্বল মনের কোণে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ক্ষীণ সদিচ্ছার স্বাভাবিক অপমৃত্যু ঘটেছিল। একটা নিরবয়ব আগ্রহের পদসঞ্চরণ যখন এইভাবে এদেশের অত্যন্ত সংকীর্ণ শিক্ষিতসমাজের মনের প্রাঙ্গণে শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় বেথুন ও বিদ্যাসাগর দৃঢ়পদে স্থির সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হলেন তাকে বাস্তবে মূর্ত করে তোলার জন্য। ডালহৌসি ও বেথুনের শুভেচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হল এদেশের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা।

সমাজের অনেক কুসংস্কার ও সমস্যা নিয়ে সবার আগে রামমোহন রায় গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। সব চিন্তা তিনি কর্মে রূপায়িত করতে পারেননি, কিন্তু তাঁর সেই চিন্তাপ্রসূত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক আমাদের এই নিস্তরঙ্গ সমাজের সচেতন জনস্তরে কিছুটা তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। রামমোহনের 'আত্মীয় সভার' বৈঠকে আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির নানাসমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হত। 'সহমরণ' বিষয়ে রামমোহন যে-সব পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও প্রসঙ্গত তিনি স্ত্রীশিক্ষার কথা উত্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন :[১]

> নিবর্ত্তক।...প্রথমত বুদ্ধির বিষয়ে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন্? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কি রূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে ২ বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্ব শাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।

রামমোহন এই কথা লিখেছিলেন ১৮১৮-১৯ সালে। এই সময় থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্‌যোগে বাংলাদেশে, প্রধানত কলকাতা শহর কেন্দ্র করে, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সূচনা হয় বলা চলে। ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools) নামে একটি খ্রীষ্টান মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে সমিতির বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। যে মহিলাদের আর্থিক পোষকতায় বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল, তাঁদের মাতৃভূমির নামেই সেগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন—লিভারপুল স্কুল, বার্মিংহাম স্কুল, সালেম স্কুল ইত্যাদি।[২] স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য ১৮২২ সালে এই সমিতির উদ্‌যোগে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। বইখানি লেখেন সেযুগের একজন বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮২৪ সালের মধ্যে বইখানির তৃতীয় সংস্করণ বাহির হয়। বোঝা যায়, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা সোৎসাহে বইখানি বিলি করে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে, প্রচারের সুবিধার জন্য এবং সম্ভবত পাদ্রীদের পরামর্শে, পণ্ডিত মহাশয় 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন' নামে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। তার নমুনা এই :

> প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যামানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে ২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।
>
> উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।
>
> প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।
>
> উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ

হইতেছে ; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

দেশের নানাস্থানে যীশুর মাহাত্ম্য প্রচারের সময়, মাঠে-ঘাটে হাটে-বাজারে, গ্রামে-গ্রামে, পাদ্রীসাহেব ও বিবিরা কৌতূহলী জনতার কাছে কতকটা অভিনয়ের মতন দুজন মিলে হয়ত এই 'কথোপকথন' পাঠ করে শোনাতেন। প্রচারের এই দৃশ্যটি কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চ বা মধ্যশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ একজনও থাকত বলে মনে হয় না। সাধারণত 'নিম্নশ্রেণীর' লোকেরাই ভিড় করে পাদ্রীদের প্রচার-বক্তৃতা শুনত বেশী। পাদ্রীদেরও লক্ষ্য ছিল সমাজের এই শ্রেণীর লোককে ধর্মান্তরিত করা। স্ত্রীশিক্ষার শুভ সংবাদও তাঁরা প্রথম-দিকে এই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রচার করেছেন।

'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র পর ১৮২৪ সালে 'লেডীজ সোসাইটি' (Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity) প্রতিষ্ঠিত হয়, 'চার্চ মিশনারী সোসাইটির' উদ্‌যোগে। এর মধ্যে মিস্ কুক (Mary Anne Cooke) ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করার জন্য ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছন। একবছরের মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় :[৩]

ঠনঠনিয়া স্কুল। ১৮২২, ২৫ জানুয়ারি স্কুলটি খোলা হয় ১২ জন ছাত্রী নিয়ে, পরে ছাত্রীসংখ্যা ২৫ জন হয়।

মির্জাপুর স্কুল। ১৬ জানুয়ারি, ১৮২২, এক পণ্ডিত মহাশয় ১৫ জন বালিকা সংগ্রহ করে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। মির্জাপুর অঞ্চল মুসলমান-প্রধান বলে স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা দিন দিন কমে যেতে থাকে।

প্রতিবেশী স্কুল। মির্জাপুরের প্রতিবেশীরা ২২ জন বালিকার নাম দিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য মিস্ কুকের কাছে আবেদন করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২, মির্জাপুরের পাশে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খোলা হয়।

শোভাবাজার স্কুল। ২৫ মার্চ, ১৮২২, এই স্কুল খোলা হয় ১৭ জন বালিকা নিয়ে। ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের মেয়েরাও ছিল। লেখাপড়ার চেয়ে মেয়েরা ঝগড়াঝাটি বেশী করত বলে স্কুলটি ভালভাবে চলত না।

কৃষ্ণরাজার স্কুল। একজন গণ্যমান্য পণ্ডিত মহাশয় ২ এপ্রিল, ১৮২২, প্রায় ৪৫ জন বালিকা নিয়ে স্কুলটি আরম্ভ করেন।

শ্যামবাজার স্কুল। এই অঞ্চলের একজন মুসলমান মহিলা প্রায় ১৮টি বালিকা নিয়ে একটি স্কুল খোলেন। তাঁর অসীম উৎসাহের জন্য বালিকার সংখ্যা বেড়ে পরে ৪৫ জন হয়।

মল্লিকবাজার স্কুল। ২৫ জন বালিকা নিয়ে স্কুলটি খোলা হয় ৩ মে, ১৮২২। স্কুলটি একজন অতি অজ্ঞব্যক্তির অধীনে ছিল, কিন্তু ঐ অঞ্চলে তাঁর প্রতিপত্তি খুব বেশী থাকায় তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

কুমোরটুলি স্কুল। ১৮ মে, ১৮২২, একজন পণ্ডিত মহাশয় ১৮ জন বালিকা নিয়ে এই স্কুলটি স্থাপন করেন।

১৮২২ সালের কয়েক মাসের মধ্যেই মিস্ কুকের বালিকা-বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রীসংখ্যা হয় ২১৭ জন, তার মধ্যে গড়ে ২০০ জন স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকত। ১৮২৩ সালের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হয় ২২টি এবং ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৪০০ জন। ১৮২৪ সালে 'লেডীজ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর চার্চ-মিশনের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব মিস্ কুক গ্রহণ করেন। রেভারেণ্ড উইলসনকে বিবাহ করে মিস্ কুক 'মিসেস উইলসন' নামে পরিচিত হন। কুকের স্কুলগুলি শহরের চারিদিকে দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল বলে, একটি কেন্দ্রীয় 'সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠার জন্য চার্চ-মিশন উদ্যোগী হন। স্বভাবতঃই মিসেস উইলসনের উপর (মিস্ কুক) লেডীজ সোসাইটি ও সেণ্ট্রাল স্কুল গঠনের সমস্ত দায়িত্ব চার্চ-মিশন দিয়ে দেন। ১৮২৬, ১৮ মে, কর্ণওয়ালিস স্কয়ারের পূর্বকোণে এই কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। ধাতুফলকে উৎকীর্ণ লিপিতে ভিত্তি স্থাপনের কথা লেখা আছে। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। ১৮২৮, ১ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়, ৫৮ জন

বিদ্যাসাগর-পত্নী দীনময়ী দেবী
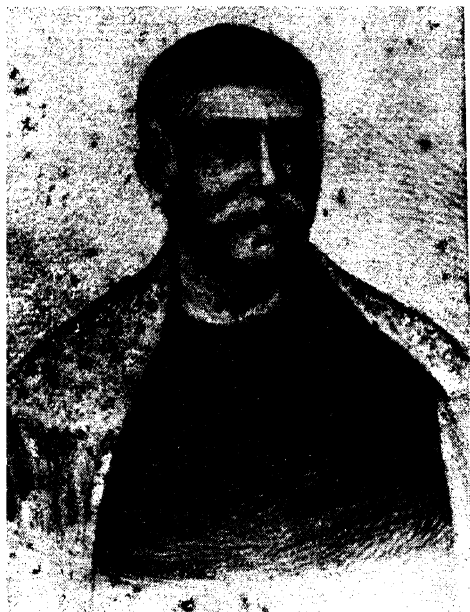
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রী নিয়ে। মিস্টার ও মিসেস উইলসনের তত্ত্বাবধানে ১৮২৯-৩০ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা হয় ১৫০-২০০ জন। ২০টি ক্লাসে তাদের ভাগ করা হয়, তার মধ্যে ৪টি ক্লাসের ৫০ জন বালিকা সেণ্ট ম্যাথুর গস্‌পেল ও পিয়ার্সের ভূগোল পড়ত, এবং স্লেটে ডিক্টেশন লিখত; ৬টি শ্রেণীর ৬০ জন ছাত্রী বাইবেল, ইতিহাস ও অন্যান্য প্রাথমিক পুস্তক পাঠ করত; ১০টি শ্রেণীর ছাত্রীদের বর্ণপরিচয় করানো হত। এইভাবে মিশনারীদের উদ্‌যোগে এবং মিসেস উইলসনের বিশেষ আগ্রহে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হতে থাকে।

লেডীজ সোসাইটির পর ১৮২৫ সালে 'লেডীজ অ্যাসোসিয়েশন' নামে আর-একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতিরও প্রেসিডেণ্ট হন মিসেস উইলসন। প্রধানত মুসলমানপ্রধান এণ্টালি ও জানবাজার অঞ্চলে এই সভার উদ্‌যোগে কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, এইসব অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাই উৎসাহ নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। এর আগেও আমরা দেখেছি, ১৮২২ সালে মিস্ কুক যখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখন শ্যামবাজার অঞ্চলের একজন মুসলমান মহিলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাজে সাহায্য করেছিলেন। তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য বালিকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের পাড়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। তাঁর উৎসাহের জন্যই পরে স্কুলটির বেশ উন্নতি হয়েছিল এবং ছাত্রীসংখ্যাও বেড়েছিল। একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে ১৮২২ সালে স্ত্রীশিক্ষার জন্য এই ধরনের উৎসাহ প্রকাশ করা অনেকের কাছে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কলকাতা শহরের মুসলমান পুরুষরাই যখন ইংরেজদের প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাননি, তখন একজন খ্রীষ্টান মহিলা প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু তাই নয়, একজন মুসলমান মহিলা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, মুসলমান নারীর শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এটা আরও বিস্ময়কর বলে মনে হয়। এছাড়া মির্জাপুর, এণ্টালি, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাও দেখা যায়, মিস্ কুকের (মিসেস উইলসনের) স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এইসব অঞ্চলে

বালিকা-বিদ্যালয় প্র।তষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন। এগুলি সবই সত্য ঘটনা, কিন্তু এদেশের শিক্ষার ইতিহাসের বিশাল বিশাল মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠায় কোথাও এদের স্থান দেওয়া হয়নি। তা যদি দেওয়া হত, তা হলে বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে মুসলমানদের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের অনেক ধারণা বদলে ফেলে আবার নতুন করে চিন্তা করতে হত। ভবিষ্যতে একদিন নতুন করেই চিন্তা করতে হবে, যখন এই ধরনের সব সত্য ঘটনা আঞ্চলিক ইতিহাসের জীবন্ত জনস্তর থেকে নতুন করে আবিষ্কৃত হবে।

কুকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্দুসমাজের মধ্যে যে আরও বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমেই তাঁরা সচেতন হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু কুকের আন্তরিকতা এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের (চার্চ-মিশন, লণ্ডন-মিশন, ব্যাপটিস্ট-মিশন প্রভৃতির) উৎসাহ সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজের দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। তার কারণ, হিন্দুসমাজের উচ্চ বা মধ্যস্তর যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তা নয়। প্রধান কারণ হল, মিশনারীদের উৎসাহকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁরা মনে করতেন, শিক্ষার প্রসারের চেয়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং স্ত্রীশিক্ষার সূত্র ধরে খ্রীষ্টান মহিলারা যদি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন, তা হলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটবে। এর মধ্যে ছেলেদের দিয়েই তার কিছু আভাস তাঁরা পেয়েছিলেন, তাই মেয়েদের আর খ্রীষ্টান মহিলাদের ও পাদ্রীদের হাতে সমর্পণ করতে ভরসা পাননি। এই কারণে মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা হিন্দুসমাজের অবহেলিত অসহায় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর ইংরেজী 'রিফর্মার' পত্রিকায় মিসেস উইলসনের কেন্দ্রীয় বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখেন :[৪]

> The pupils of this institution consist for the most part of the lowest classes, who are not permitted to frequent the houses of the respectable natives. For these women it will be ;difficult to find access to the respectable females, particularly when it is known that their edu-

cation consists chiefly of the knowledge of the New Testament and the Religious facts. Prejudice of caste and the stronger prejudice which the generality of natives continue to entertain against Christianity, are at present likely to raise an insurmountable barrier against the success of their endeavours.

'রিফর্মারের' অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু মিশনারীরা কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেননি। তাঁদের প্রচেষ্টাও সেইজন্য অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। তবু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা যেটুকু সাড়া জাগিয়েছিলেন তাতে পরবর্তীকালে কিছুটা সুফল ফলেছিল।

•

হিন্দুসমাজের উপরের স্তরে স্ত্রীশিক্ষার চেতনা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছিল। তখনকার কলকাতা শহরের হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম সমর্থক ছিলেন। ২০ মার্চ ১৮৫১, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে লিখিত একখানি পত্রে রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায় তিরিশ বছর যাবৎ তিনি যা করেছেন তার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে লেখেন :

"বর্তমানে আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন, আমি এতকাল উপদেশ ও নিজের কাজের দ্বারা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছি যে আমি স্ত্রী-শিক্ষার একজন প্রধান সমর্থক। 'স্কুল সোসাইটির' অধীনে কলকাতায় যে-সব দেশী পাঠশালা ছিল তাতে ছেলেদের সঙ্গে বুদ্ধিমতী মেয়েরাও লেখাপড়া করত। সোসাইটির পণ্ডিত ও শিক্ষকেরা আমার গৃহে বালিকাদের পরীক্ষা নিতেন, আমি তাতে খুব খুশী হতাম। প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা অনেক আগে থেকেই হয়েছে, কিন্তু সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের সেই সব বিদ্যালয়ে পাঠাতেন না। ১৮১৯ সালেই আমি পাদ্রী পিয়ার্সকে একথা লিখে জানিয়েছিলাম যে বিবাহের আগে মেয়েদের আমরা ঘরেই বাংলা লেখাপড়া শেখাই, তাই কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বাইরের স্কুলে লেখাপড়া করতে যাবে না। এরপর আমি বরাবরই

একথা বলে এসেছি। নীতির দিক থেকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা আমি করিনি, তবে প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল।"

বেথুন সাহেবের ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় রাধাকান্ত দেব তাঁর নিজ গৃহে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হলেও, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাচীন। আধুনিক যুগের দৃষ্টি দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করেননি, আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে, গৃহশিক্ষার গণ্ডির মধ্যে, নীতিগতভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে তিনি সমর্থন করেছেন। তা করলেও, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনকালে, হিন্দুসমাজের সর্বজনমান্য প্রবক্তারূপে রাধাকান্ত দেবের এই নৈতিক সমর্থনও তখন খুব কার্যকর হয়েছিল।

রাধাকান্তের মতন রাজা বৈদ্যনাথ রায়, ধনকুবের মতিলাল শীল এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার নৈতিক সমর্থক ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাকে প্রবল সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেন 'ইয়ংবেঙ্গল' দল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোক পেয়ে রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 'ইয়ংবেঙ্গলের' মুখপাত্ররা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৮৪০ সালে কৃষ্ণমোহন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে *Native Female Education* নামে একটি ইংরেজী রচনা লিখে প্রাইজ পান। ১৮৪২ সালে রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য হিন্দুকলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের একটি সোনার ও একটি রূপার পদক পারিতোষিক ঘোষণা করেন। প্রথম পুরস্কার পান মধুসূদন দত্ত এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পান ভূদেব মুখোপাধ্যায়। চতুর্থ দশকে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন মিশনারীদের প্রচেষ্টার বাইরে বৃহত্তর সমাজে ক্রমেই এইভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লেখেন :[৫]

কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয় লইয়া যে সমুদয় সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা বাদানুবাদ করিতেছেন, তাঁহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া স্ত্রীবিদ্যার সাপক্ষ বিপক্ষরূপে বিখ্যাত

হইয়াছেন। যাঁহারা এতদ্বিষয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহারা নানাবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা মধ্যে মধ্যে সম্বাদপত্র…করিয়া থাকেন। তদ্বিপরীতে যে-সকল মহাশয়েরা স্ত্রীবিদ্যার গৌরব করেন না, তাঁহারা কেবল উপহাস করিয়াই আসিতেছেন। ফলতঃ কিরূপ উপায়দ্বারা দেশীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই দর্শাইতে পারেন নাই।

এইক্ষণে হিন্দুস্ত্রীদিগের যেরূপ কুলধর্ম্ম এবং জাতিরক্ষার যে প্রকার কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীবিদ্যার সাধারণ্যে হওয়া দুরূহ। এই উদ্যোগ সম্পন্ন করা তাদৃশ কঠিনতা বোধ হইত না, যদি ইউরোপ খণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় এদেশীয় রমণীগণের স্বভাব কুলভয় ও লজ্জা প্রভৃতি সাধারণ হইত। সুতরাং ঐ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে ইহা সমাধা করা সামান্য কার্য্য নহে; অতএব এই বিষয়ের পরীক্ষার্থ জনসমাজে আমরা এক প্রস্তাবোত্থাপন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। তাহা মনোনীত জ্ঞান করিয়া যদি অন্য অন্য ভ্রাতা সম্পাদকগণ অগ্রসর হয়েন, তবে অনুমান করি সাধারণ জনসমূহেরও উৎসাহ হইতে পারে। অল্পদিন গত হইল, ইংলণ্ডের কোন প্রকাশ্য সমাজে এই প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল যে ভারতবর্ষস্থ স্ত্রীলোকদিগের উপদেশ প্রদানে তাহারদিগের কোন সাহায্য ফলকর হইতে পারে কিনা, তাহাতে তৎসভার অধিকাংশ সভ্যই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "হিন্দু স্ত্রীদিগের জ্ঞানোপদেশ জন্য তাহারদিগের যত্ন করা ব্যর্থশ্রম মাত্র, হিন্দুদিগের মনযোগ ভিন্ন অপর সমূহ চেষ্টাই মিথ্যা হইবেক; অতএব এদেশীয় মনুষ্যগণের দয়া ব্যতীত এদেশের অবলাগণ বিদ্যারূপ পরম বল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না।"

বিদেশীয় দয়াশীল লোকের এবম্প্রকার উক্তিতে অবশ্যই খেদ করিতে হয়, যে কেবল মনযোগের অভাবই হিন্দুরমণীরা বহুকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান-দৃষ্টি বিহীনা রহিয়াছেন। এইক্ষণে যদিও অল্পসংখক ব্যক্তিরা স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ের পোষকতা করিয়া থাকেন বটে, তথাচ কেহই তাহার পত্তনের প্রতি দৃষ্টি করেন না।

> আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশ হিতৈষি জনসমূহের যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্যবাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্য্য বিষয় মনযোগী হউন।

'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে সকলকে সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে আহ্বান করেছেন। এই আহ্বানে অবশ্য প্রত্যাশিত সাড়া তখনও পাওয়া যায়নি, কিন্তু আহ্বানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতন। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, অথবা কেবল শুভেচ্ছার জোরেই যে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে না, একথা সমাজের একশ্রেণীর লোক তখন বুঝতে পারছিলেন। 'বিদ্যাদর্শন' পত্রে তাঁদেরই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের শেষ হতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছে।

১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁদের গ্রামে (উত্তরপাড়ায়) একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাসংসদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। সংসদ কোন জবাব দেন না। চার বছর পরে ১৮৪৯ সালে তাঁরা এই বিষয়ে আবার সংসদের কাছে লেখেন :[৬]

> Many respectable people of this neighbourhood concur with us in thinking that if an experimental school for the education of female children should be established here under the patronage of Government, it may be successful, eventually lead to the establishment of others all over the country. We therefore beg to propose to place in the hands of Government, landed property yielding a clear monthly income of 60 Rupees,

provided the Government will pay a like sum for the furtherance of the object—the cost of the building will be about 2000 Rupees, which shall be equally borne by the Government and ourselves.

এই প্রস্তাবে শিক্ষাসংসদ সম্মত হননি। পত্রোত্তরে তাঁরা জানান যে সরকারী সাহায্য না পেয়ে স্বাধীনভাবে কোন বালিকা-বিদ্যালয় কিভাবে চলে তা অন্তত কিছুদিন না দেখে তাঁরা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী নন।

এদিকে ১৮৪৭ সালে বারাসতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত বাঙালীর উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় এইটি। বারাসতের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উদ্‌যোগে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, বারাসতের স্বনামধন্য ব্যক্তি কালীকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁর ভাই নবীনকৃষ্ণ মিত্র। এই স্কুল সম্বন্ধে শিক্ষাসংসদ তাঁদের রিপোর্টে লেখেন :[৭]

Female Education.—In connection with this subject the Council have much gratification in placing on record the fact that a Native Female School has been established at Baraset by certain educated and philanthropic gentlemen of the district...Much caution, temper, forbearance and prudence are necessary in conduct of such institution, and the Council trust that the example set by these gentlemen will shortly be followed by their educated brethren in other places.

প্যারীচরণের চরিতকার নবকৃষ্ণ ঘোষ এ-সম্বন্ধে লিখেছেন : "ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বহুল পণ্ডগ্রাম বারাসতে ঐ দেশাচার বিরুদ্ধ নব অনুষ্ঠানের জন্য প্যারীবাবু প্রমুখ ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তাগণকে কত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কত লাঞ্ছনা-নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্যারীবাবু, নবীনকৃষ্ণবাবু এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের

শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি বারাসত-বিদ্যালয়ের তৎসাময়িক দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাসবাবুও প্যারীবাবুর বিপক্ষদলে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে সে সময়ে স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসিগণের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। এমন কি একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটী দুগ্ধপোষ্য বালিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসতবাসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।”[৮]

অনেকে বলেন, শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বারাসত বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসে, নিজে কলকাতায় অনুরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা পান। পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, কারণ তার দু'বছর পরে ১৮৪৯, ৭ মে বেথুন কলকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এইজন্য যে, ইংরেজীশিক্ষার প্রথম সুসংগঠিত প্রকাশ্য বিদ্যালয় ‘হিন্দু কলেজ’ এবং স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে বারাসতের প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়, দুটি প্রতিষ্ঠানই বাঙালীর উদ্‌যোগে স্থাপিত হয়। প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’, পরে ১৮৫১ সালে বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম হয় ‘বেথুন স্কুল’। শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে বেথুন আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁকে কেবল বিচক্ষণ পণ্ডিত বলে নয়, একজন অক্লান্ত কর্মী বলেও শ্রদ্ধা করতেন। স্কুলপ্রতিষ্ঠার সময় বেথুন সাহেব রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের, অথবা কোন মিশনারী সাহেব ও মেম-সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেননি। সরকারী সাহায্যও তিনি চাননি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন তাঁর ভাষণে বেথুন বলেন: “বিদ্যালয়ে যে-ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, সে-সম্বন্ধে দু-চার কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। আপনারা জানেন, গবর্নমেণ্ট স্কুলে কোন বিশেষ ধর্মবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি, মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার কথা বললে অনেকে বিদ্রূপের হাসি হেসে থাকেন। তাঁদের ধারণা,

মেয়েরা যে-শিক্ষা পাবে তা তাদের জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। বাস্তবিক শিক্ষা যদি তাই দেওয়া হয়, তা হলে তাঁদের সঙ্গে আমিও সেই শিক্ষাকে বিদ্রূপ করব। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মতামত, যা আমি আগেও ব্যক্ত করেছি, আপনারা যদি তা লক্ষ্য করে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় দেখেছেন যে আমি মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চার উপর জোর দিয়েছি বেশী। ইংরেজীশিক্ষার কথা বলেছি, ইংরেজীসাহিত্য অনেক উন্নত বলে। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজীশিক্ষা করে নিজের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করবে, এই আমার ইচ্ছা। এই বিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রথমে ভাল করে বাংলাশিক্ষা দেওয়া হবে, তারপর কিছু কিছু ইংরেজীও শেখানো হবে। এ ছাড়া সেলাই, অঙ্কন, হাতের কাজ প্রভৃতি মেয়েদের যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেগুলিও শিক্ষা দেওয়া হবে। এইভাবে শিক্ষা পেলে মেয়েরা উপকৃত তো হবেই, তাদের গৃহের শ্রীও তারা সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পারবে।”

স্কুলে শুধু সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের মেয়েরাই ভর্তি হতে পারবে, বেথুন এই নিয়ম করলেন। প্রথম থেকেই বেথুনের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলেন। মদনমোহন ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী। এই দুই পণ্ডিত-বন্ধুর কাছে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ চিরকাল ঋণী থাকবে। স্কুলপ্রতিষ্ঠার পরেই বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তার অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সাগ্রহে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। দূর থেকে স্কুলের ছাত্রীদের আনার জন্য বেথুন সাহেব একটি ঘোড়ার গাড়িরও ব্যবস্থা করেন। সম্পাদক বিদ্যাসাগর সেই গাড়ির পাশে—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ—এই শাস্ত্রবচনটি খোদাই করে দিলেন। শাস্ত্রের দোহাই না দিলে এদেশের লোককে কিছুই বোঝানো যাবে না, একথা তিনি জানতেন। শাস্ত্রবচনের অর্থ, পুত্রের মতন কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে। বিদ্যালয় খোলা হলে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুটি কন্যাকে প্রথমেই ভর্তি করে দিলেন। বেথুনের বালিকা-বিদ্যালয়ের

প্রথম ২১জন ছাত্রীর মধ্যে মদনমোহনের কন্যা ভুবনবালা ও কুন্দমালা দুজন। বিদ্যাসাগরের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়াও বেথুন যাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন, বড়লাট ডালহৌসির কাছে তাঁর বিখ্যাত পত্রে তিনি তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এবং তৃতীয়জন হলেন পণ্ডিত মদনমোহন। চিঠিতে বেথুন রামগোপালকে বলেছেন 'the well-known merchant'[৮] এবং দক্ষিণারঞ্জনকে বলেছেন, 'A Zemindar'। রামগোপাল বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দক্ষিণারঞ্জন জমিদার ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও তাঁদের বড় পরিচয় ছিল, তাঁরা তখনকার প্রগতিশীল ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্র ছিলেন। তাঁরা যে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বেথুনের পাশে দাঁড়াবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনেক আগে থেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা দেশবাসীর কাছে বলছিলেন।

বড়লাট ডালহৌসিকে বেথুন তাঁর বিখ্যাত পত্রে লেখেন (২৯ মার্চ, ১৮৫০):[৯] "বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন শহরব্যাপী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয় হিন্দুসমাজের নেতাদের কাউকেই আমি আমন্ত্রণ জানাইনি। তাঁরা প্রচণ্ডভাবে আমার কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাতে আমার ক্ষতি হয়নি কিছু। অনেকে আমাকে সাহায্য করে উৎসাহিতও করেছেন।...বাঙালী ছেলেদের মধ্যে আমি যে শিক্ষার আগ্রহ দেখেছি, মেয়েদের মধ্যে সেই একই আগ্রহ দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি। বুদ্ধিও বাঙালী মেয়েদের তীক্ষ্ণ, এবং তাদের সমবয়স্ক ইয়োরোপীয় মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী বলে মনে হয়।" এর পর উত্তরপাড়া, বারাসত, নিধুদিয়া, সুখসাগর, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "স্ত্রীশিক্ষার এই আন্দোলন বিনা বাধায় এগিয়ে চলছে এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। বরং ঠিক তার উল্টোই হচ্ছে। মুষ্টিমেয় যে দু-চারজন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছেন, স্থানীয় লোকজন প্রতি পদে নানাভাবে তাঁদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এমনকি তাঁদের ভয় দেখাতে এবং নির্যাতন করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। কলকাতায় এ-সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বলেই, আমি মফঃস্বলের

কর্মীদের অসুবিধা বুঝতে পারি। আমার কাছে অনেকে সাহায্য ও উৎসাহের জন্য আবেদন করে চিঠিপত্র লেখেন। আমি শিক্ষাসংসদের সভাপতি বলে অনেকের ধারণা, এ-ব্যাপারে আমি তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি। সেইজন্য আমার মনে হয়, এখন আর সরকারের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়, এবং সর্বপ্রকারে এ-কাজে তাঁদের সাহায্য করা উচিত।...আমি সেজন্য প্রস্তাব করছি যে ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে আপনি আমাদের শিক্ষাসংসদকে এই নির্দেশ দিন যে, স্ত্রীশিক্ষা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যেন আমরা গ্রহণ করি এবং বিভিন্ন স্থানের উৎসাহী ব্যক্তিদের বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য সাহায্য করি। এই নির্দেশ দিতে যদি ভারত-সরকারের আপত্তি না থাকে তা হলে আমার মনে হয়, বাংলা-সরকারকে অনুরোধ করা যেতে পারে, তাঁরা যেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের এ-বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হতে আদেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তব্য হবে, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী তাঁদের পরোক্ষে সাহায্য করা, এবং যাঁরা তাঁদের নানাভাবে অত্যাচার-উপদ্রব করেন তাদের শাসন ও সংযত করা।"

বেথুনের এই পত্রে সুফল ফলেছিল। বড়লাট ডালহৌসি ১ এপ্রিল ১৮৫০, তাঁর 'মিনিটে' বেথুনের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেন। তিনি লেখেন : "আমার মতে, ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বেথুন সর্বপ্রথম উদ্‌যোগী হয়ে খুব বড় কাজ করেছেন। কলকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি স্ত্রীশিক্ষার ভিত সুদৃঢ় করেছেন। সুতরাং তিনি শুধু আমাদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা নয়, আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতাও দাবী করতে পারেন। স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি আমাকে তাঁর পত্রে যে অনুরোধ জানিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মঞ্জুর করতে আমি সম্মত আছি, এবং আশা করি আমার সহযোগীরাও তাতে আপত্তি করবেন না। আমি প্রস্তাব করছি, শিক্ষাসংসদ ও 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে' এ-বিষয়ে অবিলম্বে লিখে জানানো হোক।"[১০]

হ্যালিডে তখন ভারত-গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারি ছিলেন। ১১ এপ্রিল ১৮৫০, হ্যালিডের স্বাক্ষরিত একখানি চিঠিতে ভারত-সরকার বাংলা-সরকারকে

জানান: "সপারিষদ ভারত-সরকার মনে করেন যে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কাজ করা হয়েছে, এবং সরকারের উচিত এই প্রচেষ্টাকে এখন প্রকাশ্যে সাহায্য করা। শিক্ষাসংসদের প্রতি ভারত-সরকারের অনুরোধ, যেন তাঁরা এখন থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তনও তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন, এবং এদেশীয় লোকের চেষ্টায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই বিদ্যালয়কে যথাসাধ্য সবদিক দিয়ে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত না হন।"

কলকাতা শহরে বেথুনের বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে এইজন্যই একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে হয়। কারণ এর আগে এদেশের স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানির ডিরেক্টররা এবং তাঁদের ভারতীয় প্রতিনিধিরা একেবারে উদাসীন ছিলেন বলা চলে। তাঁরা মনে করতেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করলে এদেশের সনাতন সামাজিক প্রথায় ও সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা হবে। সেইজন্য স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় লোকের আন্তরিক প্রচেষ্টা থেকেও তাঁরা দূরে সরে থাকবার চেষ্টা করতেন। ১৮৪৯-৫০ সালে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এদেশের লোকের সাফল্যের পর, বিশেষ করে বেথুনের বালিকা-বিদ্যালয় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ভারত-সরকার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁদের উদাসীন ও নিরপেক্ষ নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। এই সময় স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনও ক্রমে ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক যেমন অ্যাংলিসিস্ট-ওরিয়েণ্টালিস্টদের বিতর্কে মুখর হয়ে উঠেছিল, তেমনি চতুর্থ-পঞ্চম দশক সরগরম হয়ে উঠেছিল স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষ-বিপক্ষদের বাক্‌বিতণ্ডায়। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্ররা সভা-সমিতির বক্তৃতায় ও পত্র-পত্রিকার রচনায় স্ত্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সনাতন হিন্দুসমাজের প্রবক্তারা তাঁদের পত্র-পত্রিকায় বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করছিলেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার উদ্‌যোগীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র সমাজচ্যুতির আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেবল ইয়ংবেঙ্গল দল এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনীসভার ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিরাই যে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেছিলেন তাই নয়, এদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সেদিন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। কলকাতায় বেথুন যখন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর 'সম্বাদভাস্কর' পত্রিকায় এই প্রচেষ্টার সমর্থন করে লেখেন :[১১]

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃত-কার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আমারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত,···এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব,··· ।

কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতন নব্য ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁর 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' (Hindu Intelligencer) নামক ইংরেজী পত্রিকায় তিনি স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হিন্দুকলেজের এই

স্বনামধন্য প্রাক্তন ছাত্র, ইংরেজীবিদ্যায় সুশিক্ষিত কাশীপ্রসাদের সমালোচনার চমৎকার জবাব দেন তাঁর ‘সম্বাদভাস্কর’ পত্রিকায়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গৌরীশঙ্কর লেখেন :[১২]

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তবে কি অভিপ্রায়ে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষতা করেন, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কি তাঁহাকে কোন বিষয়ে মনঃপীড়া দিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় পিতৃপিতামহাদির প্রশস্ত পুরাতন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোম্পানি বাহাদুরের হেদো সরোবরের উত্তর পার্শ্বে উচ্চ স্তম্ভ যুক্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া পরিবারাদির সহিত ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, উক্ত বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দোতালা বৈঠকখানায় কপাট জানালা মুক্ত রাখিলে হেদো সরোবরের জলীয় বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধ থাকিতে পারেন, এবং উক্ত সরোবরের চতুর্দ্দিকে বাগান ও বিদ্যালয় ধর্ম্মালয়াদি নানাপ্রকার সুদৃশ্য বস্তু দৃষ্ট হয়, ধনী লোকেরা এরূপ বৈঠকখানা প্রাপ্ত হইলে দিবারাত্রি তাহার কপাট জানালা মুক্ত রাখিতেন। কিন্তু কলিকাতা নগরীয় কোন ব্যক্তি বলিতে পারিবে না কোনদিন ঐ বৈঠকখানার কপাট জানালা খোলা দেখিয়াছেন ইহারই বা কারণ কি, সম্পাদক মহাশয় কি আপন বাটীতে আপনার দৌবারিকদিগের হস্তে স্বকী আজ্ঞা দ্বারা আপনি কারাগ্রস্ত হইয়াছেন, যদি বাটীর কর্ত্তা স্ববাটীতে এই প্রকার কারাবাসীর ন্যায় থাকেন তবে সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা কত যন্ত্রণায় রহিয়াছেন তাহা কি কেহ অনুমানে বলিতে পারেন, যদি বলেন তিনি স্ত্রীজাতিকে সুরক্ষণে রাখিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন তবে জিজ্ঞাসা করি তাহার বহির্বাটীতে কি হিন্দুর বাটীর কোন চিহ্ন আছে, তাঁহার বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ নাই, দোল নাই, দুর্গোৎসব নাই, পিতৃশ্রাদ্ধ নাই, তবে হিন্দুর চিহ্ন কি আছে, সন্তান হয় না স্ত্রীর উত্তেজনায় একবার কার্ত্তিকপূজা করিয়াছিলেন তাহাও অন্তঃপুরে দোতালার ছাদে উঠিবার সোপানগৃহে সম্পন্ন হয় পাছে কাঙ্গালিরা জল পান চায় এজন্যে সে

রাত্রিতে শঙ্খ, ঘণ্টা, বাদ্যও করেন নাই, নবীন বাটীতে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণকে একটি পয়সা দেন নাই, এবং শুনিয়াছি ইষ্ট পূজাও করেন না, তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সের সম্পাদক মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের কি ব্যবহারে আছেন অগ্রে তাহা সপ্রমাণ করিবেন।

আমরা হিন্দু ইনটেলিজেন্সের সম্পাদক মহাশয়ের অন্তঃপুর বহিঃপুরের প্রথায় তাবৎ সমাচার লিখিলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ইহা বলিতে পারিলাম না, যাঁহার কোন ধর্ম্মের চিহ্নই দেখি না তাঁহাকে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কহিব, যাহা হউক, এইক্ষণে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ থাকুক, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সের সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কিঞ্চিৎ মিষ্টালাপ করিয়া পাঠক মহাশয়গণকে সন্তুষ্ট করিব।

হে সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভাস করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি একাদিক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতি কথার উত্তর দিব, যদি উত্তর প্রদানে অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন কিন্তু গোলের কথা কিছু নহে, আপনি কি বোধ করিয়াছেন বালিকা শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিপক্ষে লিখিলেই প্রাচীন মতস্থ মান্য হিন্দুদিগের কোন দলভুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা যদি হয় তবে কি বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন দলে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। প্রিয় ইণ্টেলিজেন্সার সম্পাদক মনে করিবেন না এই সুযোগে বিনা ব্যয়ে তাঁহার সমন্বয়ের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে যে দোষগুণ আমারদিগের পত্র প্রেরকেরা দুই পক্ষ হইয়া ইহার বাদানুবাদ করিতেছেন, তাহাতে আমরা উভয়পক্ষের বলাবলি সমস্তই বুঝিতেছি কিন্তু পত্র প্রেরকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে পারি না, প্রার্থনা করি একজন মান্য সম্পাদক হিন্দু বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষে দেখেন, অতএব হিন্দু ইনটেলিজেন্সার সম্পাদক মহাশয় যদি এই ন্যায় যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয়েন তবে আমরা আহ্লাদিত হইব।

গৌরীশঙ্কর ও কাশীপ্রসাদ এইভাবে মধ্যে মধ্যে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। গৌরীশঙ্করের মতন মদনমোহন তর্কালঙ্কারও স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম সমর্থক ছিলেন। এই সময় ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' নামে ঠন্‌ঠনিয়ার 'সর্বশুভকরী সভার' একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহ' সম্বন্ধে এবং মদনমোহন 'স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন।[১৩] স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধীদের সমস্ত আপত্তি একে-একে খণ্ডন করে মদনমোহন যে দীর্ঘ রচনাটি লেখেন, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক রচনার মধ্যে তা একটি উৎকৃষ্ট রচনা। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার মতন মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি নেই, বিপক্ষদের এই যুক্তি খণ্ডন করে মদনমোহন লেখেন: "বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ-কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকও শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক স্থানে এক অপাদান হইতে এককালে বিদ্যারম্ভ করিয়া বালিকারা অধিক শিক্ষা করিয়াছে।" এক শ্রেণীর সনাতনপন্থী লোক সেই সময় মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে দুশ্চরিত্র হবে বলে কলরব করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে মদনমোহন লেখেন: "যাঁহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ মুখরা দুশ্চরিত্র অহঙ্কারী হইবে তাঁহাদিগকে উত্তরপ্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ বিহিত বোধ হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্যজাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া তদ্বিপরীত হইয়াছে ইহা যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে উত্তান-পাদ হইয়া গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, বিদ্যাবান মনুষ্যেরা যে দেশে বসতি করেন কিম্বা যে সমাজে উপবিষ্ট হইয়া স্বৈরআলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই-সেই দেশ ও তত্তৎ সমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই।" যাঁদের প্রধান আপত্তি ছিল, মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে লাভ হবে না, তাঁদের কথার উত্তরে

মদনমোহন লেখেন : "আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং তাহার ফল যে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না। জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" অবশেষে তিনি লেখেন: "আর যদ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একেবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তাহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

মদনমোহনের এই উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়া বিরোধীদের পক্ষে নিশ্চয় সহজ হয়নি। উনিশ শতকের মানুষ বিদ্যাকে বিত্তের সঙ্গে একাত্ম করে বিচার করতেন, এবং বিত্তলাভের মানদণ্ডে বিদ্যার উপযোগিতা যাচাই করতেন। পণ্ডিত মদনমোহন তাঁদেরও সাহস করে বলেছিলেন যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জন করবে। অবশ্য তখনও তাঁর মতন প্রগতিকামী ব্যক্তিও আপিসের চাকুরির কথা কল্পনা করতে পারেননি। শিক্ষিত মেয়েরা পারিবারিক জীবনে কত উপায়ে পুরুষদের সঙ্গে অর্থ নৈতিক সহযোগিতা করতে পারে, সে-সম্বন্ধে তিনি লেখেন : "তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবে, তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখা পড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদয় সম্পাদন করিতে যে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাদি রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থা হইবে। রাজদ্বারে অথবা বণিগজনের কর্ম্মালয়ে চাকরি করা বই কি অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই?"

পণ্ডিত মদনমোহনের মতন এরকম যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ রচনা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে তখন ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে কেউ রচনা করতে পারেননি। বিপক্ষদলের যত আপত্তি ছিল তার প্রত্যেকটি তিনি সুন্দর প্রাঞ্জল যুক্তি দিয়ে টুকরো-টুকরো করে খণ্ডন করেছিলেন। পরে (১২৬১ সন, ইং ১৮৫৪-৫৫) দ্বারিকানাথ রায় সম্পাদিত 'সুলভপত্রিকা'ও এইভাবে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদের আপত্তিগুলি খণ্ডন করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। "স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবা হয়" এই আপত্তির উত্তরে 'সুলভপত্রিকা' লেখেন : "এ প্রশ্নে আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কারণ বিদ্যার কি মারাত্মক শক্তি আছে? বিদ্যা কি নরভোজী ব্যাঘ্র? যদিও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি থাকে, তবে যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয়, বিদ্যা তাহাকেই সংহার করিতে পারে। কিন্তু পত্নী পণ্ডিত হইলে যে পতির প্রাণবিয়োগ হয়, একথা অতি চমৎকার। 'চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরের্মাতুর্গলে ব্যথা'। যদি নারী বিদ্যাবতী হইলে পতিহীনা হয়, তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে পুরুষ বিদ্বান হইলেও স্ত্রীহীন হইতে পারেন। অতএব স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে যে বিধবা হয়, একথা কেবল হাস্যজনক মাত্র।"[১৪] সুলভপত্রিকার সম্পাদক দ্বারিকানাথ রায়ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রতি তাঁর যেমন গভীর অনুরাগ ছিল, তেমনি তার প্রসারেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর পত্রিকার শিরোদেশের শ্লোক (motto) থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় :

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন।
জান না নিমেষে হরে সকলি শমন॥
অতএব রিপুকুলে করিয়ে দমন।
যাতে জ্ঞানোদয় হয় করহ এমন॥
জ্ঞানিলোক লোকান্তরে করিলে গমন।
কীর্ত্তি তাঁর ধরাতলে করয়ে রমণ॥

পত্রিকার মলাটের চারকোণে যে চারটি পংক্তি ছাপা থাকত, তার মধ্যেও বিদ্যার মাহাত্ম্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট :

বাল্যকালে হরিলে হে ক্রীড়ার প্রসঙ্গে।
যৌবন হরিলে সদা মদগর্ব রঙ্গে॥
বার্দ্ধক্য হরিলে বৃথা চিন্তার তরঙ্গে।
প্রণয় করিবে কবে জ্ঞানরত্ন সঙ্গে॥

মদনমোহন-দ্বারিকানাথ প্রসঙ্গে সেকালের বাঙালী পণ্ডিতদের চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও প্রগতিশীলতার কথা বিশেষভাবে মনে হয়। শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে উনিশ শতকে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজ দল অন্যতম হলেও, শাস্ত্রজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতদেরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাধারণত বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে পণ্ডিতদের এই ভূমিকাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তা না দেওয়ার অবশ্য কোন যুক্তি নেই, এবং ইতিহাসকেও তাতে আংশিক বিকৃত করা হয়। স্ত্রীশিক্ষার কথাই ধরা যাক। মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকার্যে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি বই রচনা করে সাহায্য করেছিলেন। সেকথা আগে বলেছি। মিস্ কুক যখন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন পণ্ডিত, আমরা দেখেছি, তাঁকে সেই কাজে সাহায্য করার জন্য সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন। পরে স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের সপক্ষে যাঁরা নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ অন্যতম। এছাড়া বিদ্যাসাগরের সহযোগী সংস্কৃত কলেজের আরও অনেক পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজে তো সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের উৎস-স্বরূপ ছিলেনই। এদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে এঁদের অন্তত স্বচ্ছন্দে আধুনিক যুগের 'হিউম্যানিস্ট' বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মধ্যযুগের উদার মানবপ্রেমিক চিন্তধারাকে এইসব বাঙালী পণ্ডিত নবযুগের সমাজ-সচেতন মানবমুখী চিন্তার সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য উনিশ শতকের 'নব-জাগরণের' ইতিহাসে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে এঁদের দান স্মরণীয় হয়ে আছে।

স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন যখন বেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধানত কলেজের শিক্ষাসংস্কারে ব্যস্ত।

১৮৫৪-৫৫ সালে তিনি বাংলাশিক্ষার প্রসারকল্পে হ্যালিডের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে মডেল-স্কুল স্থাপনে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। আমরা তার বিবরণ দিয়েছি। ১৮৫৪ সালের 'উড্‌স ডেসপ্যাচে' স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে কোম্পানির ডিরেক্টররা প্রকাশ্যে তাঁদের সমর্থন জানান, এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন যেন বালিকা-বিদ্যালয়গুলিকেও প্রয়োজন মতন সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। হ্যালিডে তখন বাংলার ছোটলাট, এবং হ্যালিডেই ১৮৫০ সালে ভারত-সরকারের সেক্রেটারিরূপে স্ত্রীশিক্ষার সরকারী পোষকতার নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলা-সরকারকে। ১৮৫৪ সালে বাংলার প্রথম ছোটলাট হয়ে হ্যালিডে বাংলাশিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর প্রধান সমর্থক ও সহায়ক। ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে হ্যালিডে উদযোগী হন। শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে সব সময় তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি প্রথমে আলাপ-আলোচনার জন্য বিদ্যাসাগরকেই ডেকে পাঠান। বিদ্যাসাগর তখন বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ১৮৫০ সাল থেকেই তিনি বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ সালে বেথুন-স্কুলের জন্য যখন সিসিল বিডনের সভাপতিত্বে নতুন 'ম্যানেজিং কমিটি' গঠিত হয়, তখন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, রায় প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরত্ন রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ সদস্য নির্বাচিত হন, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হন অবৈতনিক সম্পাদক।[১৭] গ্রামে গ্রামে বাংলা মডেল-স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজেও বিদ্যাসাগর প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর উপদেশ যে অত্যন্ত মূল্যবান হবে হ্যালিডে তা জানতেন। কাজটা যে কত কঠিন তা জেনেও বিদ্যাসাগর তাঁর অবিচলিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ও সরকারী পোষকতা থেকে বঞ্চিত হবে না জেনে তিনি আরও বেশী উৎসাহিত হয়েছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ডি. পি. আই.-কে জানালেন যে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলতে পেরেছেন (৩০ মে, ১৮৫৭)। ডিরেক্টর এই স্কুলের জন্য মাসিক ৩২৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের মনোভাব বিদ্যাসাগরের কাছে বিশেষ অনুকূল মনে হয়েছিল। সেইজন্য বালকদের জন্য তিনি যেভাবে মডেল-স্কুল সংগঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেইভাবে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনেও অগ্রসর হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সরকার তাঁর একাজও সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন। এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি নিজ এলাকাভুক্ত জেলাগুলিতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেন। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮, এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়ায় একটি। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক খরচ হত ৮৪৫৲ টাকা, ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০।[১৮]

১৮৫৮, ১৩ এপ্রিল বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারকে লেখেন: "পূর্ব ও দক্ষিণ-বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে যে-সব বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব এসেছে, তার মধ্যে ডি. পি. আই. ২৬টি বিদ্যালয়ের সাহায্যের আবেদন-পত্র আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সরকারী সাহায্যের শর্তগুলি আরও একটু শিথিল না করলে এই সব আবেদনপত্র মঞ্জুর করা সম্ভব হবে না।" ১৮৫৮, ৭ মে ভারত-সরকার জানালেন যে বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের শর্তাবলী পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। স্থানীয় লোকের সাহায্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া যায়, তা হলে এরকম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল। ভারত-সরকারের এই আদেশে বিদ্যাসাগর হতাশ হলেন। সরকারের আর্থিক সাহায্য পাওয়া সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহই ছিল না। স্থানীয় লোক স্কুলগৃহ নির্মাণের খরচ দেবেন, এবং বাকি সব খরচ সরকার বহন করবেন, এই আশা নিয়ে বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন তাঁর মনে হল, পরিশ্রম তাঁর অনেকটাই ব্যর্থ হবে, এবং স্কুলগুলি হয়ত তুলে দিতে হবে। শিক্ষকদের বেতনও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, কারণ স্কুল খোলার পর থেকে তাঁরা বেতন পাননি। প্রায় ৩৪৩৯৲ টাকা বেতন বাবদ সরকারের কাছে তাঁদের মোট পাওনা হয়েছিল।

২৪ জুন ১৮৫৮ বিদ্যাসাগর ডি. পি. আই.-কে এই মর্মে একখানি পত্র লেখেন:[১৯] "হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, এই বিশ্বাস নিয়ে যে সরকার সেগুলিকে

আর্থিক সাহায্য করবেন। স্থানীয় লোকেরা স্কুলগৃহ নির্মাণ করে দিলে, সরকার বাকি খরচ চালাবেন। এখন মনে হচ্ছে, ভারত-সরকার এই শর্তে সাহায্য করতে ইচ্ছুক নন, কাজেই স্কুলগুলি হয়ত তুলে দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকরা গোড়া থেকেই বেতন পাননি; তাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া দরকার। আশা করি সরকার তা দেবেন। সরকারী আদেশ পাবার আগেই আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা-সরকার এ-বিষয়ে কোন অমত প্রকাশ করেননি। তা করলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলে আমাকে এমনভাবে বিপন্ন হতে হত না। স্কুলের শিক্ষকরা স্বভাবতঃই বেতনের জন্য আমারই মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন। যদি আমাকে নিজেকে এতগুলি টাকা দিতে হয়, তা হলে আমার উপর খুবই অন্যায় করা হবে।”

ডি. পি. আই. বাংলা-সরকারকে বিদ্যাসাগরের কথা জানিয়ে লেখেন, যিনি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি না পেয়েও গ্রামাঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এতখানি কাজ করেছেন, তিনি সরকারের পোষকতা পেলে আরও কত কাজই না করতে পারতেন! এরকম একজন অক্লান্ত উৎসাহী শিক্ষাকর্মীকে যদি তার উপর অপমান ও আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়, তা হলে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে যেটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে তাতে ভাটা পড়বে না কি?[২০]

ছোটলাট ডিরেক্টরের অনুরোধ এবং বিদ্যাসাগরের উৎসাহের কথা জানিয়ে ভারত-সরকারকে আবার একখানি চিঠি লেখেন। উত্তরে ভারত-সরকার জানতে চাইলেন—পণ্ডিত মহাশয় কি করে ধরে নিলেন যে সরকার খরচ মঞ্জুর করবেন? যে উৎসাহ পেয়ে তিনি কাজ করেছেন, তার জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর ডি. পি. আই.-কে লেখেন: “সরকারী সাহায্যে এর আগেই কতকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম যে সরকারী সাহায্য আমিও পাব। যে মাসে স্কুল খুলেছি ঠিক তার পরের মাসেই আপনাকে তা জানিয়েছি। যদিও কোন লিখিত আদেশ দেওয়া হয়নি, তা হলেও স্কুলের খরচ সংক্রান্ত আমার আবেদন সব সময়েই গ্রাহ্য হয়েছে। সেইজন্য আমার ধারণা ছিল, সরকারের ইচ্ছা

অনুযায়ীই আমি কাজ করেছি। তা না হলে আমাকে একাজে এতদিন উৎসাহ না দিয়ে বাধা দেওয়া হয়নি কেন ?"[২১] ডি. পি. আই. এই মন্তব্যসহ বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের পত্র পাঠিয়ে দিলেন : "আমি জানতাম, কলকাতা থেকে আমার অনুপস্থিতিকালে পণ্ডিত মহাশয় ছোটলাটের সঙ্গে সাক্ষাতে এ-বিষয়ে নিয়মিত কথাবার্তা বলতেন। আপনি যে তাঁর কাজকর্ম সুনজরে দেখেন, সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই আমি তাঁর রিপোর্টগুলি, কোন মন্তব্য না করেই, সরকারের কাছে পাঠিয়েছি, এবং কোনদিন তাঁকে নিরুৎসাহ করিনি।" অবশেষে ছোটলাট ভারত-সরকারকে সমস্ত কথা খোলাখুলিভাবে লিখে অনুরোধ করেন : "ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ছোটলাট থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত মহাশয় পর্যন্ত সকলেই এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছেন। এই কথা বিবেচনা করে ভারত-সরকার যেন ব্যাপারটা একটু অনুগ্রহের চোখে দেখেন।"[২২]

ভারত-সরকার ১৮৫৮, ২২ ডিসেম্বরের পত্রে লেখেন : "দেখা যাচ্ছে যে পণ্ডিত মহাশয় আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এবং উপরের সরকারী কর্মচারীদের উৎসাহ ও সম্মতি পেয়ে এ কাজ করেছেন। এই কথা বিবেচনা করে, এই সব বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য যে ৩৪৩৯৶৫ টাকা মোট ব্যয় হয়েছে, সেই টাকার দায় থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। সরকার এই টাকা দিয়ে দেবেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির, অথবা অন্য সরকারী বিদ্যালয়ের খরচের জন্য কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করা সম্ভব নয়। এ-সংক্রান্ত সমস্ত চিঠিপত্র 'সেক্রেটারি অফ স্টেটের' কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য অনধিক এক হাজার টাকা সাহায্যের অনুরোধও তাঁকে জানানো হবে। টাকা পাওয়া গেলে তার খানিকটা অংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যের জন্য এবং কিছু অংশ সরকার-সমর্থিত মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হবে।"[২৩]

'সেক্রেটারি অফ স্টেট' এই মাসিক ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করেননি। ১ আগস্ট, ১৮৫৯ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এ-বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন :

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেবের অনুমতি লইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হেলিডে সাহেব অগ্রে এ বিষয়ে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই হেতু উক্ত বিদ্যালয় সকলের নিয়োজিত লোকদিগের বেতন দান কাল উপস্থিত হইলে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টেরও ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের মতগ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া নূতন বিষয়ে ব্যয় দানের ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহারাও বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িতা বিষয়ে মত প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা তৎকালে বিদ্যালয়ে সকলের নিয়োজিত লোকদিগের কয়েকমাসের বেতন দিবেন স্বীকার করিলেন এবং ইহাও স্বীকার করিলেন ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে যাহাতে মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় দান করেন, তাঁহারা সে চেষ্টা করিবেন…। এক্ষণে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ অর্থের অসঙ্গতি বলিয়া মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় দান প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই।…ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মাসিক সহস্র মুদ্রা দান অতি সামান্য কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক কষ্টে সেই সামান্য বিষয়ে অত্রত্য সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের যদিও মত করিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন না।…

হেলিডে সাহেব অগ্রে উপরিস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের মত গ্রহণ না করিয়া কিরূপে এরূপ বিষয়ে মত প্রদান করিলেন এবং বিদ্যাসাগর বিষয়কর্ম্মে দক্ষ হইয়াও সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কিরূপেই বা এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, অনেকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এ উত্তর দিতে পারি, হেলিডে সাহেবের কাজের গতি এইরূপই ছিল। তিনি অগ্রে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেন না। তাঁহার যখন যেমন, তখন তেমন ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহার নিকটে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি অনুমতি দিলেন। বোধহয়, তৎকালে তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন, আমি হেলিডে সাহেব, বাঙ্গালাদেশের লেফটেনণ্ট গবর্ণর,

ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ আমার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আমার নিমিত্তই এই পদ নূতন স্থাপন করিয়াছেন, আমি এত বড় লোক হইয়া যদি বিদ্যাসাগরের কৃত প্রস্তাবে অনুমতি না দিই, তাহা হইলে আমার মান থাকে কই, বিদ্যাসাগরই বা কি মনে করিবেন, মনোমধ্যে এইরূপ অভিমানের উদয় হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়া ফেলিলেন। স্বদেশের হিতানুষ্ঠান প্রসঙ্গ হইলে বিদ্যাসাগরেরও কিছু জ্ঞানগম্য থাকে না। রীতিমত কাজ হইল কিনা, তিনিও তাহা বিবেচনা করিলেন না। তাড়াতাড়ি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বসিলেন। বোধ হয় এমন স্থলে কাহারও সংশয় জন্মে না। লেফটেনণ্ট গবর্ণর যখন আদেশ করিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মনে এতদিন এই আশা ছিল, ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্থায়িতা সম্পাদনের সদুপায় করিয়া দিবেন। এক্ষণে সে আশা উন্মূলিত হইল। তিনি এই সমাচার শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

ভারত-সরকার তখন সিপাহী-বিদ্রোহের দুশ্চিন্তায় কাতর। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থব্যয় করার মতন অবস্থা বা মনোভাব কোনটাই তাঁদের ছিল না। অবস্থার চাইতে মনোভাবের বিরূপতাটাই বড় কথা ছিল। তবু বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা তাঁরা যে মুখে অন্তত সমর্থন করেছিলেন, সেটাই যথেষ্ট। বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সমালোচনা করে বলেছেন যে, স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের ব্যাপার হলে বিদ্যাসাগরের কোন 'জ্ঞানগম্য' থাকত না। কথাটা মিথ্যা নয়। সমাজের কল্যাণকর্মে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ বন্যার বেগে প্রকাশ পেত এবং মধ্যে মধ্যে অত্যুৎসাহের বশে তিনি অদূরদর্শীর মতন কাজ করে বসতেন। বর্তমানটাই তখন তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠত, ভবিষ্যৎ তিনি বিশেষ চিন্তা করতেন না। বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের সময়েও তাই করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে ছোটলাটের সমর্থনই যথেষ্ট, দুর্ভাবনার কারণ নেই। কারণ যখন পরে দেখা দিল, তখন তিনি একেবারে হতাশ না হলেও, ব্যথিত হয়েছিলেন নিশ্চয়।

১৮৫৮, ৩ নভেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা ও নানারকমের দুর্ভাবনার মধ্যেও বিদ্যাসাগর তাঁর বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হননি। তিনি স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য একটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভাণ্ডার খোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং উচ্চতন সরকারী কর্মচারী নিয়মিত চাঁদা দিতেন। ছোটলাট বিডন সাহেবও মাসিক ৫৫৲ টাকা সাহায্য করতেন। এইভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি, সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও, বালিকা-বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে জীবনের অধিকাংশ কাজই তিনি একটা প্রচণ্ড জিদের বশবর্তী হয়ে আরম্ভ করতেন এবং তার চূড়ান্ত ফলাফল না দেখা পর্যন্ত তা ছাড়তেন না। আশৈশব চরিত্রের এই জিদটাই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মশক্তির উৎস।

আগে বলেছি, ১৮৫৬ আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বেথুন-স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর বহু কাজকর্মের মধ্যেও তিনি বেথুন-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২, বেথুন-বিদ্যালয় সম্পর্কে বাংলা-সরকারকে তিনি একটি রিপোর্ট পাঠান। এই রিপোর্ট থেকে বেথুন-বিদ্যালয়ের অবস্থা তখন কেমন ছিল তার আভাস পাওয়া যায়। রিপোর্টে তিনি লেখেন :[২৪]

> স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—লিখন-পঠন, পাটী-গণিত, জীবন-চরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানাবিষয়ে মৌখিক পাঠ এবং সেলাইয়ের কাজ। বাংলা ভাষাতেই ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, দু'জন সহকারী-শিক্ষয়িত্রী এবং দু'জন পণ্ডিত, এই পাঁচজন হলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।…
>
> ১৮৫৯ সাল থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে কমিটি মনে করেন, যাঁদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে তা ক্রমেই সমাদরলাভ করেছে। যাঁরা বিত্তবান তাঁরা মনে হয় এখনও বেথুন

বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই দেখা যায়, ধনী পরিবারের খুব অল্পসংখ্যক বালিকাই স্কুলের ছাত্রী। তবে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই দেখে কমিটি বিশেষ আনন্দ অনুভব করছেন। কমিটির বিশ্বাস, বেথুন বিদ্যালয়ের প্রভাবই এর কারণ।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যখন এই রিপোর্ট রচনা করছিলেন, তখন বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায়। সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ব্রাহ্মসমাজ-পন্থীদের মধ্যেও তখন পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের সমান সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। উন্নতিশীল যুবক ব্রাহ্মরাও তখন নিজেদের স্ত্রী বা পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে করে নিয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে ও সভা-সমিতিতে বেরুতে সাহস করতেন না। ব্রাহ্মসমাজের নবীন নেতা কেশবচন্দ্র সেন এই সময় সস্ত্রীক তাঁর কলুটোলার পারিবারিক গৃহ থেকে পালকিতে যাত্রা করে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে তাঁর আচার্যপদে অভিষেকের উৎসবে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। সংবাদটা আগে থেকে রটে গিয়েছিল বলে, কেশবচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন ও বাইরের লোকজন তাঁর কলুটোলার বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। এটি ১৩ এপ্রিল ১৮৬২, বাংলা ১ বৈশাখ ১৭৮৪ শকাব্দের ঘটনা—বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে নারী-প্রগতির ইতিহাসে একটি লাল অক্ষরে লেখা দিন। কেশবচন্দ্র তাঁর বিরোধীদের বিচিত্র সমাবেশ দেখে কলুটোলা থানার পুলিশকে লিখেছিলেন: "Certain parties wish to prevent me by force from taking my wife to a friend's house. I want the help of the police to enable me to exercise my right in this matter." শেষ পর্যন্ত পুলিশ অবশ্য ঘটনা-স্থলে আসেনি, এবং পুলিশের সাহায্য না নিয়েই দৃঢ়চিত্ত যুবক কেশবচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যাত্রা করেছিলেন—১৭৮৪ শকাব্দের ১ বৈশাখ, রবিবার ভোর পাঁচটায়। এই বছর, এই দিন এবং এই সময় থেকে আমাদের দেশে প্রকৃত নারী-প্রগতি ও নারী-মুক্তি

আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কেশবচরিতকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :[২]

> Keshub followed by his timid, youthful wife (she could not be more than fifteen at the time), her *Sari* hanging in a long veil before her bashful face, came out of his own room, and with suppressed excitement walked past the marshalled groups of angry relatives. They had imagined that their presence and hostile demonstration would awe him. But nothing of the sort happened. No word was exchanged, no violence was shown, the shock of his audacity struck them with mute horror ; they had never seen, never expected such a thing. But when the brave couple reached the outermost gate, the turbanned ruffians who had been set as guard stood up, and positively refused to let them out. Keshub was not unprepared for this insolence. He simply advanced a step, and with calm dignity commanded 'to withdraw that bolt and unlock the gate.'......The bolt was withdrawn, the gate was unlocked, and with his faithful wife by his side, the young hero stood emancipated in the free light and air of the public street.

পাগড়ি-বাঁধা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা কেশবচন্দ্রের বাড়ির ফটক আগলে দাঁড়িয়েছিল। ধীর পদক্ষেপে স্ত্রীর হাত ধরে এগিয়ে এসে, কেশব শুধু তাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ফটকের তালা ও খিল খুলে দাও।' একথায় কারও প্রতিবাদ করার সাহস হল না। ফটকের খিল ও তালা দুইই খুলে গেল। কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য রাজপথে, তাঁর স্ত্রীকে পাশে নিয়ে, মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। প্রতাপচন্দ্র লিখেছেন : "Thus

was laid the first stone of woman's education and emancipation..."—বাস্তবিকই তাই। ঘটনাটি বাংলার সামাজিক রঙ্গমঞ্চে একটি ঐতিহাসিক নাটকীয় ঘটনা তো বটেই, একটি রূপকও বলা চলে। পাগড়ি-বাঁধা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকগুলি আমাদের দেশের যুক্তিহীন শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও অন্ধ কুসংস্কারের প্রতিমূর্তি। খিল-দেওয়া তালাবন্ধ ফটকটি সনাতন রক্ষণশীল সমাজের রুদ্ধদ্বার। রক্ষণশীল সমাজের হাজার কুসংস্কার ও অনুশাসনের বন্ধদুয়ার যেন নবযুগের দৃপ্তকণ্ঠের মুক্তির দাবীতে খুলে গেল। কেশবচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী—এদেশের পুরুষ ও নারী—প্রকাশ্য রাজপথের মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন, অর্থাৎ প্রকাশ্যে জনসমাজে যেন মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন।

এই বছরে এই ঘটনার কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর বেথুন বিদ্যালয়ের রিপোর্ট লিখেছিলেন। রিপোর্টের মধ্যে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন যে দেশের সম্ভ্রান্ত ধনিক-পরিবারের মধ্যে মেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও, প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের প্রকৃত সার্থকতা এখনও অনুভূত হয়নি। কেশবচন্দ্রের পরিবারের এই ঘটনাটি বিদ্যাসাগরের উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই স্ত্রী-পরাধীনতা ছিল সবচেয়ে বেশী, এবং সামাজিক মর্যাদার খাতিরে পর্দাপ্রথা উচ্চসমাজেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। সেই সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষার জন্যই, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন কয়েক বছর ধরে চলতে থাকলেও, এবং সেই আন্দোলন নিজেদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে জাহির করার জন্য তাঁরা মুখে সমর্থন করলেও, কার্যক্ষেত্রে মেয়েদের গৃহবন্দী করে রেখে, তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতাই করছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চসমাজের এই স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধিতা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দূর হয়নি। সেইজন্য স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি বাংলাদেশে পদে পদে ব্যাহত হয়েছে, এবং যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী তাঁরাও নিজেদের স্ববিরোধী চিন্তার জালে প্রতি পদে জড়িয়ে পড়েছেন। বংশগত ঐতিহ্য ও সংস্কার, এবং নতুন শিক্ষালব্ধ সামাজিক প্রগতির আদর্শ—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সময় লেগেছে এই দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে।

১৮৬৫ সালে 'সোমপ্রকাশ' একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষার পাঁচটি অন্তরায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই পাঁচটি অন্তরায় হল : ১। এদেশের পুরুষরাই আজ পর্যন্ত ভাল লেখাপড়া শিখতে পারেনি, সুতরাং তারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হবে কি করে? ২। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে মেয়েরা বেশীদিন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে না; ৩। অল্প বেতনের লোক দিয়ে শিক্ষার কাজ চালানো যায় না; ৪। ছেলেবেলায় স্কুলে যেটুকু লেখাপড়া শেখে, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েরা তা ভুলে যায়। এদেশের জাতিভেদপ্রথার জন্য সাধারণত উপযুক্ত পাত্রে মেয়েদের বিবাহ হয় না, এবং সেইজন্য বিবাহের আগে তাদের যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, তা বৃথা হয়ে যায়; ৫। ইয়োরোপের মেয়েরা নিজেরা বিশেষ রান্নাবান্না করে না, হোটেলে খায়। সুতরাং তাদের লেখাপড়া করার অবসর আছে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের যেহেতু গৃহকর্ম ও রান্নাবান্না করতে হয়, সেই কারণে তারা লেখাপড়ায় মন দেওয়ার সুযোগ পায় না।[২৬]

'সোমপ্রকাশের' এই পাঁচটি অন্তরায়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটি প্রবল সামাজিক অন্তরায়। বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদপ্রথা স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৬-৬৭ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর 'সোমপ্রকাশ' বালিকা-বিদ্যালয় ও তার ছাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উৎসাহিত না হয়ে ঐ একই মন্তব্য করেন। তাঁরা লেখেন : "বিদ্যালয় ও পাঠার্থিনীর সংখ্যা যেরূপ হউক, স্ত্রীশিক্ষা যে সামান্যরূপ হইতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শীঘ্র ইহার উন্নতি হয়, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।"[২৭] 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লেখেন : "শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে এদেশের লোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মৌখিক যেরূপ যত্ন দেখা যায় কার্য্যে সেরূপ অতি অল্পই আছে। বিবাহকাল পর্য্যন্ত কেবল বালিকাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করিয়া ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া, বিদ্যালয় হইতে অপসৃত করা হয়। এ প্রকারে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।"[২৮] এই সময় বেথুন-বিদ্যালয়ের দুরবস্থা দেখে এই পত্রিকা মন্তব্য করেন : "আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এদেশের সর্ব্বপ্রধান বেথুন বালিকা-

বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টী মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে।…'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্র লিখিয়াছে, যে এই বিদ্যালয় উনিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ইহার শিক্ষার কার্য্যে (১৪২৭৭৬) একলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সংস্থাপক এককালে ৬০,০০০ যাটি হাজার টাকা দান করেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর বাটীর সংস্কারকার্য্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যখন শুদ্ধ ৩০টী মাত্র সাতআট বৎসর বালিকার সামান্য শিক্ষালাভ হইতেছে, তখন ইহাতে অর্থের কেবল অপব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে।"[২৯]

নবীন ব্রাহ্মরা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার' কাজে লেগেছিলেন, কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হয়নি। দেখা গেল, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে যাঁরা বড় বড় কথা বলতেন, তাঁরা নিজেদের পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো তো দূরে থাক, গৃহে পর্যন্ত শিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: "আমরা প্রায় পাঁচ বৎসর হইল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছি কিন্তু নগরের কোন ব্যক্তিকেই তাহাতে যোগ দিতে দেখা যায় না। যদি কেহ অবলম্বন না করেন কেবল উপায় অবধারণ করিলে কোন ফল নাই।"—এই সূত্রেই 'বামাবোধিনী' লেখেন: "বাল্যবিবাহ রীতি এদেশ হইতে নির্ব্বাণ না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। বঙ্গদেশে এত বিদ্যার গৌরব, প্রতি বর্ষে এত বি. এ এম. এ হইতেছে কিন্তু স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। আমাদিগের এই বিস্ময় কিছুতেই নিরাকৃত হইল না যে মূর্খ, কলহপ্রিয়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও সুবর্ণমণ্ডিত স্ত্রীর সহবাসে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা কিরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করেন? …আমাদের দেশের অন্তঃপুর যেন একটী সুসজ্জিত ক্রীড়ালয়। তথায় কতকগুলি লাবণ্যবতী সুবর্ণরত্নমণ্ডিতা নরপুত্তলিকা ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, তথায় কেবল বেশভূষা, আমোদকোলাহল, পানভোজন, হাস্য-পরিহাস দিবানিশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন দুইটী স্ত্রী একত্র হইলে বেশভূষা রন্ধনভোজন প্রভৃতি জল্পনা লইয়া কালক্ষয় করে। এখনও রূপের গৌরব অলঙ্কারের অহঙ্কার তাহাদের অতিশয় প্রিয় বস্তু। বঙ্গদেশে এমন পরিবার

নাই বলিলেও হয় যেখানে কেবলই জ্ঞানের আলোচনা, ধর্ম্মের আলোচনাকে আদর করা হয়। অনেকানেক বিজ্ঞ বিদ্বান এবং দেশহিতৈষীদিগের পরিবারেরও এইরূপ দুর্দ্দশা। তাঁহারা দেশের কুরীতি সংশোধন করিতে যান, কিন্তু নিজ পরিবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহার কোন প্রতিবিধান করেন না। এরূপ দেশহিতৈষণা দ্বারা প্রকৃত ফললাভ হইবে না। যদি পরিবার সংশোধনের চেষ্টা অগ্রে না করা হয় তবে দেশের মঙ্গল চেষ্টা কদাপি হইতে পারে না। বাহির হইতে যে সংস্কার শিক্ষা করা হয় তাহা স্থায়ী নহে। যদি একটী পরিবার সংস্কৃত হয় তাহাতেই প্রকৃত ফল উৎপন্ন হইবে।"[৩০]

'বামাবোধিনীর' এই সমালোচনা কঠোর, কিন্তু বাস্তব সত্য। পরিবার হল সমাজের ভিত্। সমাজের সংস্কার করতে হলে আগে পরিবারের সংস্কার করা প্রয়োজন। এবোধ তখনও আমাদের দেশের শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে জাগেনি। তাঁরা তখনও বাইরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর কথা বলতেন, কিন্তু নিজেদের পরিবারটিকে একটি মধ্যযুগীয় কারাগারে পরিণত করে রেখেছিলেন। তাঁরা বাইরে যে আদর্শ প্রচার করতেন, নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে তা আচরণ করতেন না। বাংলার শিক্ষিতসমাজ তাঁদের আদর্শ ও আচরণের এই বিরোধ দীর্ঘকাল কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আজও এই ধরনের আদর্শ-আচরণের বিরোধ বহুক্ষেত্রে বাংলার শিক্ষিতসমাজের মধ্যে দেখা যায়। সেদিন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও যে বিশেষ কোন ফল হয়নি, তার প্রধান কারণ, কুসংস্কার সহজে লোপ পায় না। তাই যাঁরা সংস্কারমুক্তির আন্দোলনে সেদিন অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি।

স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে আর-একটি বড় অন্তরায় ছিল, এদেশীয় শিক্ষিকার অভাব। মিস্ মেরী কার্পেণ্টার এই অভাব দূর করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ১৮৬৬ সালের শেষে তিনি কলিকাতায় আসেন, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য। শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরই ছিলেন তখন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মিস্ কার্পেণ্টার কলকাতায় পৌঁছেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তদানীন্তন ডি. পি. আই. অ্যাটকিনসন সাহেব একখানি বেসরকারী

পত্রে (২৭ নভেম্বর, ১৮৬৬) বিদ্যাসাগরকে লেখেন : "মিস্ কার্পেণ্টারের নাম হয়ত শুনে থাকবেন। তিনি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বিশেষ উৎসুক।" একদিন ডি. পি. আই. বেথুন স্কুলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার্পেণ্টারের পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর আদর্শের বন্ধন উভয়ের মধ্যে দৃঢ় হয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার্পেণ্টার কলকাতার কাছাকাছি কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শনাস্তে ফিরে আসবার সময় বিদ্যাসাগরের বগী-গাড়ি উল্টে যায়, এবং তিনি যকৃতে প্রচণ্ড আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে কবিয়াল ধীরাজ একটি গান রচনা করেন। গানটি এই :

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস কার্পেণ্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কল্‌কেতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এট্‌কিনসন উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে।

এই দুর্ঘটনার পরে বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙ্গে যায়, এবং আরও পঁচিশ বছর পরে ১৮৯১ সালে তাঁর মৃত্যু হলেও, শোনা যায় যে-ব্যাধিতে তিনি ভুগেছিলেন, এই আঘাতই নাকি তার মূল কারণ।

এদেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার বেথুন স্কুলে একটি 'নর্মাল স্কুল' স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করা হল। সভায় বিদ্যাসাগরও আমন্ত্রিত হলেন। এই সভায় (১ ডিসেম্বর, ১৮৬৬) যে কমিটি গঠিত হয় বিদ্যাসাগর তার সভ্য নিযুক্ত হন। 'সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্রলেখক লেখেন: "মিস্ মেরি

কার্পেণ্টর এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উৎকর্ষ সাধনার্থ বৃদ্ধ বয়সে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় এবং আমরা স্বদেশীয়-দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি। মিস্ কার্পেণ্টরের সম্মানার্থ সম্প্রতি কয়েকটি সভা হয়। ইহার অনেকগুলিতে ভোজ হয় এবং এতদ্দেশীয় যুবক ব্রাহ্ম সস্ত্রীক হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ বাটীতে মিস্ কার্পেণ্টর আগমন করেন। তৎকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল বিদ্যালয় করা আবশ্যক এবং তদর্থ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করা হয়, বিদ্যাসাগর তন্মধ্যে একজন ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, আমরা যখন প্রথমতঃ এই প্রস্তাব প্রেরণ করি তখন আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছিলাম। কাহার দ্বারা এই প্রস্তাব হইতেছে? দেশের কি ইহা অনুমোদনীয়? বর্ত্তমান অবস্থায় কি ইহা সঙ্গত? এতদনুসারে কি কাজ হইতে পারে? আমরা আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইহার তুষ্টিকর উত্তর প্রাপ্ত হইলাম না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই এবিষয়ে অধিক কাজ করিতে পারেন না। তিনি হঠাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আরও আশ্চর্য্যবোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত সোমবারের হিন্দু পেট্রিয়টে বিদ্যাসাগরের এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে তিনি প্রস্তাবিত প্রস্তাবে লিপ্ত থাকিতে সম্মত নহেন। এটী বুদ্ধির কাজ হইয়াছে, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। মিস্ কার্পেণ্টর বঙ্গদেশের বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, অসন্তোষের প্রধান কারণ এই প্রায় যাবতীয় বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষকের স্থলে তিনি পুরুষ শিক্ষক দেখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের গতি পুরুষেরা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন না, এবং স্ত্রীশিক্ষকের দ্বারা বালিকাদিগের যে প্রকার শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে, পুরুষের দ্বারা তাহা নাই। কিন্তু এস্থলে আমরা নিয়মমাত্রের উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে দেখা উচিত এদেশের যে অবস্থা... তাহাতে স্ত্রীশিক্ষকের কার্য্যারম্ভের কাল

আসিয়াছে কিনা?… নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে কাহারা শিক্ষা করিবেন? এদেশীয় বিধবাগণ? আমরা বলিতেছি শিক্ষকের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। উচ্চ জাতির প্রায় কোন বিধবা আসিবেন না। ঢাকায় একটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা অধিক। আমরা ইহাদিগের অবমাননা করিতেছি না, কিন্তু বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির বিশেষ কারণ আছে, এবং লোকে এ শ্রেণীর শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে না পাঠান তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়।…”৩১

এই পত্রের উপর মন্তব্য করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ‘সোমপ্রকাশ’ লেখেন: “পত্রপ্রেরক বলেন, এখনও সময় হয় নাই, এবং ভদ্র কুলাঙ্গনারা তথায় অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না। সময় হয় নাই, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কোন বিষয়ের নূতন অনুষ্ঠান হইলে সচরাচর এ প্রকার আপত্তি হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যখন রেলওয়ের প্রথম সৃষ্টি হয়, তৎকালে পার্লিয়মেণ্টে এই বিষয় লইয়া বাদবিতণ্ডা হইয়াছিল। অনেকে এটি অসাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। শেষে সেই রেলওয়ে হইল, ক্রমে ক্রমে উহা সর্ব্বদেশব্যাপী হইয়া উঠিল, এখন কে না উহার উপকারভোগী হইয়াছেন? অগ্রে স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, সময় হইয়াছে কি না তাহার পর বুঝা যাইবে। আমরা যেমন দেখিতেছি, ভদ্র কুলঙ্গনারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া সাহেব ও বিবিদিগের সহিত একত্র পান ভোজনাদি করিতেছেন, তখন যে তাহারা স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না, কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়? ইউরোপীয়দিগের সহিত পান ভোজনাদির ন্যায় কি ইহা হিন্দু শাস্ত্রের নিষিদ্ধ?…আমাদিগের যেরূপ অন্তঃপুর প্রণালী আছে, সেই প্রকার কিঞ্চিৎ নিভৃত করিয়া স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করিলেই অভিষ্টসিদ্ধি হইবে।”

স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে সামাজিক কুসংস্কারের অন্তরায় তখনও যে কত প্রবল ছিল তা এইসব আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ‘সোমপ্রকাশের’ পত্রলেখক স্পষ্ট কথায় তা ব্যক্ত করেছেন। নারীসমাজে তখন শিক্ষা ও সংস্কারকর্মে অগ্রগামী ছিলেন ‘ব্রাহ্মিকা’ (ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত মহিলারা)

ও খ্রীষ্টান মহিলারা। কিন্তু ব্রাহ্মিকাদের সংখ্যা তখন খুব বেশী ছিল না এবং যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রকাশ্যে সংস্কারকর্মে যোগদান করতে বিশেষ কেউ সাহস করতেন না। তার কারণ, ব্রাহ্মসমাজের বাইরের প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রভাব তখনও ব্রাহ্মদের অন্তঃপুরেই বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি। অর্থাৎ ব্রাহ্মরা সমাজসংস্কারের জন্য বাইরে যতটা আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন, পরিবার-সংস্কারের জন্য তা করেননি। সুতরাং ব্রাহ্মিকারা যে বাইরের স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণের জন্য দলে দলে যোগদান করবেন, এরকম আশা করারও তখন যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া খ্রীষ্টানদের মতন ব্রাহ্মিকাদের ক্ষেত্রেও ধর্মের সমস্যা ছিল। ব্রাহ্মিকারা এদেশীয় মহিলা হলেও, এবং ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ হলেও, সাধারণ হিন্দুসমাজের কাছে তাঁরা স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বলে গৃহীত হতেন। হিন্দুরা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাকেও অনেকটা "ধর্মান্তর" বলেই মনে করতেন। খ্রীষ্টানদের কাছে তাঁরা যেমন ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাইতেন না, ব্রাহ্মিকাদের কাছেও তেমনি একই কারণে মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁদের আপত্তি ছিল। এই সমস্যা বাংলা-সরকারের কাছে স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় পরিচালনার সময় একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের নীতিগত কোন আপত্তি না থাকলেও সামাজিক কারণে আপত্তি ছিল। ১ অক্টোবর ১৮৬৭, তিনি বাংলার ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে সাহেবকে একখানি পত্রে জানান: [৩২]

> আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি এ-বিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি এবং অনুসন্ধানও করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার পূর্বের মত পরিবর্তনের কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, আমাদের দেশের হিন্দুসমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈরী করবার জন্য মিস কার্পেণ্টার যে প্রথ অবলম্বন করতে চান, তা কাজে পরিণত করা কঠিন। আমাদের সমাজের যে বর্তমান অবস্থা এবং দেশবাসীর যে মনোভাব তাতে এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে আমি যত

ভেবেছি, তত এই ধারণাই আমার দৃঢ় হয়েছে। যে কাজ বা পরিকল্পনা বাস্তবে সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তা আমি কোনমতেই সরকারকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতে পারি না।

এদেশের ভদ্রপরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই গৃহের বাইরে যেতে দেয় না, তখন তারা যে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে সম্মতি দেবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকি থাকে অসহায় অনাথা বিধবারা, এবং তাদেরই একাজে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকতার কাজে তারা কতদূর উপযুক্ত হবে আপাতত সে-প্রশ্ন বাদ দিয়েও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বিধবারা যদি সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দেয়, তাহলে লোকের কাছে তারা অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠবে। তা যদি হয় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী যে কতটা আবশ্যক ও অভিপ্রেত তা আমি বিশেষভাবে জানি, এবং সে-কথা আপনাকে নতুন করে জানানো বাহুল্য মনে করি। দেশবাসীর দৃঢ়মূল সামাজিক কুসংস্কার যদি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে সকলের আগে আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করতাম এবং একে কাজে পরিণত করার জন্য যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু যে-কাজে সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন করি না, তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি না।

জীবনের অনেক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পর বিদ্যাসাগর এই কথাগুলি এত স্পষ্ট করে বলেছেন। চিঠিখানি ১৮৬৭ সালে লেখা। তার আগে তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন। দেখেছেন, অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির ও পরিবারের বাইরের প্রগতির মুখোস বাস্তব সমস্যার সামান্য ধাক্কায় খসে পড়ে গেছে। এমনকি, পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাও যে এদেশের লোকের মনে কতখানি

শিকড় গাড়তে পেরেছে, এবং তার প্রকৃত সুফল কতটুকু ফলেছে তাও তিনি কম দেখেননি। সমাজসংস্কারের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় সত্যই শুদ্ধ সোণার মতন উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, সমাজে এরকম লোক তখন দু-চারজনও ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইংরেজীবিদদেরও যতটা হাঁকডাক ছিল বাইরে এবং যতটা সশব্দে তা ধ্বনিত হত, ভিতরটা সেই তুলনায় অনেক বেশী ফোঁপরা ছিল। এছাড়া সমাজের সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীলরা তো ছিলেনই, এবং তখনও তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলেন। বাকি ছিলেন ব্রাহ্মরা, কিন্তু তাঁদেরও চরিত্রে আদর্শ-আচারের যথেষ্ট বিরোধ দেখা যেত। বয়সের দিক থেকে বিদ্যাসাগর তখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তার মধ্যে অন্তত দীর্ঘ পঁচিশ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও তিনি সঞ্চয় করেছেন। সমাজের নানাক্ষেত্রে বহু ব্যক্তি, বহু বিচিত্র চরিত্র এবং বহু দল-উপদল ও প্রতিষ্ঠানও তিনি দেখেছেন। তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছেন, আমাদের দেশের লোক কত শত মণ কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছে, সামান্য কয়েক ছটাক কাজের জন্য। কথা ও কাজের দুস্তর ব্যবধান লোকচরিত্রে কোনদিনই তিনি সহ্য করতে পারেননি। জীবনে নিজে ছিলেন তিনি কঠোর বাস্তবপন্থী, তাই বড় বড় কথা ও পরিকল্পনার চেয়ে ছোটখাট কাজই হাতে-নাতে করতে তিনি ভালবাসতেন। নির্মম অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে বিচার করেছিলেন সেদিন। অনেক বন্ধু ও সহযোগীর সঙ্গে তাঁর মতভেদও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে তার আভাস পাওয়া যায় :[৩৩]

> এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার যে সমস্ত বিঘ্ন আছে, উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব তন্মধ্যে প্রধান। মিস্ কার্পেণ্টর ভারতবর্ষে আসিয়া এই অভাবের নিরাকরণার্থ সবিশেষ যত্নবতী হন। এক্ষণে অধিকাংশ স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য পণ্ডিতদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। যেখানে অন্তঃপুর মিসন আছে সেখানে খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষয়িত্রী মিলে ; কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ ফললাভের সম্ভাবনা না থাকাতে

মিস্ কার্পেণ্টর কয়েকটি 'স্ত্রী-নর্মাল' বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। সর সিসিল বীডন এ বিষয়ে প্রধান প্রধান লোকের মত জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে বহু মতামত ও নানা আপত্তি হয়। সর জন লরেন্স স্থানীয় ফণ্ডের আপত্তি করিয়া বলেন, লোকে যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু মিস্ কার্পেণ্টর কেবল গবর্ণর জেনরেলের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্টের অতিশয় উৎসাহ ছিল। তিনি এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিলেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক স্থানে মাসিক ১০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা হইল। নানাজনের আপত্তি নিবন্ধন আপাততঃ পাঁচ বৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয় হইতেছে। কলিকাতার বেথুন বিদ্যালয়ে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া যে মতভেদ হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে যে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদ নাই। তবে প্রশ্ন এই হইতেছে, হিন্দু শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার সময় আসিয়াছে কি না? আমরা ইহার আন্দোলন প্রারম্ভ কালেই কহিয়াছি সে সময় উপনীত হইয়াছে। অন্ততঃ ইহার পরীক্ষা করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পরীক্ষামাত্র করিতেছেন।

'সোমপ্রকাশ' পরোক্ষে এখানে বিদ্যাসাগরের মতেরই সমালোচনা করেছেন, কেবল সাহস করে তাঁর নামটি উল্লেখ করতে পারেননি। কিন্তু 'সোমপ্রকাশের' এই বলিষ্ঠ নীতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সামাজিক ক্ষেত্রে সেভাবে তা প্রকাশ করার সময় সত্যই তখনও হয়নি। এমনকি সম্পাদকের একই লেখনীর বক্তব্যের মধ্যে যে স্ববিরোধ ফুটে উঠেছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ের 'কাল্পনিক' সাফল্যে উৎসাহিত হয়েছিলেন মাত্র। এই একই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন: "এ স্থলে আমরা অতিশয় সতর্ক হইয়া কাজ করিবার অনুরোধ

করিতেছি। মিস্ কার্পেণ্টর শিক্ষয়িত্রীদিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আপাততঃ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল স্ত্রীলোক নর্ম্মাল-বিদ্যালয়ে আসিবেন, তাহাদিগকে আবৃত শকটে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে যে সে পুরুষদর্শক যাইতে পারিবেন না। যে সমস্ত স্ত্রীলোক নর্ম্মাল-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ আসিবেন, তাহাদিগের লোভ ও উৎসাহ জন্মে এরূপ অর্থ দানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।" এত দ্বিধা ও সংশয় নিয়ে, এবং কুসংস্কার সম্বন্ধে এত সচেতন হয়ে, 'সোমপ্রকাশ' যখন স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ের পক্ষে ওকালতি করেন, তখন তা হাস্যকরই মনে হয়।

বিদ্যাসাগরের চেয়ে বাংলা-সরকারের ক্ষমতা অনেক বেশী, সুতরাং তাঁর মত গৃহীত হল না। অবশেষে স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় খোলা হল। বাংলা-সরকার বেথুন স্কুল-কমিটিকে লিখলেন :[৩৪] "ছোটলাট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্তমান অবস্থায় যা করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভাল উপায়ে এই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কুল আরও ছোট করে, তার সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল যোগ করে দিলে সেই প্রয়োজন মিটতে পারে বলে ছোটলাট মনে করেন। তাই করাই যদি সাব্যস্ত হয়, তাহলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষাবিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আনার প্রয়োজন হবে। এতদিন পর্যন্ত একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কয়েকজন এদেশীয় লোকের একটি কমিটি বেথুন বিদ্যালয় পরিচালনা করে এসেছেন। কিন্তু এখন এই কমিটির সদস্যরা, নতুন ব্যবস্থা অনুসারে, বিভাগীয় স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের সহযোগিতায় পরামর্শসভার সভ্যরূপে কাজ করতে সম্মত আছেন কিনা ছোটলাট জানতে চান।"

বলা বাহুল্য, বেথুন স্কুল-কমিটি এই নতুন শর্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে সম্মত হননি। এই কমিটিরই সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর। কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে তিন বছরের জন্য মিসেস ব্রিটুশে নামে এক মহিলা বেথুন ও নর্মাল বিদ্যালয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। ২ মার্চ ১৮৬৯ স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব ডি. পি. আই.-কে লেখেন : "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩ ফেব্রুয়ারি বেথুন-স্কুল সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়গৃহে

এবং তার সামনের জমিতে বেড়ালেন। হিন্দু মহিলাদের বিদ্যালয়ে থাকবার ব্যবস্থা করতে হলে কি কি করা দরকার, সে-বিষয়ে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। নর্মাল-স্কুল করে যে বিশেষ কোন ফল হবে, এমন আশা তিনি অবশ্য করেন নি। কিন্তু তবু তিনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে নর্মাল-স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, প্রয়োজন হলে তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।"

সরকারী ইচ্ছায় এবং কয়েকজন অত্যুৎসাহীর আগ্রহে কাগজে-কলমে স্ত্রী-নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু স্কুলের কাজ আরম্ভ হতে বিলম্ব হতে থাকল। সেই সমস্যাই সামনে পর্বতের মতন মাথা তুলে দাঁড়াল, দেশের লোকের কুসংস্কারের সমস্যা। স্কুল খোলা হল, মেমসাহেব সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হলেন, সরকারী অর্থও খরচ হতে থাকল, কিন্তু দিন চলে যায় তবু কাজ আর আরম্ভ হয় না। কেন হয় না? ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব ভাবলেন, সবই তো হল, কিন্তু যে-গাড়ীতে করে মহিলাদের নিয়ে আসা হবে, তাতে তো পুরুষ গাড়োয়ান ও সহিস থাকবে, তাহলে পরিবারের লোকজন আপত্তি করবে না কি? দেশীয় লোকের কুসংস্কার সম্বন্ধে সাহেবের এত ভয়, যে পুরুষ গাড়োয়ান ও সহিসের সমস্যায় সত্যই তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন :[৩৫]

> বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ের বাটীর এক পার্শ্বে ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার জন্য আবশ্যক বিষয়গুলিও প্রস্তুত হইয়াছে, এবং শুনাও যাইতেছে, ঐ ভাবী স্ত্রীবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকার জন্য প্রতি মাসে টাকাও গৃহীত হইতেছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে না কেন? উত্তরটী কৌতুককর—'স্ত্রীলোক শকটচালক (গাড়য়ান) এবং স্ত্রীলোক সয়িস'—যতদিন পাওয়া না যাইবে ততদিন বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে না, এইটী সাহেবের উত্তর। এখন দেখা যাউক কি হয়।
>
> এদেশে স্ত্রীলোকেরা ত এখনও এতদূর বিদ্যাবতী হয় নাই, এবং এত স্বাধীনতাও পায় নাই যে শকট চালনা কার্য্য করিতে সক্ষমা হইবে।

> সাহেব এবার বিলাত গিয়াছেন, এই সুযোগে যদি তিনি স্বদেশ হইতে দুই-তিনটি স্ত্রী-গাড়য়ান এবং সয়িস আনেন তাহা হইলে স্ত্রীবিদ্যালয়ের সংস্থাপন আশা হইতে পারে। বিলাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন এ মহৎ কার্য্যে ব্রতী হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। আমরা সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি তিনি যেন এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ২।৩টী বিবি-সয়িস ও বিবি-গাড়ওয়ান লইয়া আসেন।

ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও এর ভিতর দিয়ে সমস্যার গুরুত্বটি প্রকাশ পেয়েছে। হয়ত হিন্দুসমাজের অবরোধপ্রথার আতঙ্কে সাহেব একটু বেশী মাত্রায় কাহিল হয়েছিলেন, কিন্তু সমস্যাটা প্রায় তখন ঐরকমই ছিল। উচ্চ সমাজের সম্ভ্রমবোধ তখন আষ্টেপৃষ্ঠে পর্দাপ্রথার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। ঐটাই ছিল মর্যাদার বড় মানদণ্ড। নিচু থেকে সমাজের উপরের স্তরের দিকে ধাপে ধাপে যত ওঠা যায়, তত দেখা যায় যে অবরোধপ্রথার কঠোরতা বাড়ছে, এবং যত নিচু দিকে নামা যায় তত দেখা যায়, তার বন্ধন আল্‌গা হচ্ছে। এই যখন সমাজের অবস্থা তখন ইনস্পেক্টর সাহেব যে পুরুষ শকটচালকের জন্য শঙ্কিত হবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়াও একে একে অন্য সব সমস্যাও দেখা দিল।

শিক্ষিকা হবে কারা? তার জন্য কারা নর্মাল-স্কুলে পড়তে আসবে? যে কেউ আসলে চলবে না। সমাজের সম্ভ্রান্ত স্তর থেকে আসা চাই। কিন্তু সম্ভ্রান্ত স্তরের মেয়েদের দশ-এগার বছর বয়স থেকে সংসারে বধূর কর্তব্য পালন করতে কেটে যায়। সুতরাং তারা শিক্ষিকা হতে পারে না। এদেশীয় ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে কেউ কেউ হতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা একে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, তার উপর অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ঘরের ছিলেন না। তাঁরা শিক্ষিকা হলেও আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। বাকি থাকেন ব্রাহ্মিকারা ও হিন্দু বিধবারা। স্বাধীনতার ব্যাপারে হিন্দু কুমারী, বিবাহিতা ও বিধবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রাহ্মিকারা ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টানদের মতন তাঁদের সম্বন্ধেও ধর্মভয় ছিল। এ-বিষয়ে 'বামাবোধিনী পত্রিকার' এই মন্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়:[৩৬] "বেথুন বালিকা-

বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের স্থান প্রস্তুত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিক্ষার অধ্যক্ষগণ ছাত্রীদিগের নিমিত্ত উপযুক্ত নিয়মাদি করিতেছেন না। ব্রাহ্মেরা বরাবর এ-বিষয়ে সচেষ্ট আছেন এবং ১০।১২টী ছাত্রী দিবারও প্রস্তাব করেন। কিন্তু কর্ত্তীপক্ষিয়দের সঙ্গে মধ্যে তাঁহাদিগের যেরূপ কথাবার্তা হয়, তাহাতে তাঁহারা ভগ্নাশ হইয়াছেন।...ব্রাহ্মেরা হিন্দু-সমাজের প্রচলিত আচারব্যবহারে সম্পূর্ণ যোগ দেন না, অতএব তাঁহাদিগের স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিয়া হিন্দু-সমাজের কোন উপকার হইবে না, অধ্যক্ষদিগের এই আশঙ্কা। এসকল কথা কেবল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় না হইতে দিবার কথা। ব্রাহ্মগণ হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত নহেন, তাঁহারাই ইহার উন্নত ও শিক্ষিত দলের প্রতিনিধি। ব্রাহ্মগণ দ্বারাই হিন্দুসমাজ হইতে কুসংস্কার ও অনর্থকর দেশাচার উন্মূলিত হইয়া সদাচার সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।...তাঁহাদিগকে ছাটিয়া ফেলিয়া এতদ্দেশে একটী নূতন সভ্যপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা দুরাশা মাত্র। শিক্ষাধ্যক্ষগণ কি মনে করেন, বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ হিন্দু-সমাজ হইতে বয়ঃস্থা রমণীসকল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে আর তাহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন সেখানেই যাইবে? তাঁহারা নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক অথবা অসচ্চরিত্র রমণী হইতে পারেন। কিন্তু অল্পকাল শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উন্নত ও পবিত্র পদে অধিষ্ঠিত করা কিরূপ সম্ভব সকলেই বুঝিতে পারেন।"

'বামাবোধিনীর' যুক্তির মধ্যে গলদ নেই কোথাও, কিন্তু সামান্য একটু হাসির খোরাক আছে। ব্রাহ্মিকারা ছাড়া কারা শিক্ষিকা হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে অন্য কেউ হবে না, এবং হিন্দুসমাজ থেকে যদি কেউ হয়, তাহলে তারা 'নীচজাতীয়' ও 'অসচ্চরিত্র' হবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ 'বামাবোধিনী'র মতে তখনকার সমাজে সচ্চরিত্র ও উচ্চজাতীয় মহিলা যাঁরা শিক্ষিকা হতে পারতেন তাঁরা 'ব্রাহ্ম'। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে যাঁরা দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই নিশ্চয় হিন্দুসমাজের উচ্চ-শ্রেণীর লোক ছিলেন না। সেকথা বাদ দিয়েও বলা যায়, 'সোমপ্রকাশের' সেই পত্রলেখকের কথাই তো সত্য হল! পত্রলেখক বলেছিলেন, একমাত্র

বোষ্টমীরা ছাড়া আর কেউ নর্মাল-বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা তৈরী হতে আসবেন না। তার চেয়েও বেশী সত্য হল বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যদ্বাণী। স্ত্রী নর্মাল-বিদ্যালয় সফল হবে না, বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, কারণ সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারের অবরোধপ্রথার গোঁড়ামি এত বেশী যে বয়স্কা মহিলাদের তারা কিছুতেই শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করতে দেবে না।

বিদ্যাসাগরের কথাই সত্য হল। তিন বছর না যেতেই পরবর্তী ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেল বেথুন-বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নর্মাল-স্কুলটি তুলে দেবার আদেশ দিলেন। ডি. পি. আই.-কে তিনি লিখে জানালেন :[৩৭]

> সাধারণভাবে বিচার করে দেখলে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, তিন বছর ধরে পরীক্ষা করবার পরেও 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' সফল হয়নি। অতএব ১৮৭২, ৩১ জানুয়ারি তারিখের পর 'ফিমেল নর্মাল স্কুলটি' বন্ধ করে দেওয়া হোক।

অবশেষে নর্মাল স্কুল উঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েক বছরের বাক্‌যুদ্ধের অবসান হল ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে। বেথুন-বিদ্যালয়ের কাজ আগের মতন চলতে থাকল এবং ছাত্রীসংখ্যাও বাড়তে থাকল ধীরে ধীরে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্ম যুবকরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করবার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগী হলেন। এঁদেরই আন্দোলনের ফলে ১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হল। ১৮৭৮, ২৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হল : "That the female candidates be admitted to the University examination, subject to certain rules." স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির একটা বড় বাধা দূর হল ১৮৭৮ সাল থেকে।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে সমস্ত বাধা একেবারে দূর হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার্থীরা প্রবেশাধিকার পাবার পর চারিদিক থেকে আপত্তির গুঞ্জন উঠল। এমনকি প্রবীণ ব্রাহ্মেরা পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার এতদূর

অগ্রগতি ও উন্নতি সুনজরে দেখতে পারলেন না। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখলেন :[৩৮]

> বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। প্রতি বৎসরই বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী বালিকাগণেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি আবার বঙ্গীয় অবলাগণ উত্তীর্ণ হইতেছেন। গত তিন বৎসরের মধ্যে পাঁচজন বঙ্গীয়া কুমারী প্রবেশিকা এবং দুইজন এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আর কয়েক বৎসরে বঙ্গীয়া নারীগণের মধ্যে অনেকে বি. এ. এম. এ. পরীক্ষা দানে কৃতকার্য্য হইবেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনেকে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ উন্নতি দেশের অতিশয় হিতকর শুভকর জ্ঞান করিতেছেন··· কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা কি শুভকর ফল তাহা আমরা বঙ্গীয় যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইতেছি।··· আমাদিগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারা ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতিবিচ্যুত হইবেন।···বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী স্ত্রীলোকগণের পক্ষে কোনক্রমেই উন্নতিকর ও শুভ ফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ হৃদয়-প্রধান, এবং পুরুষ-প্রকৃতি স্বভাবতঃ বুদ্ধি-প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে ; অতএব ঐপ্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।

স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর অন্দোলনের পরেও, সমাজের মধ্যে যাঁরা নিজেদের সবচেয়ে উন্নতিশীল ও প্রগতিপন্থী বলে মনে করেন সেই ব্রাহ্মরাও, স্ত্রী-পুরুষের 'প্রকৃতির বিভিন্নতার' যুক্তি দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার স্বাতন্ত্র্য দাবী করছিলেন। 'বুদ্ধির উন্নতি' স্ত্রীশিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, একথা ১৮৮০ সালেও ব্রাহ্মরা প্রচার করছিলেন। হিন্দুসমাজের সবচেয়ে উন্নতিশীল গোষ্ঠী ব্রাহ্মরাই যখন বহুকালের সংস্কার সহজে ছাড়তে পারেননি, তখন অন্যান্য শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মনোভাবের কথা উল্লেখ না করাই বোধ হয় ভাল। স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথে উনিশ শতকের শেষ দশকেও যে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল, তা 'তত্ত্ববোধিনীর' এই যুক্তি-বিন্যাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। কুসংস্কারের এই অন্তরায় দূর হতে আরও অনেকদিন সময় লেগেছিল। কিন্তু তা লাগলেও, ১৮৭৮ সালের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্ত্রী-পুরুষের সমান শিক্ষার মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হবার পর থেকে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার স্থিরগতিতে হতে থাকে।

বিদ্যাসাগর তখন জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েছেন। কেবল ক্লান্ত নন তিনি, সংস্কার-সংগ্রামে নির্যাতিত ও ক্ষত-বিক্ষত। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনের সময় তিনি দেখেছেন এবং প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, 'সংস্কার' কুসংস্কার হলেও তা সংস্কার, দু-চার পুরুষে বা দু-তিন শতাব্দীতেও কেবল বুদ্ধিগম্য একটা উন্নত আদর্শের জোরে তা উন্মূলন করা যায় না। তাই সমাজের শিক্ষিতশ্রেণীর মনেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানারকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় দেখে তিনি ব্যথিত হলেও, বিচলিত হননি। কেবল তাঁর উৎসাহকে জীবনের শেষদিকে কিছুটা সংযত করেছিলেন মাত্র। স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, এই কুসংস্কার যতদিন না দূর হবে ততদিন 'নর্মাল' বিদ্যালয় তো নয়ই, স্ত্রীশিক্ষাও সফল হবে না। পরবর্তীকালের ঘটনা থেকে তাঁর কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ১৮৮০ সালেও আমরা দেখেছি, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হৃদয়ের বদলে মেয়েদের বুদ্ধির চর্চার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন। তার পরেও 'সোমপ্রকাশ' স্ত্রীশিক্ষার কয়েকটি প্রতিবন্ধকের

মধ্যে বাল্যবিবাহের কুসংস্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৩৯] স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে ১৮৮১ সালেও তাঁরা লিখেছেন: "অনেকে বলেন বঙ্গদেশে স্ত্রীগণের সুশিক্ষা হইতেছে, কিন্তু আমরা বুঝিতেছি সেটি জনরব মাত্র। অনেকে ইউরোপীয় ভ্রমে পতিত হইয়া মনে করিয়া থাকেন বঙ্গদেশে সুন্দর স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে। সেদিন সার রিচার্ড টেম্পল বক্তৃতা-কালে একথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য ইউরোপীয়েরাও সময় সময় এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদিগের এটি ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়।" 'সোমপ্রকাশের' মতন উৎসাহী স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকও উনিশ শতকের অষ্টম দশকে, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির কথাবার্তাকে 'জনরব' ও 'ভৌতিক কাণ্ড' বলেছেন, এবং বাল্যবিবাহের কুসংস্কারকেই প্রধান অন্তরায় বলে নির্দেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরও তাই বলেছিলেন। শুধু যে মুখেই বলেছিলেন তা নয়, বিদ্যাসাগর তাঁর গভীর সমাজবোধ থেকে বুঝেছিলেন, যে সমাজসংস্কারের সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতি অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। একটি বাদ দিয়ে আর-একটি সফল হতে পারে না। সেইজন্যই মনে হয়, তিনি শিক্ষাসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের দুরূহ কর্তব্য পালনের জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছিলেন।

৭ | সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ (১)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সনের ২৭ শ্রাবণ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ৩১ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে লেখেন :[১]

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারীবিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ

লাকদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে

সেন্ট্রাল ফিমেল
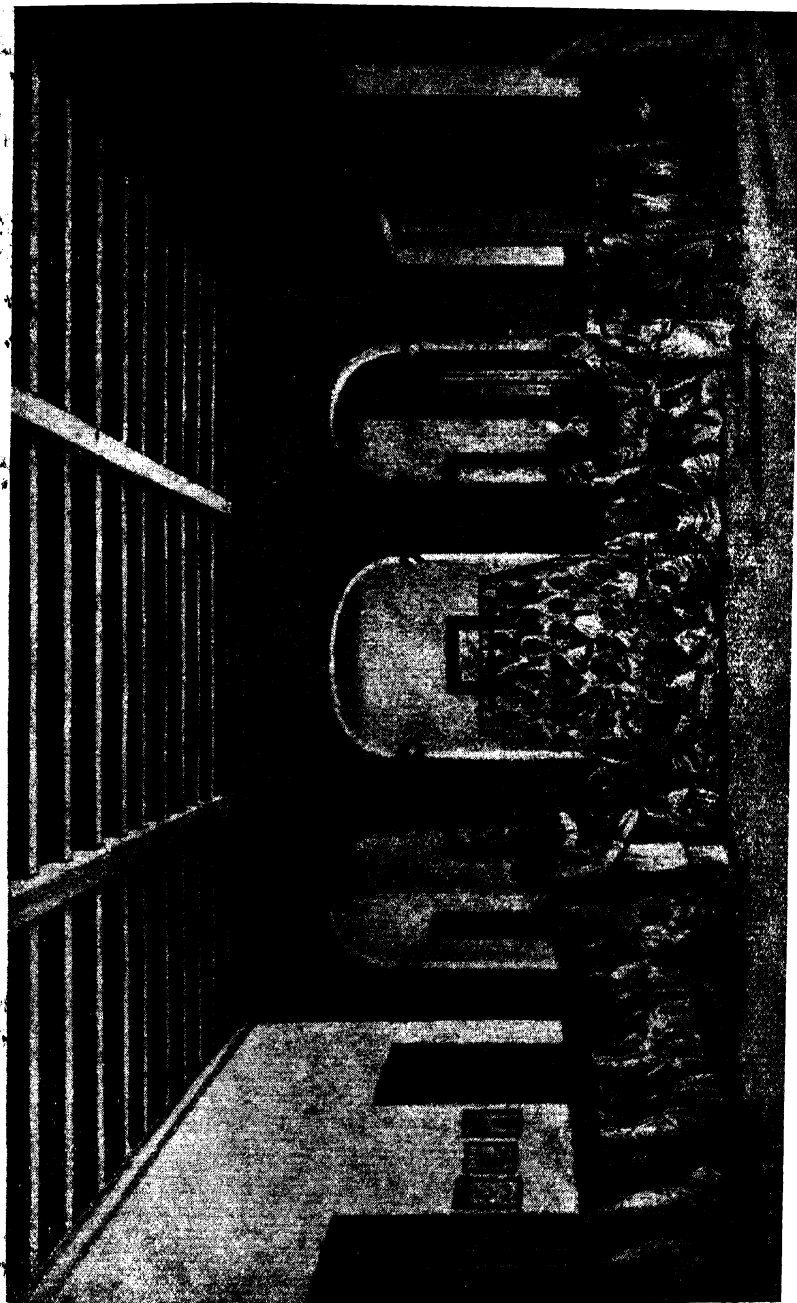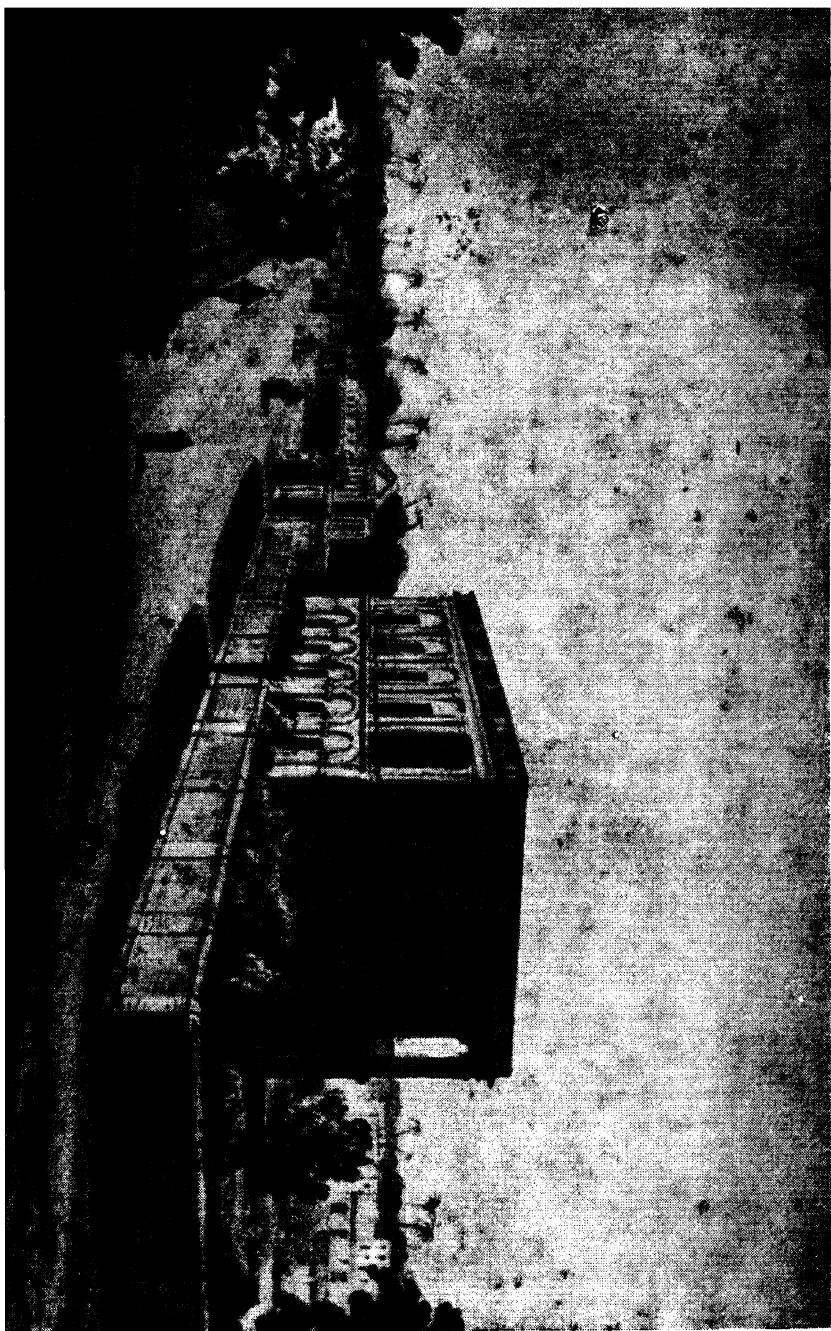
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্বমহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না।…

বিধবাবিবাহের প্রবর্তন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তাঁর জীবনের কত বড় মহৎ কর্ম বলে মনে করতেন, তা এই পত্রখানি থেকে বোঝা যায়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে এই সংস্কারকর্ম তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম', এর জন্য তিনি 'সর্বস্বান্ত' হয়েছেন, এবং আবশ্যক হলে 'প্রাণান্ত স্বীকারেও' পরাঙ্মুখ নন। দেশাচারে যদি সমাজের অকল্যাণ হয়, তাহলে কেবল দেশাচার বলেই যে তার অন্ধ দাসত্ব করতে হবে, একথা তিনি কখনই স্বীকার করতেন না। লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয়ে তিনি কখনই বিচলিত হননি। সমাজের কল্যাণের জন্য লোকাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর যে-সব সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন, তার মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন সর্বপ্রধান।

কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার-কর্মের আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর কি হঠাৎ একদিনে অনুভব করেছিলেন? নিশ্চয়ই তা করেননি, তা করতেও পারেন না। কারণ প্রচলিত সামাজিক প্রথা অথবা দেশাচারের গতানুগতিক ধারা পরিবর্তনের ইচ্ছা, সমাজের কোন ব্যক্তির (Individual) বা গোষ্ঠীর (Group) মনে অকস্মাৎ জাগে না। প্রথমে প্রচলিত সমাজবিন্যাসে (Social Structure) ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভাঙন ধরে ও পরিবর্তনের সূচনা হয়। তারপর সামাজিক পরিবেশেরও পরিবর্তন হতে থাকে। নতুন ব্যক্তির, নতুন গোষ্ঠীর, নতুন শ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে সমাজে। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বের মধ্যে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা 'অস্থির' (fluid) হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সমাজে নতুন নতুন অভাব, চাহিদা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের উৎপত্তি হয়, এবং পুরাতনের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। এই বিরোধের মধ্য দিয়ে যুগসন্ধিক্ষণের সমাজ ধীরে ধীরে সুস্থির ও আত্মস্থ হয়। সুতরাং নতুন কোন সামাজিক চিন্তা বা ইচ্ছা কোন ব্যক্তির মনে হঠাৎ উদ্ভূত হয় না। গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, ও ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে, এবং তাদের নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সময়, সমাজে নতুন আদর্শ, ইচ্ছা ও সংস্কারকর্মের প্রেরণার বিকাশ হয়। এ যুগের একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) বলেছেন :[২]

> How do new things break through the 'cake of custom'? The familiar reference of the genius is not sufficient. To repeat, one need not ignore the role of leading individuals to consider the psychology of the pioneer secondary to the sociological question of what situations provoke new collective expectations and individual discoveries. The answer is almost implied in the question ; innovations arise either from a shift in a

> collective situation or from a changing relationship between groups or between individuals and their groups. It is such shifts which father new adaptations, new assimilative efforts, and new creations.

বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজের সমষ্টিরূপের (collective situation) অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। আগে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি ('দ্বিতীয় খণ্ড' দ্রষ্টব্য)। রামমোহন ও তাঁর 'আত্মীয় সভা', ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ (ইয়ংবেঙ্গল), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী সভা', ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাবে ও ক্রিয়াকলাপে সমাজের বুকে প্রবল তরঙ্গের সঞ্চার হয়েছিল, এবং তার আঘাতে নতুন-পুরাতনের ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়ে এইসব নতুন গোষ্ঠীর মনে নবীন জীবনাদর্শ ও সংস্কারাকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। বিদ্যাসাগর পরোক্ষে, এবং প্রত্যক্ষভাবে, এইসব নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং এই নতুন 'collective situation' থেকেই তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্মের' (বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের) অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর সংস্কারকর্মের বিবরণ দেবার আগে তাই তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমিটুকু সর্বপ্রথম আলোচ্য।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল, সমাজের বহু নারীর ভাগ্যে অকালবৈধব্য। আমাদের সমাজে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইসব কুপ্রথার ফলাফল ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছিল। বাল-বিধবার সংখ্যাও সমাজে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। তখনকার সমাজে যাঁরা প্রভাবশালী ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের সামনে মধ্যে-মধ্যে এই বালবৈধব্যের সমস্যা ঘোর পারিবারিক সংকটরূপে দেখা দিত। দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ সমাজের কোন বিশেষ প্রভাবশালী পরিবারের একটি মাত্র কন্যা যদি বালিকা-বয়সে বিধবা হয়, তা হলে তার বৈধব্য পারিবারিক সংকটরূপে দেখা দিতে বাধ্য। তখন তাঁরা প্রচলিত শাস্ত্র

সংস্কার করেও সেই সংকটের সমাধান করার চেষ্টা করতেন বলে মনে হয়। কারণ শাস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা বড়, এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা। এইসব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সাধারণত সমাজের বিভিন্ন জাতির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনধারণ করতেন। প্রয়োজন হলে, পৃষ্ঠপোষকের পরামর্শে ও প্রয়োজনে তাঁরা প্রচলিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা পরিরর্তনেরও চেষ্টা করতেন। রাজা রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা এই ধরনের কোন ঘটনা বলে মনে হয়।

'ক্ষিতীশ বংশাবলি-চরিত' গ্রন্থের লেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন :[৩]

> বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্রসমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য যন্ত্রনা দর্শনে, যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হৃদয় হইয়া, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থার পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে অনায়াসেই নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণেরও নিকট ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব।

রাজবল্লভের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতেরা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করেও, ব্যবহারবিরুদ্ধ বলে তাতে সম্মতি দেননি। এ বিষয়ে একটি কৌতুককর প্রবাদের উল্লেখ করেছেন চরিতকার। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়িতে রাজা রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতদের যখন নানা-রকমের খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়, তখন তাঁদের খাদ্যের সঙ্গে একটি মহিষশাবকও পাঠানো হয়। তাই দেখে পণ্ডিতেরা রাজার কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই মহিষবৎস কিজন্য?" কর্মচারী উত্তর করেন, "আপনাদের

আহারের জন্য মহারাজা পাঠিয়েছেন।" পণ্ডিতেরা বলেন, "আমরা এর মাংস খাই না।" কর্মচারী বলেন, "কেন ? মহিষের মাংস ভোজন করাতে শাস্ত্রে তো কোন নিষেধ নেই ?" পণ্ডিতেরা বলেন, "হ্যাঁ, নিষেধ নেই বটে, কিন্তু এদেশে এ মাংস ভোজনের ব্যবহার বা রীতি নেই।" কর্মচারী তখন জিজ্ঞাসা করেন, "যখন শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলে আপনারা মহিষের মাংস ভোজন করলেন না, তখন শাস্ত্রসম্মত হলেও দেশাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ আপনারা কোন্ যুক্তিতে প্রচলন করতে চান ?" পণ্ডিতেরা একথার কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করে রইলেন।

এই কাহিনীর মধ্যে যে আসল ঐতিহাসিক সত্যটুকু আছে তা এই : রাজা রাজবল্লভ তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার জোরে নিজের বালবিধবা কন্যার জন্য বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে পণ্ডিতদের শাস্ত্রসম্মত অনুমোদনও লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক আরও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয়েছিল, এবং দেশাচারবিরুদ্ধ বলে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রায় একশ বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তারপর একশ বছরের মধ্যে এরকম আর কোন ঘটনা যে ঘটেনি তা বলা যায় না। বালবিধবা কন্যার দুঃখে অনেক পিতার মনে রাজা রাজবল্লভের মতন ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক। বোঝা যায়, বালবৈধব্যের প্রতিকারের আবশ্যকতাবোধ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সমাজের বহুজনের মনে ধীরে ধীরে জাগছিল। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলার সমাজসংস্কারকরা জনমনের এই প্রতিকারেচ্ছাকে নির্ভয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেছিলেন ১৮১৫ সালে। 'আত্মীয় সভার' বৈঠকে যে-সব সামাজিক প্রথার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হত, তার মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য অন্যতম। ১৮১৯ সালে এই সভার একটি বৈঠকের বিবরণে দেখা যায় :[৪] "At the meeting in question...... the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy, the practice of polygamy and of suffering

widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned……" জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার সমস্যার সঙ্গে বালবৈধব্য-বহুবিবাহ-সতীদাহের সমস্যাও 'আত্মীয় সভার' বৈঠকে নিয়মিত আলোচিত হত। ১৮২৮-২৯ সাল থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রশিষ্যদের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের' (Academic Association) বৈঠকেও এইসব সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তিরিশের গোড়া থেকেই ইয়ংবেঙ্গল দল এইজাতীয় কুসংস্কার লক্ষ্য করে তীব্র ভাষায় হিন্দু-সমাজকে কশাঘাত করতে থাকেন। তাঁদের সংস্কার-সংগ্রামের ধ্বনি হয় 'Down with Hinduism ! Down with Orthodoxy !' বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাঁর ছাত্রজীবনের এই সমাজচিত্র আগে বর্ণনা করেছি।*

তিরিশের আন্দোলনের ফলে ভারতীয় 'ল কমিশন' (Indian Law Commission) বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের সমস্যাটি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে আইন-প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্‌যোগী হন। শিশুহত্যা প্রথার (Infanticide) মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা এই সমস্যার সম্মুখীন হন। জে. পি. গ্রান্ট তখন ভারতীয় 'ল কমিশনের' সেক্রেটারি ছিলেন। ৩০ জুন ১৮৩৭, তিনি কলিকাতা, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের এ বিষয়ে মতামত কি তা জানবার জন্য একটি পত্র লেখেন। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য কোন 'আইন' পাশ করা যায় কি না, এবং করলে তা হিন্দুসমাজের আচারবিরুদ্ধ বা হিন্দু-শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় কি না, এই বিষয়ে বিভিন্ন আদালতের ইংরেজ বিচারকরা গ্রান্ট সাহেবকে তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কলকাতার সদর আদালতের রেজিস্ট্রার আর. ম্যাকান (R. Macan) পত্রোত্তরে জানান :[৬]

> হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমাজে যে নানারকমের কুফল দেখা দিচ্ছে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও,

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১০ অধ্যায়, ১৮৭-২১৮।

কোর্টের মত এই যে এই ব্যবস্থার প্রচলনের জন্য কোন আইন পাশ করা হলে তা ভারত-সরকারের দিক থেকে জনসমাজের কাছে বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ করা হবে (প্যারা ২)।

হিন্দুরা বিবাহকে একটা বিধানিক চুক্তি (Civil Contract) বলে মনে করেন। শৈশবে বাক্‌দানের স্তর থেকে বিবাহের আনুষ্ঠানিক স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক পর্বের ধর্মীয় গুরুত্ব আছে। হিন্দুরা সকলে বিশ্বাস করে, এবং শাস্ত্রবচনও তাই যে, বিধবারা পুনর্বিবাহ করলে কেবল যে ইহজীবনেই হেয় প্রতিপন্ন হয় তা নয়, পারলোকে স্বর্গবাস থেকেও বঞ্চিত হয় (প্যারা ৩)।

জাতিগত প্রথা ও সামাজিক প্রথা দুয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করা হবে আইন পাশ করা হলে (প্যারা ৪)।

এসব ছাড়াও, এই আইন পাশ করা হলে হিন্দু দায়ভাগের (Law of Inheritance) মূল ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠবে (প্যারা ৫)।

•

এলাহাবাদ সদর আদালতের রেজিস্ট্রার এইচ. বি. হ্যারিংটন (H. B. Harrington) সাহেব গ্রান্টের উক্ত পত্রের উত্তরে (১১ অগস্ট, ১৮৩৭) লেখেন :[৭]

হিন্দু পরিবারে নারীর যে বিশেষ স্থান ও মর্যাদা আছে তার গুরুত্ব তাঁদের কাছে অত্যন্ত বেশী। হিন্দু বিধবাদের দুঃখকষ্টকে তাঁরা পীড়াদায়ক বলে মনে করেন না। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা, নীতি ও ধর্মরক্ষার জন্য এইটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা প্রত্যেক হিন্দু বিধবার অবশ্য-কর্তব্য। বিধবারা পুনর্বিবাহ করলে শুধু যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে তাই নয়, সমাজের চোখে যে-পরিবারের বিধবারা তা করবে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। এইজন্যই এ বিষয়ে কোন আইন পাশ করার যথেষ্ট গুরুদায়িত্ব আছে (প্যারা ২)।

মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাশ করলে নিঃসন্দেহে ন্যায়-সঙ্গত কাজই করা হবে ; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু আইনের দিকে লক্ষ্য

রেখে তা করলে, জনসাধারণের অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে আঘাত করা হবে (প্যারা ৩)।

১৮৩৭, ৩১ জুলাই ফোর্ট সেণ্ট জর্জের সদর আদালতের রেজিস্ট্রার ডবলিউ. ডগলাস (W. Douglas) গ্রাণ্টের পত্রোত্তরে লেখেন :[৮]

ভারতের হিন্দুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, দেশাচার ও সামাজিক প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য। তাতে হস্তক্ষেপ করলে তাদের বিরাগভাজন হতে হবে। বিধবাদের পুনর্বিবাহপ্রথা হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সাধারণত উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজেই এই প্রথা নিষিদ্ধ দেখা যায়। সুতরাং আইনের জোরে এই পুনর্বিবাহপ্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা করলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করতে পারেন যে ভিন্ন-ধর্মী বিদেশী সরকার আইনের বলে তাঁদের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সমস্তরভুক্ত করে দিচ্ছে। এই ধরনের সামাজিক ধারণা যাঁদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে যুগ-যুগ ধরে, তাঁদের সেই ধারণাকে হঠাৎ আইনের আঘাতে ধূলিসাৎ করে দেওয়া বিচক্ষণের কাজ হবে না (প্যারা ৩)।

বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইংরেজ আইনজ্ঞদের এইসব মতামত দেখে মনে হয়, এদেশের সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার তাঁরা জোর করে দূর করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা এদেশের আভ্যন্তরিক সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সতীদাহপ্রথা নিবারণের আন্দোলনের সময় অধিকাংশ ইংরেজ রাজকর্মচারী সরকারী নীতির দিক থেকে তা সমর্থন করেননি। তাঁদের শাসননীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা। সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয় যেহেতু ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেইজন্য এইসব সমস্যার কোন আন্দোলনই তাঁরা প্রকাশ্যে সমর্থন করতে সাহস করতেন না। কলকাতা, এলাহাবাদ ও ফোর্ট সেণ্ট-জর্জের সদর আদালতের বিচারকরা বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে এই মনোভাবই

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হলেও, বিধবাবিবাহের সমস্যার গুরুত্বকে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এবং তাঁদের সেই স্বীকৃতির পিছনে ছিল এদেশের লোকের এ বিষয়ে ক্রমজাগ্রত চেতনা। তিরিশের মধ্যেই বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের দাবী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনার মধ্যে বেশ মুখর হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় 'ল কমিশনের' পূর্বোক্ত বিচার-বিবেচনা তার পরোক্ষ প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮৩৭-৩৮ সালে ভারতীয় 'ল কমিশন' এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। বাইরের সমাজেও নিশ্চয় তখন আলোচনা পূর্বের চেয়ে আরও খানিকটা ব্যাপক হয়েছিল। 'ল কমিশন' সোজাসুজি বিধবাবিবাহের আইন প্রণয়নের প্রশ্ন উত্থাপন করছিলেন। মনে হয় না তার আগে এই বিষয় নিয়ে এত নির্দিষ্টরূপে কোন আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। স্বভাবতই তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিধবাবিবাহের আলোচনা এই সময় আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ১৮৪২ সালে লেখেন :[১]

> যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষমানা হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতাই কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধিমাত্র। এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকের দ্বারা তৎ প্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধ হয় যে তৎপ্রতি তাঁহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে···

১৮৪২, এপ্রিল মাসে এই কথা লেখার পর জুলাই মাসে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' আবার লেখেন : "এক্ষণে হিন্দু জাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃ স্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না···।" ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্রের

এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমেই তাঁরা বলেছেন যে, বাইরের সমাজে যে-সব বিষয় নিয়ে 'সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয়' তার মধ্যে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের 'বাদানুবাদ' অন্যতম। 'সাধারণে' ও বাদানুবাদ' কথা দুটি লক্ষণীয়। আলোচনা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তখন যে বহু মত ও বহু দল সৃষ্টি করেছিল, তা 'বাদানুবাদ' কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সমাজসংস্কারের বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্র করে এইসব গোষ্ঠী প্রধানত দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদল ছিল সংস্কারপন্থী, আর একদল ছিল সংস্কার-বিরোধী। এই দুই প্রধান দলের মধ্যবর্তী আরও অনেক দল-উপদল ছিল এবং সংস্কারের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁরা চরমপন্থী ছিলেন না। ইয়ংবেঙ্গল ও ধর্মসভা সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে কতকটা চরমপন্থী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে এবং ব্রাহ্মসমাজ দল নরম-চরমের মাঝামাঝি 'উদারপন্থী' ছিলেন। সংস্কার তাঁদের কাম্য ছিল, কিন্তু তার জন্য ত্যাগস্বীকার করার মতন সৎসাহস তাঁদের অনেকের ছিল না। তাঁরা সাধারণত ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করতেন, পাছে ধর্মান্ধ সমাজের কানে সেই আলোচনা প্রবেশ করে, এই ভয়ে। সংস্কারের পক্ষে ইয়ংবেঙ্গল দল সবচেয়ে বেশী মুখর আন্দোলন করেছিলেন, এবং তার জন্য নির্ভীক আত্মোৎসর্গের সংকল্পও তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী। বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রশ্নটিকে উনিশ শতকের তিরিশে ও চল্লিশে প্রধানত তাঁরাই তখনকার সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তীব্র বাদানুবাদের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কার্ল ম্যানহাইমের পূর্বোদ্ধৃত ভাষায় বলা যায়, সমাজের সামূহিক পরিবেশের (collective situation) নির্দিষ্ট রূপান্তর তখন আরম্ভ হয়েছিল, এবং তার প্রবল গতি ছিল সমাজসংস্কারের দিকে। এই রূপান্তরিত পরিবেশে বিধবাবিবাহ-সমস্যা বেশ বৃহৎ আকারেই দেখা দিয়েছিল। চল্লিশের পর পঞ্চাশে এই সামূহিক সমাজসংস্কার-চেতনা বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে হঠাৎ একদিনে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়নি।

১৭৭৬ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা', এই শিরোনামে একটি

দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই নামে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, এবং এই বছর অক্টোবর মাসে তিনি বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারত-সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান। তার আগেই দেখা যায়, পূর্বের বাদানুবাদ ও আন্দোলনের ফলে, সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে বিধবাবিবাহের প্রত্যক্ষ চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে' লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিষয়ী লোক দলবদ্ধ হয়ে একটি বিধবাবিবাহ দেবার জন্য উদ্‌যোগী হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পটলডাঙ্গানিবাসী শ্যামাচরণ দাস কর্মকার তাঁর নিজের বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেবার জন্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে একটি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাপত্রে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি তখনকার বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিতেরা স্বাক্ষর করেছিলেন। পরে এই পণ্ডিতেরাই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন।[১০] বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের আগে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করান। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :[১১]

> বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত, তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্বজনহিত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু দেশাচার ভয়ে, জনসমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে, বা তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রধান ভয় এই হইল যে, তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করিলে, সাধারণে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রহিত করিবেন। কেহ কেহ কহিলেন, 'যদি আমাদিগকে অন্যের দ্বারে যাইতে না হয়, জীবিকা-নির্ব্বাহের এরূপ সংস্থান করিয়া দিতে পারেন, তবে মুক্তকণ্ঠে আমাদিগের মত প্রচারিত করিতে পারি।'

শ্রীশচন্দ্র এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি, এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি অবশ্য খুব তৎপরও ছিলেন না। এই সময় বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে কৃষ্ণনগর-বারাসত অঞ্চলের তরুণ সম্প্রদায় সভাসমিতি স্থাপন করে বিধবাবিবাহের আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এদিকে প্রায় এই সময়, 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় 'বিধবার বিবাহ' নামে একখানি কৌতূহলোদ্দীপক চিঠি প্রকাশিত হয়:[১২]

> সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রে কেরাণীবাবুর পলায়ন এবং বিধবা-বিবাহ করণের যে সংবাদ প্রকটিত হইয়াছিল, এইক্ষণে অবগত হইলাম তাহা যথার্থ বটে, ঐ বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ হইয়াছে, গন্ধর্ব্ব মতে কি অন্য প্রকার তাহা জানিতে পারি নাই, জ্ঞাত হইতে পারিলে বিস্তারিত লিখিয়া পাঠাইব, ইহাকে এক প্রকার নূতন শাস্ত্র-সম্মত নূতন মত বলিতে হইবেক। কারণ এই চৈতন্যচরিতামৃত পুরাতন চৈতন্যচরিতামৃতকে পরাজয় করিয়াছে।
>
> পদ্য।
>
> শ্রুতমাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ।
> বিধবার খালিরূম, হইল ফিলাপ্॥
> ভালধার্য্য, সুখরাজ্য, কার্য্য বটে পাকা।
> কেরাণীর কর্ম্ম নয়, রূম খালি রাখা॥
>
> ধামধুম, টামটুম, অন্ধকারে আলো।
> হুম্ কোরে উম্ পেয়ে, ঘুম হবে ভালো॥
>
> জয় জয় কালধর্ম্ম আর কারে ভয়।
> কাঁকুমন্ত্রে মাকুদেবী হোলেন সদয়॥

এই সব ১৮৫১-৫২ সালের ঘটনা। বিধবাবিবাহের বাদানুবাদ যে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা এই ঘটনাস্রোত থেকে অনুমান করা যায়। বাদানু-বাদের স্তর থেকে আন্দোলন ক্রমে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার স্তরে পৌঁছবার উপক্রম

করছিল। ঠিক এই সময় এমন একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির হাল ধরার প্রয়োজন ছিল, যিনি পরিচালকহীন বিশৃঙ্খল আন্দোলনের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারেন। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে সমাজের সমষ্টিচেতনাকে এইভাবে যাঁরা যুগ-নির্দেশিত পথে পরিচালিত করেন, তাঁদেরই আমরা সমাজনেতা, সমাজসংস্কারক ও যুগপ্রবর্তক বলি। এই সংজ্ঞানুসারেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা বিধবাবিবাহের প্রবর্তক ও সমাজসংস্কারক বলতে পারি।

১৭৭৬ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে 'তত্ত্বোধিনী পত্রিকায়' বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৫, জানুয়ারি মাসে। পুস্তিকার নাম 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।' পুস্তিকার প্রারম্ভে তিনি লেখেন :[১৩]

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক যে এদেশে বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবেক। কিন্তু বিধবাবিবাহ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব অগ্রে ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিবন্ধ করা অতি আবশ্যক। কিন্তু যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম এই বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক।

এদেশের লোক যে কর্তব্য ও অকর্তব্য কর্ম শাস্ত্রবচন অনুযায়ী নির্ধারণ করেন, যুক্তি বুদ্ধি বিবেক ও বিচার-বিবেচনার সাহায্যে বিশেষ কিছু করেন না, একথা প্রথমেই বিদ্যাসাগর পরিষ্কার করে বলেছেন। সুতরাং কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভর করে বিধবাবিবাহ সঙ্গত কি অসঙ্গত তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলে, তাতে যে বিশেষ কোন ফল হবে না তা বিদ্যাসাগর বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্য এদেশের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের অতল সমুদ্র মন্থন করে তাঁকে যুক্তিপূর্ণ 'বচন' সন্ধান করতে হয়েছিল, এবং সেই সব শাস্ত্রবচনের উপকরণ দিয়ে তাঁকে নবযুগের বাংলার নবজাগৃতির 'মানবমুখী যুক্তিবাদের' (Humanist Rationalism) ভিত নতুন করে গড়তে হয়েছিল। এই দিক দিয়ে তিনি রেনেসাঁসযুগের 'টিপিকাল হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতেরও কর্তব্য পালন করেছিলেন। তাঁর পূর্বে এই কর্তব্য প্রথম পালন করেছিলেন রামমোহন রায়, সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনের সময় ক্লাসিকাল বিদ্যার অগাধ সমুদ্র মন্থন করে, তার লুপ্ত মণিরত্ন আহরণ করে। নবযুগের মানব-প্রধান জীবনাদর্শের ভিত গঠনের জন্য সেগুলি প্রয়োগ করতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতন উনিশ শতকে আর কেউ এত নিষ্ঠা ও সৎসাহসের পরিচয় দেননি। যাঁদের নিষ্ঠা ছিল তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল না, এবং যাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের নিষ্ঠা ছিল না। কালোপযোগী পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ নিষ্ঠা, এই দুয়ের শুভমিলন বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যেমন ঘটেছিল, ঠিক সেরকম তাঁর সমসাময়িক আর কোন ব্যক্তির চরিত্রে ঘটেনি।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের পুস্তকখানি প্রকাশিত হবার পর সমাজের সর্বস্তরে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন:[১৪] "বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয়, আবার তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া, পুনর্ব্বার দশ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। ঐ পুস্তক এরূপ আগ্রহ সহকারে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। কি বিষয়ী,

কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছিলেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অগ্রজের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া, উত্তর-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, ঐ উত্তর-পুস্তকগুলি দেখিয়া, শাস্ত্রজলধি-মন্থন-পূর্ব্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক প্রত্যুত্তর পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া, একত্র সংগ্রহ করিয়া, দ্বিতীয় পুস্তক মুদ্রিত করেন।"

পুস্তক বিক্রির যে হিসেব শম্ভুচন্দ্র দিয়েছেন তা অতিরঞ্জিত হওয়ার কথা নয়, কারণ তিনি যে শুধু বিদ্যাসাগরের সহোদর ছিলেন তা নয়, তাঁর কর্ম্মজীবনের একজন নিত্য-সহযোগীও ছিলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ১৫,০০০ পুস্তিকা বিক্রি হবার কথা একশ বছর পরে আজকের দিনেও কল্পনা করা যায় না। পুস্তিকার প্রচারসংখ্যা দেখে বোঝা যায়, বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রসম্মত যুক্তিবিন্যাস সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' যে-সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক; চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা) বিদ্যাসাগরের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরবর্তী সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয় :*

> কয়েক বৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃ সংস্কার প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারম্বার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোন বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্ব্বমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, ইদানীং ঐ বিষয়ই সর্ব্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বিধবা-বিবাহের নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতি বিবর্ণ, কীট নিষ্কুশিত,

* পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত বলে মনে হয়।

পুরাতন জীর্ণ পুস্তক প্রভৃতি অশেষ গ্রন্থ উদ্‌ঘাটন ও পর্য্যালোচন করিতেছেন, কুসংস্কার-পরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের···পণ্ডিতবর্গকে পারিতোষিক প্রদানের আশ্বাস দিয়া বিদ্যাসাগর-প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন, কি ইংরেজি কি বাঙ্গলা, এতদ্দেশীয় সমুদায় সংবাদপত্রই ঐ বিষয়ের কল্পনায়, ঐ বিষয়ের অলোচনায়, ও ঐ বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ ঐ বিষয়ে সপক্ষ হইয়া উহার সংসাধনার্থ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ শাস্ত্র ও যুক্তি এই উভয়ের কিছুই অবলম্বন না করিয়া চিরাবলম্বিত কুসংস্কারবশতঃ বিষয় বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছে। কেহ কেহ ঐ বিষয় প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন, কিন্তু দলপতির ক্রোধাশঙ্কায় অথবা লোকানুরাগের ব্যতিক্রম ভয়ে, বাক্যস্ফুট করিতে সমর্থ হন না।···উল্লিখিত পুস্তকে বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে। আজ যাঁহারা নিরপেক্ষ যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিবেন, বিধবাবিবাহ এই দণ্ডেই প্রচলিত করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর, সমাজের সর্বস্তরে যে কি বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র এই আলোচনা থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "সমুদায় সংবাদপত্রই ঐ বিষয়ের জল্পনায়, ঐ বিষয়ের আলোচনায়, ও ঐ বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।" সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে এখানে আমরা এই আলোচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

'সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রিকা এই সময় কবিতাকারে বাদানুবাদের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন :[১৫]

॥ বিধবাবিবাহ ॥

শুন ২ বিধবারা শুভ সমাচার।
বিধবাবিবাহ হবে রবে (?) সমাচার ॥
হইয়াছে যত গ্রন্থ বিবাহ বিপক্ষে।
তিষ্ঠীতে না পারিবেক সাগর সমক্ষে ॥
দ্বিতীয় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর সন্ধান।
কেহ না জানেন কিছু তাহার সন্ধান ॥
করিয়াছিলেন বাধা বহু ভট্টাচার্য্য।
সমুদ্র তরঙ্গ তাহে না হয় নির্বার্য্য ॥
তর্কেতে উঠিয়াছে যতেক আপত্তি।
ঈশ্বর স্বতর্কে তার হইল বিপত্তি ॥
দ্বিতীয় পুস্তক যাহা সাগর হইতে।
উঠিয়াছে সুপ্রমাণ রত্নাদি সহিতে ॥
সে সব প্রমাণরত্ন যত্নে করি হার।
বিবাহ সময়ে দিব গলে বিধবার ॥
সাজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল।
তোমাদের সৌভাগ্যে ঈশ্বর সানুকূল ॥
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া গোঁড়া অবতার।
চলিতে না পারিবেন বক্র পথে আর ॥
নিবারণ করিবেন কি প্রমাণ দিয়া।
টানাটানী পড়িবেক নবদ্বীপ নিয়া ॥
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন পাইবেন মান।
করিতে হইবে তাঁকে মূল সূত্র গান ॥
শাস্ত্রীয় বিচারাসরে যাত্রা হবে ভারি।
হইবেন ব্রজনাথ নিজে অধিকারী ॥
শ্রীভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন যুড়ীদার।
হইবেন ডাহিনের মৃদঙ্গী দোহার ॥

বাম দিকে কাশীনাথ বাজাবেন গাল।
ধরিবেন তালে ২ মৃদঙ্গের তাল ॥
পৃষ্ঠভাগে রামতনু আদি অধ্যাপক।
তালে মানে গাহিবেন পুরাতন লোক ॥
শ্রীপদ্মলোচন যিনি দিয়াছেন বাধা।
সম্মুখে প্রধান সখী সাজিবেন রাধা ॥
আর যত অধ্যাপক বিপক্ষীয় শাখা।
সাজিবেন তাঁরা সব ললিতা বিশাখা ॥
ধনিদের বাড়ী ২ এই যাত্রা হবে।
বিধবাবিবাহ যাত্রা চিরখ্যাত রবে ॥
প্রথমতঃ অধিকারী তুলিবেন তান।
হবেন ২ বিয়া নিষিদ্ধ প্রমাণ ॥
তার পরে সখীগণ গাইবেন স্বরে।
মীমাংসায় তাল মান রহিবেনা পরে ॥
প্রথমে দিবেন বটে ধনিগণে পেলা।
সাগরে ডুবিয়া যাবে সব লীলা খেলা ॥
আমরা বলিয়া রাখি বিধবারা সবে।
শঙ্খ শাড়ী পরিয়া প্রস্তুতভাবে রবে ॥
পড়িবেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র।
খাটিবেনা আর কারু তাল মান যন্ত্র ॥
যাত্রা দিলে লোক পূর্ণ হবে রাজপুর।
সভাপতি হইবেন রাজা বাহাদুর ॥
বামদিগে বসিবেন বাবু রত্নরায়।
পেলা দিতে বলিবেন গঙ্গ উপাধ্যায় ॥
এবারে হবেনা পেলা রত্নশিরে শাল।
প্রথমের শাল পেলা হইয়াছে শাল ॥
আমরা ধুম্বুল দিতে রহিলাম সেজে।
ধন্যবাদ দিতে হবে সাগর সমাজে ॥

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর দেশের গোঁড়া পণ্ডিত-গোষ্ঠী তীব্র প্রতিবাদ করে কয়েকখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। প্রতিবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, হারাধন কবিরাজ, রামদয়াল তর্করত্ন ও রামধন বিদ্যাবাগীশ। 'সমাচার সুধাবর্ষণের' কবিতার মধ্যে এঁদেরই কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই পণ্ডিতদের বিধবা-বিবাহবিরোধী মতামত খণ্ডন করার জন্য ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগর, পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ, এ বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। এই দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হবার পর স্বভাবতঃই বাদানুবাদ আরও তীব্র হয় এবং তখনকার সামাজিক আবহাওয়া সরগরম হয়ে ওঠে। এই সময় ছড়া গান কবিতার মধ্য দিয়ে হাস্য-কৌতুক-বিদ্রূপের বন্যা বয়ে যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পত্রাকারে লেখা হয় :[১৬]

> হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শতহস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সৎযুক্তি সকল সঙ্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবি ও বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নাম্নী একটি বিধবা বলিলেন…প্রতিদিনই কপালে করাঘাতচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ওহে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি ; কিন্তু বোন পাকাটা, মাথাচাঁচা পোড়াকপালে ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি আটকুড়োরা যা পেছু ডাকিতেছে বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিণী বলিলেন না বোন ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে ; তাহারদিগের শরীর দেখিলেই

বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয় পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পাকাটা মাথাচাঁচা গায়ে কতকগুলা গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, গোঁসাঞিদের বা কি ঢং! ঠিক যেন অক্রূর দত্তের রাসের সং···

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে নানারকম ছন্দে কবিতা ও ছড়া রচনা করেছিলেন। তার দু'-একটির অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

(মেয়েলী ছন্দ)

এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো
কবে হবে বল।
এতদিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো
বিপক্ষের বল॥
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো,
এত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্ম্মের ফল, দিদী অধর্ম্মের ফল লো,
অধর্ম্মের ফল॥
বিবাদি হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো
যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো
সব যাবে তল॥

আর একটি কবিতা:

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী, করে কত রব।
ছেলে বুড়ী আদি করি, মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখা পরে, কেহ থাকে মূলে।
করেছি প্রমাণ জড়ো, পাঁজি পুঁথি খুলে॥

এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখে নাক গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি, ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি, কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে॥

এই সময় কবি দাশরথি রায় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত পালাগান রচনা করেন। এই পালার মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর যে সশ্রদ্ধ কটাক্ষ আছে তা উপভোগ্য। পালাটি বড় বলে তার কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

বিধবা-বিবাহ কথা
কলির প্রধান স্থান কলিকাতা
নগরে উঠেছে অতি রব
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ
ক্রমে দেখছি বলবান
হবার কথা হয়ে উঠিছে সব।
ক্ষীরপাই নগরে ধাম
ধন্য গণ্য গুণধাম
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক
তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালীর
তাতে আবার কোম্পানীর
হিন্দু কালেজের অধ্যাপক।
বিবাহ দিতে ত্বরায়
হাকিমের হয়েছে রায়
আগে কেউ টের পায়নি সেটা
তারা কল্লে অর্ডর
যেতে কারে অর্ডর
চটিকে বুদ্ধি আটিকে রাখিবে কেটা।...

হিন্দুধর্ম্মে যারা রত
প্রমাণ দিয়ে নানা মত
হবে না বলে করিতেছেন উক্ত
ইহাদের যে উত্তর
টিকিবে নাকো উত্তর
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত।
ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা।

॥ রাগিণী সিন্ধুভৈরবী তাল আড়া ॥

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।
রাজ-আজ্ঞায় দূতে আসি কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি
তা বলে দূতে কখন দূষী হয় না সেই পাপে।
কি আর ভাব সকলেতে হবে যেতে জেতে হতে
জেতের অভিমান সাগরে দাও সঁপে।
এক ধর্ম প্রায় আগত ভারত আদি পুরাণ মত
ভারতে চলিবে না কোন রূপে।
যখন করেছে এ ভারত অধিকার ইংরাজ ভূপে ॥…

॥ রাগিণী টোরী তাল একতালা ॥

বিবাহ করিতে দিদি
আছে বিধবাদের বিধি
মরুক দেশের পোড়াকপালে
সকলে
কথা ছাপিয়ে রাখে হয়ে বাদী।

আমাদিগে দিতে নাগর
এলেন গুণের সাগর
বিদ্যাসাগর
বিধবা পার কত্তে তরির গুণ ধরেছেন গুণনিধি।···

এই ধরনের ছড়া গান কবিতা দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হত। বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে যে কত রকমের ছড়া ও গান রচিত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এই ছড়া ও গানগুলি যদি কেউ সংগ্রহ করে রাখতেন, তা হলে সেগুলি যে কেবল লোকসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হত তাই নয়, সামাজিক ইতিহাসেরও অমূল্য উপকরণ হয়ে থাকত। গ্রামের গাড়োয়ানরা গাড়ী হাঁকাতে হাঁকাতে, কৃষকরা লাঙ্গল চালাতে চালাতে, মাঝিরা নৌকা বাইতে বাইতে, কুমোরেরা চাক ঘুরাতে ঘুরাতে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে, এই সব গান গাইত। শান্তিপুরের তাঁতিরা 'বিদ্যাসাগর-পেড়ে' নামে একরকমের শাড়ীও এই সময় বার করেছিল। তার পাড়ে এই গানটি লেখা ছিল :

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় লয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই ;
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক লাজ ভয়ে।

বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন যে শান্তিপুরের তাঁতিদের এই কাপড় অনেকে বেশী দাম দিয়ে কিনতেন। অনেকে কলকাতা শহরে আসতেন

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বচক্ষে দেখবার জন্য। "যখন তিনি পদব্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক একদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিত। কারণ, এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগিনী বিধবা স্ত্রীলোকদের প্রতি কেহ কখন বিদ্যাসাগরের মত দয়া প্রকাশ করেন নাই।" সমসাময়িক এই সব প্রমাণাদি থেকে বোঝা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচার তাদের বোধগম্য হত না, কিন্তু এই সংস্কার-আন্দোলনের মানবিক দিকটা তাদের অভিভূত না করে পারেনি। তাই ছড়া গান ইত্যাদি স্বতোৎসারিত লোকসাহিত্যের ধারার মধ্যে, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিদ্রূপ-কটাক্ষ রঙ্গ-রসিকতার সঙ্গে অন্তঃশীলার মতন বিদ্যাসাগরের প্রতি সাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির আর-একটি ধারাও প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে॥" পরাশর-সংহিতার এই শ্লোকের অর্থ হল: স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তা হলে এই পঞ্চপ্রকার আপদে নারীর অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়। পণ্ডিতদের মধ্যে অবশ্য এই অর্থ নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছে। বিরোধী পক্ষের পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, এখানে বিবাহিত পতির কথা বলা হয়নি, ভাবী পতির কথা বলা হয়েছে, এবং শ্লোকের অর্থ হচ্ছে, বাগ্‌দত্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেই হবে; তবে ঐ বাগ্‌দত্ত পতির পঞ্চপ্রকার আপদে, ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'দ্বিতীয় পুস্তকে' বিরোধী পক্ষের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা ও টীকা পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন। তিনি যে-সব বিষয় শাস্ত্রানুমোদিত বলে প্রমাণ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান হল এইগুলি:

(ক) পরাশর-বচনের বিষয় বাগ্‌দত্ত সম্পর্কে নয়, বিবাহিত সম্পর্কে। (খ) পরাশরের বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নয়। (গ) পরাশরের বচন বিবাহ-বিধায়ক, বিবাহ-নিষেধক নয়। (ঘ) বৃহৎ পরাশর-সংহিতা বিধবাবিবাহের নিষেধক নয়। (ঙ) পরাশর-সংহিতাতে পতিত ভার্যা ত্যাগ নিষেধ বা পতিত পতির প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নেই। (চ) বাগ্‌দানের পর

বর নিরুদ্দেশ হলে কন্যার পুনর্দান নিষেধ নেই। (ছ) পরাশরের বিবাহবিধি নীচজাতি বিষয়ে নয়। (জ) বিধবা কন্যাকে পিতা পুনরায় দান করতে পারেন। (ঝ) বিধবার বিবাহকালে পিতার গোত্র উল্লেখ করে দান করতে হবে। (ঞ) প্রথম বিবাহের যা মন্ত্র, দ্বিতীয় বারেরও সেই একই মন্ত্র। (ট) দেশাচার শাস্ত্র অপেক্ষা বেশী মান্য নয়!

শাস্ত্রবচনের এইসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের সাধারণ লোক তার মর্ম বুঝত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন যে এদেশের অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞ নন, সুতরাং শাস্ত্রীয় বিষয় নিয়ে দুই-পক্ষে বিচার আরম্ভ হলে, উভয়পক্ষের প্রমাণ-প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করে, তথ্যাতথ্য নির্ণয়ে তাঁরা সমর্থ নন। যখন যে-রকম ব্যাখ্যা তাঁরা শোনেন, তখন সেই ব্যাখ্যাকেই তাঁরা সত্য বলে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "প্রথমতঃ, অনেকেই আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পরে কয়েকটি আপত্তি দর্শন করিয়াই, ঐ বিষয়কে একবারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াও স্থির করিয়াছেন।" তাছাড়া, সমালোচনার মধ্যে যিনি যত বেশী উপহাস ও কটূক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তাঁর লেখা তত বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। একথাও বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে "এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত ছিলাম না।" সাধারণ লোকের কটূক্তি ও উপহাসের প্রতি এই অনুরাগ দেখেই হয়ত বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে ছদ্মনামে 'ব্রজবিলাস' 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি ব্যঙ্গরচনা লিখেছিলেন। শাস্ত্রবচন দিয়ে বিরোধীপক্ষের মতামত খণ্ডন করলেও, বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকার শেষে দেশবাসীর কাছে বিধবাবিবাহের জন্য কাতরভাবে মানবিক আবেদনই করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন:

> হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের

ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।…অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষেরও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা, দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।

সমাজসংস্কারের জন্য এই মানবিক আবেদন সামাজিক ইতিহাসের এক নতুন বস্তু। মধ্যযুগের ইতিহাসে সমাজসংস্কারকরা এই মানবচিন্তাকে

সাধারণত আধ্যাত্মিক চিন্তার আবরণ দিয়ে প্রকাশ করতেন। তাঁদেরও মানবতাবোধ গভীর ছিল, কিন্তু অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে তা এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল যে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যেত না। যুক্তি, বুদ্ধি ও মানবিক অনুভূতি সবই ছিল, কিন্তু ধর্মচিন্তার মোটা রঙিন আস্তরণ দিয়ে সব ঢাকা থাকত। জেকব বুর্খার্ট তাঁর *The Civilization of the Renaissance in Italy* গ্রন্থে বলেছেন: "In the Middle Ages both sides of human consciousness—that which was turned within as that which was turned without lay dreaming or half-wake beneath a common veil. The veil was woven of faith, illusion, and childish prepossession, through which the world and history were seen clad in strange hues." চিন্তার মূলকেন্দ্র ছিল ধর্ম, এবং তার শাখা-প্রশাখা ছিল মানুষ ও সমাজ। নবযুগের নতুন চিন্তার মূলকেন্দ্র হল মানুষ, ধর্ম মানুষেরই জীবনের শাখা হল। নবযুগের সংস্কারকরা মানুষ ও সমাজকে ইঙ্গিত করে সংস্কারকর্মে অগ্রসর হলেন। যুক্তি (Reason), বুদ্ধি (Intellect) ও মানবপ্রধান চিন্তা (Humanism) তাঁদের সমাজসংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হল, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তার প্রভাব বিস্তার করার জন্য তাঁদেরও প্রাচীন শাস্ত্রের 'authority' প্রয়োজন হয়েছিল। বিশুদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সাধারণ মানুষ তখনও মানবমুখী চিন্তায় অভ্যস্ত হয়নি। তখনও শাস্ত্রীয় দোহাই দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষকে যুক্তিবুদ্ধিনির্ভর করা আবশ্যক ছিল। জর্মান সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিন তাঁর ইটালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস-গ্রন্থে বলেছেন:[১৭] "...as yet they needed a firm foundation which might be used with 'authority'. This function was fulfilled by Classical Antiquity. It is always the way of secular authority to base its claims upon the past, and the further back these claims go, the greater the authority." এই 'authority'র জন্যই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতন নবযুগের সংস্কারকেরা যুক্তিবাদী হয়েও প্রাচীন শাস্ত্র পুনরনুসন্ধান করে সেকালের

মুনি-ঋষিদের কালোপযোগী বচন নিজেদের যুক্তির সমর্থনে প্রয়োগ করেছিলেন।

কিন্তু শাস্ত্রীয় বচন ছাড়াও, যুক্তিনির্ভর মানবিক আবেদন করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। রামমোহন তাঁর 'সহমরণ' বিষয়ের পুস্তিকার মধ্যে শাস্ত্রীয় উক্তি ও যুক্তির এই যুক্তপন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। শাস্ত্রচিন্তার মধ্যেও তাঁর মানবচিন্তার সুরটি সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বিধবাবিবাহ' সম্বন্ধে পুস্তিকা দুটির মধ্যে এই একই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। কেবল প্রতিবাদীর যুক্তি খণ্ডন করার জন্য নয়, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর নিজের যুক্তির আবেদন গভীরতর করার জন্য, তিনি সেকালের শাস্ত্রকারদের বচনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরও আবেদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ ও সামাজিক মানুষ। তাই শাস্ত্রবিচারের কঠোর কর্তব্য পালন করেও, শেষকালে তিনি দেশ ও দেশবাসীকে আহ্বান করে তাঁর আবেদন জানিয়েছেন। শাস্ত্রের বচন থেকে সমাজের মানুষের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। প্রতিপাদ্যের উপসংহারে প্রথমে শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেই তিনি বলেছেন, "হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে!" তারপর দেশের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য!" তারপর দেশের মানুষকে আহ্বান করে বলেছেন, "হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে।" তারপর মানুষের মধ্যেও বিশেষভাবে পুরুষজাতিকে আহ্বান করে বলেছেন, "হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়, অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।" অবশেষে "হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না"—এই কথা বলে তাঁর সমস্ত যুক্তিতর্ক ও আবেদন একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। আবেদনের এই ধারাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, হৃদয়াবেগকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে কিভাবে বিদ্যাসাগর ধীরে ধীরে তাকে তাঁর আসল লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেছেন, এবং

নীরস শাস্ত্র থেকে জীবন্ত মানুষের দিকে ধাপে ধাপে যেমন তিনি নেমে এসেছেন, তেমনি তাঁর আবেদনের ভিতরের মানবিক সুরটি ক্রমেই আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। প্রচারকলার এরকম নিদর্শন মধ্যযুগের সমাজে ও সাহিত্যে দুর্লভ।

শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে বিধবাবিবাহের চূড়ান্ত মীমাংসা হত না, বাদীপ্রতিবাদীর পাণ্ডিত্যের নিষ্ফল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অল্পকালের মধ্যেই তার সমস্ত উত্তেজনা নিঃশেষ হয়ে যেত। একথা বিদ্যাসাগর জানতেন, কারণ তিনি কেবল বিদ্বান পণ্ডিত ছিলেন না, একজন উদ্‌যোগী সমাজকর্মীও ছিলেন। অ্যাকাডেমিক শাস্ত্রীয় আলোচনার স্তর থেকে তাই তিনি বিধবা-বিবাহ বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়াশীল স্তরে আনতে চেয়েছিলেন। তার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল বিধবাবিবাহকে বিধিসম্মত করা, কারণ শাস্ত্রসম্মত বলে তা প্রমাণিত হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনের সমর্থন ভিন্ন তা যে কোনদিনই কার্যকর করা সম্ভব হবে না, বাস্তব সমাজবোধ থেকে বিদ্যাসাগর তা বুঝেছিলেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে সমাজে হঠাৎ কোন নতুন প্রথা প্রচলিত করা যায় না। 'হঠাৎ' করা যায় না বটে, কিন্তু কালোপযোগী হলে করা যায়। এই কালোপযোগিতা বিচারের ঐতিহাসিক মানদণ্ড হল, সমাজের মধ্যে সেই নতুন প্রথার জন্য নতুন সঞ্চারিত লোকচেতনা। এই লোকচেতনাও প্রথমে ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় না। সামাজিক অগ্রগতি সম্বন্ধে সজাগ মুষ্টিমেয় একদল মানুষের মধ্যে প্রথমে তার প্রকাশ হয়, তারপর ধীরে ধীরে সেই সংকীর্ণ কেন্দ্র থেকে সমগ্র সমাজমানসে চেতনার সঞ্চার হতে থাকে। তার জন্য সংগ্রামের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার দরকার হয়। এই হাতিয়ারই হল 'রাষ্ট্রীয় আইন'।

সুতরাং বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন। তাই একদিকে যখন তিনি প্রাচীন শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে তাঁর যুক্তির সমর্থনে শাস্ত্রোক্তি অনুসন্ধান

করছিলেন, অন্যদিকে তখন বিধবাবিবাহ আইন পাশের জন্য একটি আবেদন-পত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহের সংগ্রামেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজকাল আমরা কোন আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে এই স্বাক্ষর-সংগ্রহ করাকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি বড় কৌশল বলে মনে করি। আজ থেকে একশ বছর আগে বিদ্যাসাগর এই গণতান্ত্রিক রীতিতেই তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। সমাজের নানাশ্রেণীর ও নানাস্তরের প্রায় এক হাজার লোকের (৯৮৭ জন) স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র, ১৮৫৫, ৪ অক্টোবর তারিখে তিনি ভারত-সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। আবেদনপত্রের সংলগ্ন চিঠিখানি এই:

To

W. Morgan, Esquire,
Clerk to the Honorable the
Legislative Council of India

Sir,

On behalf of the petitioners, I have the honor to forward herewith the petition of certain Hindoo Inhabitants of the province of Bengal which I beg to request you will do me the favour to lay before the Honorable Council at their next sitting.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient Servent
Sd/-Eshwur Chandra Sharma

Calcutta
Sanscrit College,
the 4th October, 1855

আবেদনপত্রে বিষয়টি এইভাবে পেশ করা হয়:

বাংলাদেশের নিম্নস্বাক্ষরকারী হিন্দুদের নিবেদন এই যে:

বহুদিন থেকে প্রচলিত দেশাচার অনুসারে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

আবেদনকারীদের মত এবং দৃঢ়বিশ্বাস এই যে এই দেশাচার শাস্ত্রসঙ্গত নয়। এই নীতিবিরুদ্ধ দেশাচার নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক, এবং সমাজের বহু অকল্যাণের কারণ। হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। অনেক হিন্দুকন্যা চলতে ও কথা বলতে শেখবার আগেই বিধবা হয়। এতে সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়।

আবেদনকারীরা ও অন্যান্য হিন্দুরা বিধবাবিবাহকে বিবেকবিরুদ্ধ বলে মনে করেন না। সামাজিক অভ্যাসের জন্য অথবা ধর্মের কদর্থের জন্য, এই বিবাহপ্রথা প্রচলনে কোন বাধাবিঘ্ন হলে তাঁরা তা অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত আছেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও মহারানীর বিচারালয়ে বর্তমানে হিন্দু দায়ভাগের যে রকম ব্যাখ্যা করা হয় তাতে বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, এবং বিধবার বিবাহজাত সন্তান অবৈধ বলে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

যে হিন্দুরা বিধবাবিবাহকে বিবেকবিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করেন না, এবং ধর্মের ও সামাজিক কুসংস্কারের বাধা উপেক্ষা করেও যাঁরা বিধবাবিবাহ করতে প্রস্তুত, হিন্দু দায়ভাগের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা তাঁদের কর্তব্যের পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

আবেদনকারীরা মনে করেন, শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যার জন্য যে সামাজিক বাধা প্রবল আকার ধারণ করেছে, ব্যবস্থাপক সভার কর্তব্য তা অপসারণ করা।

বিধবাবিবাহের আইনঘটিত বাধা দূর করা বহুসংখ্যক নিষ্ঠাবান স্বধর্মপরায়ণ হিন্দুর একান্ত ইচ্ছা। যাঁরা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে মনে করেন, তার জন্য যাঁদের সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এবং যাঁরা সামাজিক মঙ্গলচিন্তার বশবর্তী হয়ে তার বিরুদ্ধতা করেন, বিধবাবিবাহের আইনঘটিত বাধা দূর হলে তাঁদের কোন ক্ষতি হবে না।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, অন্য কোন জাতির মধ্যে, বিধবাবিবাহ এরকম কোন আইনের বলে নিষিদ্ধ আছে বলে আমরা জানি না। এই প্রথা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ বলেও বোধ হয় না।

এইসব কারণে আবেদনকারীদের প্রার্থনা এই যে, ব্যবস্থাপক সভা যত শীঘ্র সম্ভব বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক আইন প্রণয়ন ও প্রচার করেন, যাতে হিন্দুদের বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকারের বাধা দূর হয় এবং বিবাহজাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ সন্তান বলে গৃহীত হয়।

১৮৫৫, ১৭ নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্য, সভার অন্যতম সদস্য গ্র্যাণ্ট সাহেব, বিধবাবিবাহ আইনের যে পাণ্ডুলিপি খসড়া করেন তার মর্ম এই : "সকলে অবগত আছেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে ভারতের দেওয়ানী আদালতগুলিতে যে আইন প্রচলিত আছে, সে আইন অনুসারে, দুই-এক স্থান ব্যতিরেকে, হিন্দু বিধবারা একবার বিবাহ হয়েছে বলে দ্বিতীয়বার আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ করতে পারেন না। যদি তাঁরা বিবাহ করেন তাহলে তাঁদের বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি বৈধ বলে গণ্য হয় না। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, এই প্রথা দেশাচারসম্মত হলেও, শাস্ত্রসঙ্গত নয়। তাঁদের ইচ্ছা এই যে বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় যদি কোন হিন্দু এরকম বিধবাবিবাহ করেন বা দেন, তাহলে আদালতপ্রচলিত আইন যেন তার বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এই বাধার জন্য যে সব হিন্দু অসুবিধা ভোগ করছেন, তাঁদের সে অসুবিধা দূর করা উচিত। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে প্রচলিত আইনের এ বাধা দূর হলেও হিন্দুদের মধ্যে সুনীতির প্রসার হবে এবং তাঁদের সামাজিক কল্যাণের পথও প্রশস্ত হবে। সেইজন্য আইন করা হচ্ছে যে—

"১। মৃতভর্তৃকা হিন্দু কন্যা, কিংবা যার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে, অথচ সেই বাগদত্ত ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে বিবাহ হয়নি, এমন কোন হিন্দু কন্যা যদি পুনর্বার বিবাহ করেন, তাহলে সেই বিবাহ বে-আইনী বলে গণ্য হবে না, এবং সেই বিবাহজাত সন্তানাদিকে অবৈধ বলে মনে করা হবে না।

"২। মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে, অথবা খোরাক-পোষাকসূত্রে যে-কোন দাবী-দাওয়া, তা দ্বিতীয়বার বিবাহে বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই কন্যা প্রথম স্বামীর দিক থেকে মৃত বলে গণ্য হবেন। তাঁর মৃত স্বামীর অবর্তমানে যে ন্যায্য উত্তরাধিকারী হবে, সেই ঐ স্বামীর বিষয়-সম্পত্তির

মালিক হবে। কিন্তু এও আইন করা হচ্ছে যে, স্বামী ভিন্ন অন্য উত্তরাধিকার-সূত্রে কোন বিধবার সম্পত্তির যে দাবী-দাওয়া অথবা স্ত্রীধনের দাবী-দাওয়া, অথবা স্বামীর জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর পর স্বোপার্জিত কোন বিষয়-সম্পত্তির দাবী-দাওয়া, পুনর্বিবাহ করলে অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

বিদ্যাসাগর যখন ভারত-সরকারের কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, এবং তার মাস দেড়েকের মধ্যে গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন আইনের খসড়াটি রচনা করে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন, তখন আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ঢেউ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব আবেদনপত্র ভারত-সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়, তার মধ্যে প্রধান এইগুলি :

পুনার অধিবাসীদের চিঠি, ৭ নবেম্বর ১৮৫৫
ভিঞ্চুরের মারাঠা অধিনায়কের চিঠি, ১২ জানুয়ারি ১৮৫৬
সেকান্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের চিঠি
উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের চিঠি
সাতারা, ধারওয়ার, বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট
প্রভৃতি অঞ্চলের চিঠি।

এইসব অঞ্চলের আবেদনপত্রের মধ্যে দেখা যায়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আবেদনের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু তাহলেও ভিঞ্চুরের মারাঠানায়ক এবং সেকান্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহের পক্ষে স্পষ্টভাষায় তাঁদের আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। ভিঞ্চুরের মারাঠানায়ক তাঁর আবেদনপত্রে লেখেন :

...It seems unnecessary for us to enter into details connected with the proposed Enactment. We merely wish to express our cordial approval of the principle on

which the proposal is based, and to solicit that the Legislature will remove any bar, which may exist in the eye of the Law, to the remarriage of the Hindoo Widows."

Vinchoor.
12th January 1856.

পুনার অধিবাসীরা ৪৬ জনের স্বাক্ষরসহ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি আবেদনপত্র পাঠান :

" We understand that there is a movement in Bengal headed by the enlightened portion of the Hindoo Community, which has for its object the removal of all legal objections to the remarriage of Hindoo widows. Such a laudable movement cannot but be seconded by those who take a real interest in the welfare of India. We are far from thinking that the removal of legal disabilities will be followed by the immediate abolition of a practice, which not only entails innumerable hardships and misery on hundreds and thousands of innocent but unfortunate females, but lies at the very bottom of many of the existing social evils, and too much of the crime which at present has to be deplored. That which bears the stamp of ancient custom can only be eradicated from the Hindoo mind by the steps which are being taken in every direction, to diffuse knowledge, to explore erroneous ideas, and thus undoubtedly to effect a gradual reformation in the state of Hindoo society...

সেকান্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও হিন্দু ভদ্রলোকরা বিধবাবিবাহের সমর্থনে যে আবেদনপত্র পাঠান, তাতে তাঁরা লেখেন :

> That we fully concurring in the spirit and letter of the Petition and Draft submitted by certain Hindoo Inhabitants of Bengal for legalising the marriage of Hindoo Widows, beg leave to submit a copy thereof, and to second this prayer.

বিধবাবিবাহের বিপক্ষেও এইসব অঞ্চল থেকে অনেক আবেদনপত্র এসেছিল। পক্ষের ও বিপক্ষের এই আবেদনপত্রগুলি জাতীয় মহাফেজখানায় বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত নথিপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে।[১৮] এগুলি পাঠ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কেবল বাংলাদেশে। নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন বলে মনে হয়।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে, প্রায় বাংলাদেশের মতনই, বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রবল সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে দাক্ষিণাত্য থেকে বহু আবেদনপত্র ভারত-সরকারের কাছে এসেছিল। বাংলাদেশের বাইরে এই আন্দোলনের প্রধান ঝটিকাকেন্দ্র ছিল দাক্ষিণাত্য। আবেদনপত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও, বাংলাদেশের পণ্ডিতদের মতন, দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ জনসমাজেও বাদী ও প্রতিবাদী দুই দলের সৃষ্টি হয়েছিল। বিধবাবিবাহের সমর্থনে লিখিত দাক্ষিণাত্যের দু-একটি আবেদনপত্রের কথা আগে উল্লেখ করেছি। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যে-সব আবেদনপত্র পাঠান তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই :[১৯]

> দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সময় শাসকরা দেশবাসীর কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য

> তাঁরা আমাদের হিন্দুধর্মের বহুকাল-প্রচলিত ধ্যানধারণায় ও আচার-বিচার-প্রথায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। আমাদের ধর্ম ও আমাদের সমাজ ভাল কি মন্দ তা আমরা বিচার করব, এবং কিছু সংস্কার করার প্রয়োজন হলে আমাদের সমাজের কর্ণধাররাই তা করবেন। সমাজসংস্কারের সঙ্গে যখন ধর্মসংস্কারও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তখন বিদেশী শাসকদের তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয়। হিন্দুসমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের জন্য ব্রিটিশ-সরকার যে আইন খসড়া করেছেন তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, প্রথাবিরুদ্ধ ও আচার-বিরুদ্ধ। কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের বলে এতকালের একটি প্রথাকে নির্মূল করা যায় না। আইনের বলে বলীয়ান হয়ে যাঁরা হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহ দিতে উৎসাহিত হবেন, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে পুনর্বিবাহিতা হলে বিধবারা স্বামীপুত্র লাভ করবেন বটে, কিন্তু চিরকালের মতন হিন্দুসমাজে সামাজিক মর্যাদা হারাবেন, এবং তাঁদের পুত্রকন্যারাও অবৈধতার অপমানের বোঝা অভিশপ্তের মতন সারাজীবন বহন করবে।

বাংলাদেশেও বাদী ও প্রতিবাদীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হতে থাকে। আইনের পাণ্ডুলিপিটি প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ, সিলেক্ট কমিটি, তৃতীয় পাঠ প্রভৃতি ধাপ অতিক্রম করে যত অগ্রসর হতে থাকে, আন্দোলনের তরঙ্গও তত উত্তাল হতে থাকে। ১৮৫৬, ১৯ জানুয়ারি আইনের পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটির কাছে অর্পণ করা হয়, এবং তার প্রথম পাঠ ও দ্বিতীয় পাঠও শেষ হয়ে যায়। এই সময় বাংলাদেশ থেকে বিধবাবিবাহের প্রতিবাদীরা সংঘবদ্ধ হয়ে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে, ৩৬,৭৬৩ জন লোকের স্বাক্ষরসহ, ভারত-সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন তখন রাজা রাধাকান্ত দেব। বিত্ত ও বিদ্যা দুয়েরই গৌরবের জন্য বাংলার হিন্দুসমাজে তাঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং প্রায় ৩৭ হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। ১৮৫৬, ১৭ মার্চ তিনি যে প্রতিবাদপত্র পাঠান, তার মর্ম এই :

ইংরেজদের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিধবাবিবাহ আইন খাপ খায়, কিন্তু আমাদের হিন্দুসমাজের রীতিনীতির সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নেই (প্যারা ১)।

এই আইন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও আচারবিরুদ্ধ। যজুর্বেদ, মনু, মহাভারত প্রভৃতি মহাগ্রন্থে কোথাও বিধবাবিবাহের সমর্থন নেই (প্যারা ৩)।

১৮৩৭ সালে ল' কমিশনের অনুসন্ধানের সময় দেখা গিয়েছিল যে ইংরেজ আইনজ্ঞরাও বিধবাবিবাহ এই কারণে সমর্থন করেননি। তারপর গত কুড়ি বছরের মধ্যে হিন্দুসমাজের অবস্থার এমন কোন পরিবর্তন হয়নি যে এর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য নতুন আইন পাশ করবার প্রয়োজন হল। আইন পাশ করে জনসমাজের ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ও মতামত পরিবর্তন করা যায় না, বরং জোর করে তা করতে গেলে তার ফল বিপরীত হয় (প্যারা ৪)।

রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় ৩৭ হাজার স্বাক্ষরকারীর এই প্রতিবাদপত্র ছাড়াও নদীয়া-ত্রিবেণী-ভাটপাড়া-বাঁশবেড়িয়া-কলকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদপত্র ভারত-সরকারের কাছে পাঠানো হয়। তার মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদের প্রতিবাদপত্রটি উল্লেখযোগ্য। এই পত্রখানির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :[২০]

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভট্টপল্লী বংশবাটী কলিকাতা প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ি পণ্ডিতদিগের বিহিত বিনয়পুরঃসর সমাবেদনমিদং। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্য সম্প্রদায়ের কতিপয় যুবক সহযোগে আপনকারদিগের সমীপে প্রার্থনা করাতে আপনারা হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক আইনের যে সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে মনোযোগ করিতে আজ্ঞা হউক।

প্রথমতঃ, হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ বেদস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ।… যে সকল ব্যক্তি বিধবাবিবাহ বৈধ বলিয়া এতদ্বিষয়ক আইন প্রচার প্রার্থনায় আপনাদিগের নিকটে আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মত এতদ্দেশীয় সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার ও টীকাকারদিগের মতের ও ব্যাখ্যার বিপরীত, যেহেতু বিধবাবিবাহ বিধায়ক বচন সকল বাগদত্তা কন্যার পুনর্বার বিবাহ অথবা যুগান্তর বিষয় বলিয়া সমুদায় সংগ্রহকার ও টীকাকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন।…

দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ এদেশের আচারবিরুদ্ধ। এই ভারতবর্ষের হিন্দুজাতীয় মানবমণ্ডলীর দেশবিশেষে ভিন্ন২ বিষয়ে ভিন্ন২ আচার ব্যবহার চলিত আছে এবং ভিন্ন২ প্রদেশের লোকেরা ভিন্ন২ শাস্ত্রানুসারে সে সকল নির্বাহ করিয়া থাকেন কিন্তু বিধবাবিবাহ কোনদেশের আচারসিদ্ধ নহে এবং কোনদেশের ব্যবস্থাপক শাস্ত্রেও তাহার বিধি নাই।…

তৃতীয়তঃ, বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন হইলে হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে উত্তরাধিকারী হইবার যেরূপ শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রচলিত আছে তাহাতে বহুতর ব্যতিক্রম হইবে অর্থাৎ বিধবার বিবাহ হইলে তাহার গর্ভজপুত্র এদেশের শাস্ত্র ও সদাচারানুসারে জারজ অথবা বেশ্যাপুত্র ব্যতীত অন্যপ্রকার গণ্য হইবে না, অথচ তাহার সহিত যথার্থ উত্তরাধিকারিদিগকে ধন ভাগ করিয়া লইতে হইবে শাস্ত্রে ও লোকাচারে যাহার সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই তাহাকে উত্তরাধিকারী করিতে হইলে এক্ষণে উত্তরাধিকারি নির্ণয়ার্থ যেসকল দায়ভাগাদি শাস্ত্র ব্যবস্থাপকপুস্তক স্বরূপে রাজা প্রজা উভয়পক্ষে পরিগৃহীত আছে তাহার অনেক অংশ পরিবর্ত্তন অথবা নূতন দায়ভাগাদি ব্যবস্থাপুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে। ফলতঃ তাহা না করিলে বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি সুকঠিন হইয়া উঠিবে।…

চতুর্থতঃ, বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন করিয়া বিধবা-গর্ভজ পুত্রকে উত্তরাধিকারিমধ্যে গণ্য করিলে এদেশের মধ্যে অনেকের বংশলোপ হইবার সম্ভাবনা যেহেতু এদেশে প্রায় অপুত্রব্যক্তি মাত্রেই মৃত্যুসময়ে

আপনার পত্নীর প্রতি বংশরক্ষার্থ দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিয়া থাকেন তাহা শাস্ত্রসম্মতও বটে, যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয় তাহা হইলে লোভবশতঃ তাহার ঐ পত্নী অন্যপুরুষকে বিবাহ করিবে, তাহাতে পূর্ব্ব-পতির অনুমতিক্রমে দত্তকগ্রহণ ব্যাহত হইয়া, সুতরাং তাহার বংশলোপ জন্মাইবে।

পঞ্চমতঃ, বিধবাবিবাহের আইন হইলে অনেক স্ত্রীর স্বধর্ম্মে মতি সত্ত্বেও অর্থলোভি সপিণ্ডাদির ষড়যন্ত্রে ধর্ম্মহানি হইবার সম্ভাবনা।...

ষষ্ঠতঃ, আপনারা প্রজাদিগের হিতার্থ ঐ আইন সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু উপরিলিখিত কয়েকপ্রকরণ পাঠ করিলে অবশ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে যে ইহাতে হিত না হইয়া প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মতঃ ও অর্থতঃ অহিতই হইবে।...

...আমরা যে আপনাদিগকে উপদেশ করি অথবা আপনাদের অভিপ্রায়ে ব্যাঘাত জন্মাই এতাদৃশ যোগ্যতা আমাদের নাই, পিতা-মাতার নিকটে বালকে যদ্রূপ প্রার্থনা করে তদ্রূপেই নিবেদন করিতেছি ...আমরা কেবল ধর্ম্মদ্রোহ সম্ভাবনা দেখিয়াই এই আবেদনপত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি আপনারা বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন প্রচারে ক্ষান্ত হউন, আমরা নিয়তই আপনাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং করিব ইতি।

প্রতিবাদীদের অন্যান্য আবেদনপত্রগুলি পাঠ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে এছাড়া আর অন্য কোন যুক্তির অবতারণা করা হয়নি। প্রতিবাদীদের প্রধান যুক্তি ছিল, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ; বিধবাবিবাহের প্রচলন হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে বংশলোপ হবার সম্ভাবনা আছে, এবং পারিবারিক বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে। বিধবাবিবাহের ফলে হিন্দুরা যে কেবল ধর্মচ্যুত ও আচারভ্রষ্ট হবে তাই নয়, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিধবাবিবাহের সপক্ষে, প্রায় একহাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিদ্যাসাগরের নিজের আবেদনপত্র ছাড়াও, বাংলাদেশের নানাস্থান থেকে আরও

অনেকে স্বতন্ত্র আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এইগুলি :

১। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, কালী-চরণ লাহিড়ী, ব্রজনাথ মুখার্জি, দুর্গাচরণ সেন, উমেশচন্দ্র শর্মা মৈত্র এবং কৃষ্ণনগরের আরও অনেক সম্ভ্রান্ত (২৬ জনের) ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (ডিসেম্বর ১৮৫৫)।

২। কৃষ্ণনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যক্তিদের ১২৯ জনের স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (ডিসেম্বর ১৮৫৫)

৩। কলকাতা মিশনারি সম্মিলনের আবেদনপত্র (২২ ডিসেম্বর ১৮৫৫)।

৪। বারাসত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রায় ৩১৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫)।

৫। কলকাতা শহরের প্রায় ৬৮৫ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, অভয়চরণ বসু, রাজকিষণ মুখার্জি, ভবনাথ সেন, দীননাথ দাস।

৬। শান্তিপুরের জমিদার, তালুকদার, প্রধান গোঁসাই ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের (প্রায় ৫৩১ জন) আবেদনপত্র।

৭। মুর্শিদাবাদের সার্কেল-পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত মদন-মোহন তর্কালঙ্কার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আবেদনপত্র (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)।

৮। মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ বসু ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আবেদনপত্র (২৯ মার্চ ১৮৫৬)।

৯। বাঁকুড়া ও বর্ধমানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র (১৫ এপ্রিল ১৮৫৬)।

১০। বারাসত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আর একটি আবেদনপত্র (১০ এপ্রিল ১৮৫৬)।

১১। ডিরোজীয়ানদের বা ইয়ংবেঙ্গল দলের আবেদনপত্র, প্রায় ৩৭৫ জনের স্বাক্ষরসহ (৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬)।

১২। চট্টগ্রামের হিন্দুবাসিন্দাদের আবেদনপত্র (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)।

আবেদনপত্রগুলি দেখে মনে হয়, কলকাতা শহরের পরেই বারাসত-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও আন্দোলন কম হয়নি। বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে বর্ধমানের রাজা ও কৃষ্ণনগরের রাজার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের মহারাজা মহাতবচাঁদ ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের যে যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বর্ধমানের মহারাজার সমর্থনের কথা উল্লেখ করে গ্র্যাণ্ট সাহেবকে এক পত্রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন : "It is really a matter for congratulation, that the first man of Bengal is going to take up the cause." তখনকার বাংলার সমাজে বর্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, এবং সামাজিক প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁদের মতামত জনসাধারণকে প্রভাবিত করত। সেইজন্য বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে এই দুই সমাজপতি যথেষ্ট শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে ইয়ংবেঙ্গল দলের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলের প্রধান মুখপাত্ররা ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেছিলেন, বিধবাবিবাহের প্রস্তাবিত আইনটি সংশোধন করার জন্য। সংশোধনের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তাঁরা লিখেছিলেন :[২১]

> It does not lay down what shall constitute valid widow marriage. Such definition appears to be absolutely necessary, since widow marriage, when it comes to pass, will be a new fact in the Hindu Social System, and it

may be naturally expected than that different men will employ different modes of solemnizing it, and also it may be apprehended that such marriages will often be disputed in a Court of Justice.

বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করা হলেও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তা অনুষ্ঠিত না হলে, যার যে-ভাবে খুশী বিবাহ করবে এবং তার ফলে হিন্দু-সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আদালতের পক্ষেও এক্ষেত্রে কোন্‌টা সঙ্গত ও কোন্‌টা অসঙ্গত তা বিচার করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্ররা দুটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রস্তাব করেছিলেন। এই অঙ্গীকারপত্র দুটি এই :

DECLARATION A

"I..., widower or bachelor, and I... widow or spinster, do hereby jointly and severally declare that of our own free will and accord, we have solemnized our marriage with each other on this day of...

Witness our hands etc
The above declaration were
made in the presence of...

AGREEMENT B

"I..., having taken... as my wedded wife on this day, do hereby bind myself not to contract a second marriage during her lifetime, and in breach of this engagement on my part, to pay to her the sum of Company's Rupees ... on the date of any second marriage."

বিবাহের পর ছ'মাসের মধ্যে এই অঙ্গীকারপত্র দুটি রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং পাত্রপাত্রী উভয়েই এই চুক্তির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

বিবাহিত জীবনে যতদিন তাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরাগী ও বিশ্বাসী থাকবেন, ততদিন এই চুক্তি বলবৎ থাকবে। বিবাহিত জীবনে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে এই চুক্তি কার্যকর হবে না।

১৮৫৬, ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্ররা প্রায় ৩৭৫ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ এই সংশোধনপত্রটি ভারত-সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তার আগে ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে দেখা যায় কৈলাসচন্দ্র দত্ত ৪৪ জন লোকের স্বাক্ষরসহ বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই আবেদনপত্রে তাঁরা অনুরোধ করেছিলেন যেন প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ আইনে একটি নতুন ধারা যোগ করা হয় এই মর্মে যে, কোন বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে গণ্য হবে না, যদি না তা কোন সরকারী কর্মচারীর সামনে রেজিস্ট্রি করা হয়—"for the insertion of a Marriage Registration Clause, under which marriages of Hindoo Widows in whatsoever manner performed, will be held valid provided they are registered by the contracting parties before public officials appointed by the Government for the purpose".

ইয়ংবেঙ্গল দল ও অন্যান্য যাঁরা বিধবাবিবাহ আইন সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের সামাজিক দৃষ্টি আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁরা বিধবাবিবাহ আইনের ভিতর দিয়ে একটি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের আইন পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এই আইন আরও ষোল বছর পরে, কেশবচন্দ্র সেনের আমলে, ১৮৭২ সালে Civil Marriage Act. III নামে পাশ হয়েছিল। প্রধানত ব্রাহ্মরাই আন্দোলন করে এই আইন পাশ করিয়েছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগে দেখা যায়, বিধবাবিবাহ আইনের আন্দোলনের সময় ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্ররা এবং সমাজের অন্যান্য আরও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা আইনটিকে 'সিভিল ম্যারেজের' অনুরূপ একটি আইনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বিধবাবিবাহ আইন কেবল বিধবাদের পুনর্বিবাহের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ না রেখে, তাকে যে-কোন স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন পুরুষ ও নারীর বিবাহের আইনে পরিণত করা। নবযুগের বাণিজ্যিক মনোভাব এই চুক্তিবদ্ধ বিবাহের মধ্যে প্রতিফলিত।

নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন, এবং উভয়েই স্বেচ্ছায় কয়েকটি শর্ত মেনে নিয়ে, সাক্ষীদের সামনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। ১৮৭২ সালের 'তিন আইনের' বিবাহের মর্ম এই। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আইন পাশের সময় এতদূর পর্যন্ত বিবাহসংস্কারের কথা ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ইয়ংবেঙ্গল দল ও অন্যান্য আরও কয়েকজন এই আন্দোলনের সুযোগে যে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা তাঁদের পূর্বোক্ত সংশোধন-প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়।

রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর থেকে কয়েকজন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিধবা-বিবাহের সমর্থনে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে তাতে উল্লেখ করেছিলেন :

> That your petitioners with due respect and submission beg leave to represent that they consider the exclusion of children born of widows duly married according to the forms of wedlock prescribed by the Hindoo Religion from all claims to the property of their parents as inconsistent with a true interpretation of the Hindoo Shastras and as a grievous obstacle to the introduction of the custom of marriage of Hindoo widows, a thing to be highly desired on various accounts.

অবশেষে বহু বাদানুবাদ আবেদন-নিবেদন এবং ব্যবস্থাপক সভায় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৫৫, ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। আইনের প্রথম ও ষষ্ঠ ধারাটি এই :

ACT XV of 1856, DATED 26th JULY 1856

I. No marriage contracted between Hindoos shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by the reason of the woman having been previously married or betrothed to another person, who was dead at the time of such marriage.

Any custom and any interpretation of Hindoo law to the contrary notwithstanding.

VI. Whatever words spoken, ceremonies performed or engagements made on the marriage of a Hindoo female, who has not been previously married, are sufficient to constitute a valid marriage, shall have the same effect, if spoken performed or made on the marriage of a Hindoo widow ; and no marriage shall be declared invalid on the ground that such words, ceremonies or engagements are inapplicable to the case of a widow.

ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্ররা ও অন্যান্য যাঁরা বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আশা পূর্ণ হল না। 'সুহৃদ্ সমিতি' (The Association of Friends for the Social Improvement of Bengal) তাঁদের দ্বিতীয় বাৎসরিক সভার রিপোর্টে এই বিষয়টি উল্লেখ করে মন্তব্য করেন :[২২]

It is, as it should be, permission law, but unfortunately it prescribes neither registration nor any other mode for establishing the validity of marriage in this land of false accusation, where it is so liable to be disputed by interested parties. The Committee cannot therefore help repeating their convictions that it must be soon followed up by more Catholic Marriage Act like that contemplated by the Association on the defective Marriage Act (of 1856).

আইন পাশ হবার পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্রূপ করে একটি কবিতা রচনা করেন :

শ্রীমান ধীমান, নীতি নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান, বিধবাতারক॥

নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।
আইনবৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে?
গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই, বদনভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায়॥
মিছা-মিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শক্র, যাক্ পরে পরে॥
তখন এরূপ কবে, হলে ব্যতিক্রম।
ফাটায পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম॥

গুপ্ত-কবির ইঙ্গিতটি লক্ষ্য করার মতন। বাঙালীচরিত্রের বাক্যবিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন যে কেবল কথাই সার হবে, কাজ হবে না কিছু। 'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাই তিনি 'সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ,' এই কথা বলে, বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করেই মন্তব্য করেছেন,—'সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন, তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন'।

৮ সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ (২)

সাগরের ঢেউ সীমা লঙ্ঘন না করলেও, বিদ্যাসাগর কথার সীমা লঙ্ঘন করে কাজে বিধবাবিবাহ ঘটালেন। 'মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা'— গুপ্ত-কবির এই ব্যঙ্গোক্তির জবাব দিতে তিনি এগিয়ে এলেন। 'সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়? কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়'— গুপ্ত-কবির এই অভিযোগ যে মিথ্যা নয়, বিদ্যাসাগর তা জানতেন। প্রতিজ্ঞা তাঁর পর্বতের মতন অটল ছিল, এবং সৎসাহসেরও অভাব ছিল না। জুলাই মাসে আইন পাশ হবার পর ছ'মাসের মধ্যে তিনি উদ্‌যোগী হয়ে, কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায়, প্রথম বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন।

বিধিসম্মত প্রথম বিধবাবিবাহের পাত্র হলেন খাটুরা গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপনা করে পরে মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বিধবাবিবাহের প্রথম পাত্রী হলেন বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গানিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। বিবাহের দিন স্থির হয় ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬, শকাব্দ ১৭৭৮, সন ১২৬৩, ২৩ অগ্রহায়ণ। বাংলার ও ভারতের সমাজসংস্কারের ইতিহাসে এই দিনটি চিরস্মরণীয়। 'সংবাদপ্রভাকর'

লেখেন যে ১৫ অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, কিন্তু নানা বাধাবিপত্তিতে ভয় পেয়ে শ্রীশচন্দ্র মনস্থির করতে পারেননি। ২৭ নবেম্বর ১৮৫৬ ইংরেজী 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় তাই নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য শ্রীশচন্দ্র মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে বিধবা-বিবাহের সিদ্ধান্ত করেন।

বিবাহের দিন স্বভাবতই কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল, এবং কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বহু লোক বিবাহস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন যে এই বিবাহের জন্য প্রায় ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। অধ্যাপক-ভট্টাচার্যদের জন্য স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণপত্র সংস্কৃত কবিতায় রচনা করা হয়েছিল। পত্র দুখানি এই:

শ্রী লক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ সবিনয়ং নিবেদনং। ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভবিবাহ হইবেক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেশষ্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৮।

অধ্যাপক-ভট্টাচার্যদের জন্য রচিত সংস্কৃত নিমন্ত্রণপত্রটি এই:

> অস্ত্যে ভৌমে নিশান্তে বিলসতি নিতরাং
> পদ্মিনীপ্রাণকান্তে
> স্বাহাকান্তে ক্ষণাংশে দিনকিরণদিনে
> শাস্ত্রমার্গানুসারী।
> ভূয়োভাবী বিধানাৎ পরিনয়নবিধির্ভর্তৃহীনাত্মজায়াঃ।
> পূর্য্যোবর্য্যার্য্যবিজ্ঞৈরিহ সদসি গতৈর্ম্মৎ-কৃপাপারতন্ত্র্যাৎ॥

অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছিল তা এই:

জগৎকালীর দ্বিতীয়োদ্বাহের এই রক্তময় পত্র প্রাপ্ত হইয়া বাবু

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু নৃসিংহচন্দ্র বসু, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক প্রভৃতি অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতুকদর্শি লোক সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোকসমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবেরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকাকালে বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করেন, দুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া প্রায় শতাধিক লোক লাল বনাতাবৃত ভট্টাচার্য্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চুভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট উপস্থিত থাকিয়া গোল করিয়া হাট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

বিবাহ সময়ে বর বাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয়পক্ষের পুরোহিতেরা বিবাহমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপান্তর করেন নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে 'দ্বারষষ্ঠী ঝাঁটাকে' প্রণাম করেন, ও স্ত্রী-আচারস্থলে উলু উলু ধ্বনী নাকমলা, কানমলা "কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁদলেম, হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু" রমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় বর বাহাদুর ভ্যাও করিয়াছিলেন।

এইরূপে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হইলে আহারের ধূম পড়িয়া যায়। প্রায় ছয় শত লোক রঙ্গ দেখিয়া মোণ্ডা ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া ঢোল পিটিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের ব্যাপার আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, যাহা হউক, এই বিবাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও বিলক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিয়াছিলেন, দম্পতির উভয় কুল পরিশুদ্ধ হইল, "যেমন হাড়ি তেমনি সরা" মিলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুসঙ্গে

বিধবার বিবাহসঙ্গিগণের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন।

'সংবাদ প্রভাকর' বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন। অনুষ্ঠানের বিবরণের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতার ভঙ্গি দেখেই তা বোঝা যায়। বিবরণের শেষে আরও স্পষ্ট ভাষায় এই বিরোধিতার কথা জানিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন: "পাঠকগণ! আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এবং এক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দু বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোনক্রমেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জাতি কুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় না এবং কন্যার খুড়া কিংবা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বরপাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন… ।"[১]

গুপ্ত-কবির বাণগুলি খুব তীক্ষ্ণ। এইজন্য পাঁচালিকার দাশরথি রায় তাঁর বিধবাবিবাহ পালাগানে লিখেছিলেন—"আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত অলপ্পেয়ে, নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে, হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেমন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।" চিঠিপত্রও অনেক এই সময় বিরোধীপক্ষের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সবই প্রায় একসুরে বাঁধা একরকমের চিঠি। যেমন জনৈক পত্রলেখক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখেছিলেন: "সভায় দুই সহস্র লোক উপস্থিত ছিল যথার্থ বটে কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ অনিমন্ত্রিত রঙ্গদর্শক। ইঁহারা কেহই তথায় ভোজন করেন নাই এবং বিধবাবিবাহ বৈধ বলিয়া নাম স্বাক্ষরও করেন নাই; সুতরাং ইঁহাদিগকে তন্মতাবলম্বি বলা যাইতে পারে না। ইংরাজগণের বিধবা অথবা সমাধিদর্শনে অনেক ক্রিয়াকলাপ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত হিন্দু গমন করিয়া থাকেন, অনেকে অগত্যা কসাইটোলার গোহত্যাও দর্শন করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের কোন দোষ আইসে না;… ।" এইভাবে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁদের পত্রপত্রিকার ভিতর দিয়ে, অনেকক্ষেত্রে অশ্লীল ভাষায় পর্যন্ত, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও প্রতিবাদ করতে থাকেন। 'সংবাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'অরুণোদয়' প্রভৃতি পত্রিকা

বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দ প্রকাশ করে উদ্‌যোগীদের উৎসাহ বর্ধন করেন।

কলকাতায় প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের পরদিন পানিহাটি গ্রামে কুলীন কায়স্থবংশের হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতার নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ-বর্ষীয়া একটি বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। কন্যার পিতাই কন্যাকে সম্প্রদান করেন। দু'দিনে পর পর দুটি বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন :[২]

> আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদিগের চির-বাঞ্ছিত বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে···উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল। শুভ বিবাহের সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্রপরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্রসন্তান কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া উক্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পর্ব্বে এত লোকের সমারোহ হইয়াছিল, যে সকল লোকে সুন্দররূপে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং কন্যা সম্প্রদানের বাটীর নিকটস্থ রাজপথ শকটাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে যে বঙ্গদেশের মধ্যে প্রকাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন কোন ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিত হইয়া আহ্লাদসাগরে ভাসিতেছেন এবং কোন কোন লোক শোকেতে মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা এই ঘটনাকে স্বদেশের চির কল্যাণের কারণ জানিয়া ইহার প্রযোজক ও প্রবর্ত্তকদিগকে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন, কেহ বা ইহাকে নিশ্চয় ভারতবর্ষের কলঙ্কস্বরূপ ও হিন্দু-ধর্ম্মের উৎসেদের হেতু মনে করিয়া ইহার উদ্যোগ কর্ত্তা ও উৎসাহ দাতাদিগকে নানাপ্রকার অশ্রাব্য কটুকাটব্য করিতেছেন। যে সকল জ্ঞানসম্পন্ন দেশহিতৈষি বুদ্ধিমান লোকে এই পরম কল্যাণকর শুভ ঘটনা

সম্পন্ন হইবার প্রতি বহু কাল হইতে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছিলেন, যাঁহারা এই শুভ দিন উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিদিন দিন গণনা করিতেছিলেন, যাঁহারা এই আনন্দময় সুখের দিন প্রাপ্ত হইবার জন্য দুরবলম্বিনী আশালতার মূলে নিয়ত যত্নবারি সেচন করিতেছিলেন, এবং যাঁহারা এই বিধবা বিবাহরূপ পুণ্য তরুকে স্নেহাস্পদ জন্মভূমিতে রোপণ করিবার জন্য নানাপ্রকার মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্বদেশীয় অনেক বন্ধুবান্ধবের মানসক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদিগেরই মনে আনন্দের উদয় হইয়াছে···।

যাঁরা নানাপ্রকারে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যা মন্তব্য করেন তার মর্ম এই: বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে কলিকাল ক্রমে ঘোর হওয়াতে ধর্মাচরণ লোপ পেতে আরম্ভ করল, ধর্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধও লোকের কাছে অমান্য হয়ে উঠল এবং অধর্মের প্রাধান্য বাড়তে আরম্ভ করল। তাঁরা তারস্বরে প্রচার করতে লাগলেন যে ভারতবর্ষ থেকে এইবার হিন্দুদের নাম একেবারে লোপ পেয়ে যাবে, এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যগৌরব এইসব অধর্মাচরণের জন্য ম্লান ও কলঙ্কিত হবে। এঁদের মনোভাব এত বেশী রক্ষণশীল যে শাস্ত্রবচনের বাইরে যুক্তি, বিবেক ও বিচারবুদ্ধিকে এঁরা স্বীকার করেন না, এবং অন্ধ দেশাচার পালনে সমাজের সমূহ ক্ষতি হলেও তাকে পরম কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' লেখেন, ধর্মাভিমানী মহাশয়েরা কেন যে বিধবাবিবাহের কথা শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বোঝা যায় না। আসলে ধর্মাধর্মের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নেই, কেবল দেশাচারের প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। "কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধর্ম্মপালক বলিয়া দম্ভ করেন, এমন মঙ্গল বিষয়েও এইপ্রকার আনন্দের স্থলে তাঁহাদিগের দুঃখিত হওয়া ও অনাহ্লাদ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘকালের পর শরীরের কোন চিররোগ আরোগ্য হইলে তজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন অসঙ্গত সেইরূপ দেশপ্রচলিত কোন প্রাচীন কুপ্রথার উৎসেদ দেখিয়া খেদ

করা অন্যায়।" অবশেষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লেখেন :

> এক্ষণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রযত্নে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, যাহাদিগের উৎসাহে এই চিরবাঞ্ছিত সুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুল্য গুণের বিষয় বর্ণন না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহৎ ব্যাপার যে ক'এক ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্ত্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে। এই মহাব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্য্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শতবর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রতি প্রধান কারণ···তিনি এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কটুকাটব্য ও উপহাসাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই···তাঁহার ভূধরসম নিশ্চল স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন পর্ব্বত উপর পতিত হইয়া আপনিই তেজোহীন হয়, শত্রুগণের নিন্দাবাদ ও কটুবাক্য সকলও সেইরূপ তাঁহার উপর পতিত হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ব্যাপারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। নিন্দাকে সত্যই বিদ্যাসাগর নিন্দা মনে করেননি, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেননি এবং প্রতিবাদীদের কোন কটুবাক্যে কর্ণপাতও করেননি। চতুর্দিক থেকে বর্ষিত কটূক্তির মধ্যে তিনি 'ভূধরসম নিশ্চল' হয়ে অবিচলিত চিত্তে তাঁর

সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করেছেন, কথা ও কাজের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখেননি। কেবল কটুবাক্য বর্ষণ করেই প্রতিবাদীরা ক্ষান্ত হননি। হিন্দুসমাজের ধনিক নেতারা তাঁদের আশ্রিত দুর্বৃত্তদের দিয়ে তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করবার চেষ্টা করেছেন, এমনকি তারা তাঁর প্রাণসংহারেও চক্রান্ত করেছিলেন শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে 'হিতবাদী' পত্রিকায় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু পরে লিখেছিলেন :[৩]

> বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত ; কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতায় কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে মরিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ-প্রহারের কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর একবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্বাক হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে একজন পারিষদ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, লোকপরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে। তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি ; আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহা অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন।

এই সময় শোনা যায় বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস তাঁর পুত্রের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বীরসিংহ গ্রাম থেকে শ্রীমন্ত নামে এক জেলে-সর্দারকে কলকাতায়

পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কোথাও যেতেন তখন পথে শ্রীমন্ত সর্বদাই থাকত। বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান যখন কার্যক্ষেত্রে আরম্ভ হল সেই সময় একদিন প্রায় মধ্যরাত্রে সংস্কৃত কলেজ থেকে বাসায় ফেরবার সময় তিনি দেখলেন ঠনঠনিয়ার কালীতলায় কয়েকজন দুর্বৃত্ত দল বেধে আক্রমণ করার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। দৃশ্যটি দেখে তিনি একেবারেই বিচলিত হলেন না, গলা ঝাড়া দিয়ে শ্রীমন্তকে ডেকে বললেন—"কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস তো ?" দুর্দান্ত লাঠিয়াল সর্দার শ্রীমন্ত লাঠিসহই তাঁর পশ্চাদনুগমন করছিল। সে উত্তর দিল, "চল তুমি, আমি ঠিক তৈরী আছি।" ব্যাপার দেখে দুর্বৃত্তরা বুঝল, বিদ্যাসাগর অসাবধানী নন, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই তিনি পথে বেরিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য সফল হল না।

এরকম আরও অনেক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু সমাজের কোন মহান্ আদর্শের সংগ্রামে বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যারা গোপন চক্রান্ত ও হীন গুণ্ডামির আশ্রয় নেয়, তারা যে কাপুরুষ এবং তাদের যে কোন নৈতিক চরিত্রবল নেই, একথা বিদ্যাসাগর ভালভাবেই জানতেন। তাই গুণ্ডার আস্ফালনকে কোনদিনই তিনি বীরের সৎসাহস বলে মনে করে ভুল করেননি। তাঁর অজেয় চরিত্রবল দিয়ে তিনি প্রতিবাদীদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করেছেন।

১৮৫৬, ৭ ও ৯ ডিসেম্বর পর পর দুটি বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের পর প্রতিবাদীরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে মুখের কথা, শাস্ত্রবিচার ও ও কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ সরকারী আইনের স্তর থেকে নেমে এসে বিদ্যাসাগর বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আরও দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর অগ্রগতি প্রতিরোধ করা কঠিন। শত্রুপক্ষের কোন বাধাবিঘ্নে ও চক্রান্তে তিনি যে এতটুকু বিচলিত হবেন না, তা তাঁর শত্রুরা বিলক্ষণ জানতেন। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম হলেও, তাঁদের কাছ থেকে তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন যথেষ্ট। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রথম সম্পাদক, তাঁর সহযোগী ও অনুরাগী বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্ত, এই সময় এলাহাবাদ থেকে একখানি পত্রে তাঁকে লেখেন : "আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাবিবাহের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে

এবিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এসময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্ কালেও যাইবেক না। মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবাবিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার কি হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন।" তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন রাজনারায়ণ বসু। এবিষয়ে তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন :[৪]

> তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবাবিবাহ করিতে যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজ্যে তাঁহার পাল্কির ভিতর মুখ দিয়া বলিল, "দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।" মেদিনীপুরেও কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে "রাজনারায়ণ বাবু জানেন না যে তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন।" ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনায়াসে পুড়াইয়া দিতে পারি।
>
> আমি ও সেকেণ্ড মাষ্টার উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন, আমরা দুইজনে একদিন নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া দুই মোটা লাঠী কাটিয়া লইয়া আসি। যদি দাঙ্গা হয় সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইবে। বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে "রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আইলে আমরা ইঁট মারিব।" তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম "তাহা হইলে আমি খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবা-বিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল

মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।" মেদিনীপুর হইতে যখন কলিকাতায় আসিতাম তখন রাত্রি-কালে বোড়ালে যাইতাম এবং ভোর না হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতাম। একবার বোড়ালে গিয়াছিলাম, শেষরাত্রে দেখি বাটীর ভিতর হইতে কে একটী প্রদীপ হাতে করিয়া আসিতেছে। আমি বহির্বাটীতে শয়ন করিয়াছিলাম। প্রদীপহস্ত ব্যক্তি যখন আমার মশারীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন তখন দেখিলাম যে মাতাঠাকুরাণী; তিনি বলিলেন "রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল;" এই বলিয়া অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন। এই বিধবাবিবাহ জন্য মাতাঠাকুরাণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময়ে বাটীতে থাকিলে আমার দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না। ঐ সময়ে মহর্ষি দেবেনন্দ্রাথ ঠাকুরও পশ্চিমে ছিলেন। আমি তাহাকে বিধবাবিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।" 'সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়' এই বাক্য এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জনসাধারণবাক্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রথমে উল্লিখিত উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

'সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়', একথা তখনকার ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত হয়েছিল বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধবাবিবাহের সময় সর্বপ্রথম এই কথাটি ব্যবহার করেন। ঈশ্বর বলতে তিনি জগদীশ্বরের কথাই বলেছেন, যদিও তাৎকালিক ইতিহাসের দিক থেকে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও একথার তাৎপর্য প্রযোজ্য। বিধবাবিবাহের সাধু সংকল্প তখন যাঁরাই গ্রহণ করেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁদেরই সহায় হয়েছেন। রাজনারায়ণ বসুকে বিধবাবিবাহে উদ্‌যোগী হতে দেখে, বিদ্যাসাগর তাঁকে লিখেছিলেন :

"আপনি অসাধারণ সাহসপূর্ব্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,…আপনাকে স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি ; বস্তুত আপনি অতি মহাত্মার কর্ম্ম করিয়াছেন। এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকারে আপনার মনে যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।"

বিধবাবিবাহের সমর্থক ও উৎসাহীদের যে কি প্রবল সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তা রাজনারায়ণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সমাজ থেকে তাঁদের পরিবারকে সকলে প্রায় একঘরে করে দিয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকে তাঁর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। বোড়ালের লোকজন বলেছিল যে তিনি গ্রামে এলে তাঁকে ইঁট-পাটকেল মারবে। যাঁরাই বিধবাবিবাহে উৎসাহী হতেন তাঁরাই এই ধরনের নানারকম নির্যাতন ভোগ করতেন। এই ঘটনার প্রায় দশ-এগার বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বিধবাবিবাহ দিয়ে যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, তার বিবরণও তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে' লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পাত্রী মহালক্ষ্মী, ঈশানচন্দ্র রায় নামে মেডিকাল কলেজের এক ছাত্রের বিধবা বোন। এই বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন :[৫]

আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবাবিবাহের পক্ষ… বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ঈশানকে ও তাহার ভগ্নীকে জানিতেন, এবং যতদূর স্মরণ হয় কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়া প্রয় দুই তিনজন ভদ্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু কিছু গহনা দিলেন। এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন তাহাকে পরিত্যাগ

> করিলেন…তদুপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে না, দিন চলা ভার।

বিধবাবিবাহের আইন পাশ হবার পর যাঁরা বিধবাবিবাহে উদ্‌যোগী হতেন ও বিবাহ করতেন, তাঁদের সকলকেই যে কি ভয়ানক সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে হত, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এই বিবরণের মধ্যে তার পরিচয় আছে। লক্ষণীয় হল, আইন পাশ হবার পর ১৮৫৬-৫৭ সালের কয়েকটি বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ১৮৬৮ সালেও বিধবাবিবাহের ব্যাপারে তিনি নিজে যে কতখানি উৎসাহী ছিলেন তা শিবনাথ শাস্ত্রীর পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায়। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে মহালক্ষ্মীর বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং তার সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন। প্রতিপক্ষের সামাজিক নির্যাতনে ও দুর্ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হলেও, বিচলিত হননি। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাস তাঁর বিধবা বালিকা-বিমাতার পুনর্বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও প্রথমে ব্যর্থ হন, এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একখানি চিঠি লেখেন। বেদনা, সহানুভূতি ও সান্ত্বণা জানিয়ে পত্রোত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন :[৬]

> আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সঙ্কল্পিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। এবিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনকার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায়সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', শুভকার্য্যের নানাবিঘ্ন। আমি যে অবধি এই বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবেক। অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে

বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা ও কত উদ্যোগ করা যায় কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদুর কৃতকার্য্য হইতে পার যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এই বিষয়ে সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম এইরূপে ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব···আপনি যেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধে আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে।···

বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের অন্তরের কথাই এই চিঠির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। "শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র"—এ সত্য তিনি তাঁর নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেরকম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেরকম তাঁর সমকালীন আর কোন ব্যক্তির করবার সুযোগ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি জানতেন, সমাজে ভাল কাজ করতে গেলে বাধা অনেক পেতে হয়। যে-কাজ যত বেশী ভাল, সেই কাজের বাধাও তত বেশী ও বিচিত্র। তাই নিজে কোন কাজে বিফল হলে যেমন তিনি নিরুৎসাহ হতেন না, তেমনি অন্যের ব্যর্থতাতেও সান্ত্বণা ও উৎসাহ দিতেন। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে একাজ তাঁকে সবচেয়ে বেশী করতে হয়েছিল।

১৮৫৬-৫৭ সালে যখন বিধবাবিবাহের ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন হচ্ছিল, এবং সেই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা, তখন কলকাতার কয়েক মাইল দূরে বারাকপুরে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল, এবং সারা ভারতব্যাপী ধীরে ধীরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল। সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান বাহ্য কারণ ছিল ধর্মীয় (religious)।

ধর্মভীরু গোঁড়া সিপাহীদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে বন্দুকের টোটায় নিষিদ্ধ প্রাণীর চর্বি মিশিয়ে, এবং তা দাঁতে কাটতে বাধ্য করে, ইংরেজরা তাদের ধর্মচ্যুত করার সংকল্প করেছে। আগে থেকেই খ্রীস্টান পাদ্রীরা তাঁদের ধর্মান্তরের অভিযানের ভিতর দিয়ে এই ধরনের সন্দেহ এদেশের সাধারণের মনে জাগিয়েছিলেন। তার উপর নতুন ইংরেজীশিক্ষার নীতি, এবং সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজসংস্কারের আইনগুলি এই সন্দেহকে ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল। রক্ষণশীল ধর্মপ্রচারকেরা সন্দেহের এই ধূমায়িত বহ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। বিধবাবিবাহের আন্দোলন ও অনুষ্ঠান এই অপপ্রচারের পথ আরও বেশী প্রশস্ত করেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার পুনর্বিবাহের প্রথা এদেশের হিন্দুধর্মসম্মত প্রথা নয়, বিধর্মী খ্রীস্টানদের প্রথা, একথা ধর্মগোঁড়ারা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। এই সময় টোটার চর্বি সিপাহীদের মধ্যে বারুদে অগ্নিসংযোগ করেছিল মাত্র। মেজর-জেনারেল টাকার (H. T. Tucker) সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :[৭]

> The natives generally and the native army in particular, have been recently strongly impressed, however they came by it, with the idea, that it was intended to subvert their religion, and to make the army converts to Christianity. ...The recent legislation, so comparatively rapid on questions intimately connected with the feelings, and the religion of the natives, together with the wholesale changes introduced into the system of native education in Bengal...have been amply sufficient to dispose the Sepoys for the reception of the strongest impressions adverse to our rule.

সৈয়দ আহমদও সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করে এই একই কথা বলেছিলেন :[৮]

> There is no doubt that all persons, whether intelligent or ignorant, respectable or otherwise, believed that the Government was really and sincerly desirous of interfering with the religion and custom of the people, converting them all...to Christianity and forcing to adopt European manners and habits. This was perhaps the most important of all causes of the rebellion...

স্বভাবতঃই সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে বিধবাবিবাহের সমর্থকরা কিছুদিনের জন্য তাঁদের কার্যকলাপ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সুযোগে বিপক্ষদল এক গুজব রটাতে থাকেন যে হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করার ফলে ইংরেজরা মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছেন; সিপাহীরা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বত্র বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুধর্মের সুপ্ত শক্তি বিধর্মীদের স্বেচ্ছাচারিতায় জাগ্রত হয়েছে। রক্ষণশীলদের এই অপপ্রচারের ফলে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, এবং সেই সংস্কারবিরোধী উত্তেজনার জোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করাও তখন দুরূহ হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহের উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে প্রায় একবছর তাই বিধবাবিবাহের কোন অনুষ্ঠান কোথাও হয়নি। ১৮৫৭ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, সামাজিক অবস্থা কিছুটা শান্ত হলে, আবার কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই বিবাহের কথা উল্লেখ করে লেখেন :[৯]

> গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে এই শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানারম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় কত্রকটী বিধবার বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। তৎপরে কয়েক মাস আর বিবাহ হয় নাই। ইহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে বিধবাবিবাহের আইন রহিত হইয়া গিয়াছে, আর বিধবার বিবাহ হইবেক না। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং ঐ প্রচার চেষ্টা যে কেবল

বিদ্বেষমূলক, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। গত অগ্রহায়ণের অষ্টাবিংশ দিবসে কলিকাতা রাজধানীতে একটী বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই তাহার দেদীপ্য প্রমাণ। যাঁহারা এতদিন লোকের নিকট এই অলীক কথা যথার্থ বলিয়া প্রচার করিয়া আমোদ ও আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে বোধ হয় কিছু অপ্রতিভ হইতে হইবেক।

প্রথমে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান বিশেষ হয়নি, কলকাতা শহরের মধ্যেই তা কেন্দ্রীভূত ছিল। ধীরে ধীরে কলকাতা শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে দুই একটি করে বিধবাবিবাহ ঘটতে লাগল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখলেন :[১০]

কি আহ্লাদের বিষয়, গত ১২ ও ২৮ আষাঢ় হুগলি জিলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটি বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা নগরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটী বিধবার উদ্বাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে রীতিমত বিধবাবিবাহের এই সূত্রপাত হইল। অনেকে মনে করিতেন, যদিও কলিকাতায় কথঞ্চিৎ এবিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সহসা হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কলিকাতার অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কুসংস্কার বিমোচন হইয়াছে। এমত স্থলে এরূপ হিতকর ব্যাপার প্রচলিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই অদ্যাপি অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং তাঁহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে নিতান্ত বশীভূত। এমত স্থলে এরূপ ব্যাপার হিতকর বলিয়া বোধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা অতি যথার্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক ফলোপদায়িনী হইয়া উঠে নাই। ঐ শিক্ষার এইমাত্র ফল

> লক্ষিত হইতেছে যে অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্যবোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই, যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সাহস দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এখানে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা অনেকখানি সত্য। ইংরেজী শিক্ষার ফলে তাঁরা কেবল ইংরেজদের বাইরের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করতে শিখেছেন, কিন্তু তাঁদের জাতীয় চরিত্রের সদ্‌গুণগুলি আপন করে নিতে পারেননি। সেইজন্য কলকাতা শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী হলেও, সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রত্যাশিত সুফল সেখানে ফলেনি। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ফলে তাঁদের মন যতখানি যুক্তিপ্রবণ ও কুসংস্কারমুক্ত হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। এই অবস্থায় বিধবাবিবাহের মতন সংস্কারকর্মের সাফল্য শহরের শিক্ষিতসমাজের মধ্যেও প্রায় সুদূরপরাহত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণের বোঝা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছিল। তার কারণ, অধিকাংশ বিধবাবিবাহের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করার দায়িত্ব নিতেন। কলকাতার প্রথম দুটি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "ইহাতে অগ্রজ মহাশয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়।" প্রায় প্রত্যেক বিবাহেই এইভাবে তিনি অর্থব্যয় করতেন। ১৮৬৮ সালেও দেখা যায়, শিবনাথ শাস্ত্রীর উদযোগে যে বিধবাবিবাহ হয়েছিল, তাতে তিনি অনুষ্ঠানের খরচপত্র তো দিয়েছিলেনই, কন্যাটিকে কিছু গহনাগাটি দিতেও কার্পণ্য করেননি। কেবল নমঃ-নমঃ করে কোন বিধবার বিবাহের দায় সারতে তাঁর মন উঠত না। ষোলকলায় পূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্যই তাঁর আগ্রহ থাকত বেশী, কারণ সব সময়েই বিধবা পাত্রীটির জন্য তিনি বেদনা বোধ

করতেন, এবং মনে মনে হয়ত ভাবতেন যে, যে-কোন প্রকারে বিবাহ দিলে পাত্রী মনে ব্যাথা পেতে পারে। বিধবা বলে তার বিবাহের আনুষ্ঠানিক আয়োজনের অভাব ঘটল, পাত্রীর মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কথাই চিন্তা করতেন সবচেয়ে বেশী। এই মানবতাবোধের জন্যই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যাতে কোন বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি না হয়। সেইজন্য অর্থব্যয়ও তাঁর যথেষ্ট হত। বন্ধুবান্ধব ও সমর্থকদের কাছ থেকে তিনি বিবাহের ব্যয়-সংকুলানের জন্য কিছু-কিছু করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। কেউ কেউ তাঁকে প্রতিমাসে অর্থসাহায্য করতেন, আবার এককালীন টাকাও দিতেন অনেকে। অন্তত এই ধরনের অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি অনেকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি তাঁদের অনেকের পক্ষেই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে বিদ্যাসাগর মোটা ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিধবাবিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার তাঁকে নিজেকেই বহন করতে হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুদের ঋণ পরিশোধের তাগিদে তিনি রীতিমত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) তাঁকে ঋণ শোধের তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখলে, তিনি যে উত্তর দেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রোত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন :[১১]

> আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা করিয়া দেখিলাম কিন্তু তোমার কাগজ খোলাসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এসকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই

অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এবিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক কেহ এককালীন কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ অবশিষ্টার্দ্ধ এপর্য্যন্ত দাও নাই এবং কিছু দিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এবিষয়ের সংবাদ লয়েন না।...

এই পত্রখানির মধ্যে যে গভীর নৈরাশ্য ও বিরক্তির সুর ফুটে উঠেছে তা সত্যই খুব করুণ। বিরোধীদলের নানারকমের হীন অপপ্রচারে তিনি জর্জরিত হয়ে গেছেন। তার উপর পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও সমর্থকগোষ্ঠীর

মধ্যে যাঁরা নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁরা একে-একে সময় ও সুযোগ বুঝে, এবং নিজেদের কোন জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখে, তাঁর সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। তার জন্য তিনি যে কতখানি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা বন্ধু দুর্গাচরণের কাছে চিঠিতে তিনি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেছেন। এমনকি দুর্গাচরণবাবুকেও তিনি রেহাই দেননি। বন্ধু হলেও এবং পাওনা টাকার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও, তিনি স্পষ্টভাষায় তাঁকে লিখেছিলেন, "অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্য্যন্ত দেও নাই, এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ।" তারপর গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন যে দেশের লোক 'এত অসার ও অপদার্থ' জানলে তিনি বিধবাবিবাহের ব্যাপারে এইভাবে অগ্রসর হতেন না, বিবাহের আইন প্রচার পর্যন্ত এগিয়েই ক্ষান্ত হতেন। অবশেষে বলেছেন যে 'দেশহিতৈষী' ও 'সৎকর্ম্মোৎসাহী' মহাশয়দের কথায় বিশ্বাস করে 'ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম।' ঋণ পরিশোধের কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় সরকারী চাকরি করবেন মনস্থ করেছিলেন, এবং ছোটলাট সিসিল বিডনের (Cecil Beadon) সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর কিছুকাল আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। দুর্গাচরণ বাবুকে তিনি লিখেছিলেন, "অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।" তাই তিনি করেছিলেন, নিজের লেখা বইপত্রের আয় থেকে বিধবাবিবাহের ঋণ শোধ করেছিলেন।

কেবল যে তাঁর বন্ধু-বান্ধবই তাঁকে প্রতারণা করেছেন তাই নয়, যাঁরা বিধবাবিবাহ করেছেন তাঁদের মধ্যেও প্রবঞ্চকের সংখ্যা কম ছিল না। তাঁর সাহায্য নিয়ে যাঁরা বিধবাবিবাহ করেছেন, দেখা গেছে তাঁদের অনেকেই বিধবাবিবাহ উপলক্ষ করে বহুবিবাহ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ একাধিক বিবাহ করার লোভে অনেকে লুকিয়ে বিধবাবিবাহ করতে রাজী হতেন, এবং তার জন্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও নিতেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে।

এই প্রবঞ্চনা বন্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর পাত্রকে দিয়ে একখানি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে সই করিয়ে নিতেন। এই অঙ্গীকারপত্রে পাত্রীকে সম্বোধন করে পাত্র লিখে দিতেন :

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও আইনসঙ্গত কর্ম্ম জানিয়া আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তোমার পাণি গ্রহণ করিলাম, অদ্যাবধি আমরা পরস্পর দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম। অর্থাৎ তুমি আমার পত্নী হইলে, আমি তোমার পতি হইলাম। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি প্রকৃতরূপে পতিধর্ম্ম পালন করিব, অর্থাৎ তোমার যাবজ্জীবন সাধ্যানুসারে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব। তোমার প্রতি কখনও অযত্ন ও অনাদর প্রদর্শন করিব না, আর ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ করিব না। যদি দুর্ব্বুদ্ধির অধীন বা অন্যদীয় অসৎ পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ তোমার জীবদ্দশায় ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করি, তাহা হইলে তোমাকে আধিবেদনিকস্বরূপ এক সহস্র টাকা দিব। আর যদি আমি পুনরায় বিবাহ করাতে তুমি অসন্তুষ্ট বা অন্যবিধ অন্যায় আচরণ দর্শনে বিরক্ত হইয়া আমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে। তোমার গ্রাসাচ্ছাদনাদি ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতি মাসের আরম্ভে ১০৲ টাকা করিয়া দিব। ...আমি অবর্ত্তমানে তুমি ও তোমার পুত্রকন্যারা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে আমার পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত যাবতীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আর যদি আমি তোমাকে বা তোমার পুত্রকন্যাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনিয়োগ পত্রাদির দ্বারাই আমার বিষয়ের অন্যকোন ব্যবস্থা করি, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দমনে এই একরারপত্র লিখিয়া দিলাম।

একটাকার স্ট্যাম্প কাগজে এই চুক্তিপত্র লেখা হত এবং তাতে চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর থাকত। বিধবাবিবাহ আইনপাশের সময়

রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্ররা, এবং কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও তাঁর আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীরা বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা যে কতখানি তাঁদের দূরদর্শিতার পরিচায়ক তা বিদ্যাসাগর নিজেও মনে হয় বিধবাবিবাহের অভিজ্ঞতা থেকে পরে বুঝতে পেরেছিলেন। বিধবাবিবাহের সাফল্যের জন্য যে অঙ্গীকারপত্র রচনা করতে তিনি নিজে বাধ্য হয়েছিলেন, ইয়ংবেঙ্গল দলের প্রস্তাবিত রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে, অথবা ১৮৭২ সালের ৩ আইনের (Civil Marriage Act) সঙ্গে, তার মূল ভাবগত বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। এমন কি, স্বামীর আচরণে অসন্তুষ্ট হলে বিবাহিতা স্ত্রী 'স্থানান্তরে' থাকতে পারবে, তাঁর রচিত চুক্তিপত্রের এই উক্তির মধ্যে 'বিবাহবিচ্ছেদের' (Divorce) পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে দেখা যায়। বিবাহের রেজিস্ট্রেশনে বা লিখিত চুক্তিবদ্ধতায় তাঁর কোন আপত্তি ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, হিন্দুশাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠানটিকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে, বিবাহবন্ধনকে আধুনিক চুক্তির শর্তে আবদ্ধ করা। তিনি পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা পর্যন্ত বিধবাবিবাহের সামাজিক সার্থকতা বিশেষ থাকবে না, এবং বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে কাপুরুষ প্রবঞ্চকরা বহুবিবাহ করবেন। 'সিবিল ম্যারেজ অ্যাক্টে' বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছিল বলে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন, এবং সেকথা অনেকের কাছে প্রকাশও করেছিলেন।[১২] শেষজীবনে, ৩ আইন সংশোধন করে হিন্দু বিধবাবিবাহকে তার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর নিজের আর কোন কর্মক্ষমতা ছিল না, রোগশয্যায় শুয়ে তিনি মৃত্যুর দিন গুণছিলেন। তবু এই সময় তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ৩ আইন সংশোধন করে ব্রাহ্মবিবাহের সঙ্গে হিন্দু-বিবাহেরও দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় করবার জন্য এবং বহুবিবাহের বদলে হিন্দুসমাজে একবিবাহের বিধান প্রবর্তনের জন্য। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা তাঁর জীবদ্দশায়, এবং তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও পূর্ণ হয়নি। সাম্প্রতিক 'হিন্দুকোড আইনে' তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে বলা চলে।

পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন : "বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।" একথা যে কতখানি সত্য তা বিদ্যাসাগরের জীবন পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। সত্যই বিধবাবিবাহকে তিনি তাঁর জীবনের 'সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম' বলে মনে করতেন এবং তার জন্য শেষ পর্যন্ত 'সর্ব্বস্বান্তও' হয়েছিলেন। আবশ্যক হলে 'প্রাণান্ত স্বীকারেও' যে তিনি 'পরাঙ্মুখ' ছিলেন না তা তাঁর বিধবাবিবাহের পদ্ধতি সংস্কারের শেষ চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়। বহুবিবাহপ্রথা রহিত না হলে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নৈতিক কর্তব্যবোধের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধ এদেশের লোকের মনে না জাগলে, কেবল আইনের জোরে যে বিধবাবিবাহ সার্থক হবে না, তা তিনি জীবনসন্ধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকারী তরুণ সমাজকর্মীদের অনুরোধ করেছিলেন, এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করতে।

৯ সমাজসংস্কার : বহুবিবাহ

দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত যে-কোন সামাজিক প্রথার মূল উপড়ে ফেলা যে কত শক্ত, তা সংস্কারকর্মীরা তাঁদের সমাজ-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, যে-কোন জাতির সংস্কৃতি নানারকমের সামাজিক প্রথার একটি বিশিষ্ট সন্নিবেশ বা 'প্যাটার্ন' ছাড়া আর কিছু নয়। সামাজিক প্রথার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কের গভীরতার কথা উল্লেখ করে একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন : [১]

> A culture is always an organization of customs. A custom is habit (i. e. a learned reaction) which is socially learned, socially shared, and socially transmitted.

প্রথা মাত্রই বদ্ধমূল, এবং মনের সুগভীর স্তর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত। অধিকাংশ প্রথাই দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে এইজন্য যে, সেই প্রথানুগত জনগোষ্ঠীর ধারণা, প্রথাপালনের উপর তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত কল্যাণ নির্ভরশীল। কল্যাণ-বিশ্বাসের উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের প্রথাকে বিজ্ঞানীরা 'more' বলেন। আমাদের সমাজে বৈধব্যপ্রথা, কৌলীন্য-প্রথা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহপ্রথা ইত্যাদিকে এই সংজ্ঞানুসারে 'more'

শ্রেণীর প্রথা বলা যায়। এই প্রথা সহজে জনমানস থেকে উচ্ছেদ করা যায় না। শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ও নৈতিক আন্দোলনের উপর নির্ভর করে এই সব প্রথার ক্রমবিলোপ প্রত্যাশা করলে, তা অল্পকালের মধ্যে সফল হবারও সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণত তার সাফল্য দীর্ঘকালসাপেক্ষ হয়। কিন্তু সেই প্রথার আচরণের ফলে সমাজের যদি দ্রুত অবনতি হতে থাকে, তা হলে কেবল সাধারণের শুভবুদ্ধির ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করে নিশ্চয় কালক্ষেপ করা যায় না। সেক্ষেত্রে সেই প্রথার সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের জন্য বিদ্যাসাগর তাই রাষ্ট্রীয় বিধানের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন। যাঁরা সামাজিক প্রথায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় বলে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের নির্ঝঞ্ঝাট মন্থরনীতিতে বিদ্যাসাগর কোন-দিন সায় দেননি। সমাজের সমস্ত শরীর যে-সব প্রথার বিষে জর্জরিত হয়ে ওঠে, সে-সব প্রথাকে, অস্ত্রোপচারের মতন, রাষ্ট্রীয় বিধানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্মূল করার প্রয়োজন হয়। এই ছিল বিদ্যাসাগরের যুক্তি। বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের জন্য এই কারণে তিনি প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে তিনি বহুবিবাহপ্রথা রহিত করার জন্য ভারত-সরকারের কাছে আইন-প্রণয়নের আবশ্যকতা জানিয়ে আবেদন করেছিলেন। পরে একাধিকবার আবেদন ও আন্দোলন করেছেন, কিন্তু বহুবিবাহের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তাঁর সব আবেদন ও আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে।

বহুবিবাহপ্রথা-নিবারণ আন্দোলনের ইতিহাস বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহু-বিবাহ পুস্তকের' (১৮৭১) 'বিজ্ঞাপনে' সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সভা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়।" ১৮৫৪, ১৫ ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরের ভবনে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি ছিলেন, এবং সম্পাদক ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। এই

সভার পক্ষ থেকেই কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহপ্রথা নিবারণের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম একটি আবেদনপত্র পাঠান।[২] সরকারী আইন-প্রণয়নের দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা-নিবারণ আন্দোলনের সূত্রপাত এই সময় থেকে হয়। কিন্তু তার অনেক আগে দেখা যায়, পত্রপত্রিকার আলোচনার ভিতর দিয়ে বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রধানত, ১৮৪২ সালে প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকাই এই চেষ্টা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক।[৩] মনে হয়, তাঁরই উদ্যোগে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এই জনমত গঠনের চেষ্টা হয়েছিল।

কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের পক্ষে সনাতনপন্থীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা কুলীনদের সম্বোধন করে লেখেন :[৪]

> হে কুলীন ভ্রাতাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধিপূর্ব্বক আপনাদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্ম্মের আস্বাদবশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। যদি বলেন বল্লালসেন এই রীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, যে বল্লালসেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন, অতএব তাঁহার মতের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি এবং পরামর্শকে অবহেলা করা কি শ্রেয়ঃ বোধ হইতে পারে? অবশেষে আপনারদিগকে এক অনুরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভকর্ম্মে যাত্রাকলীন সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে একবার ঈষৎ কটাক্ষপূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন, যে অপর দ্বারে কি আশ্চর্য্য পাপের নৃত্য হইতেছে।

এই রচনার মধ্যে যে কঠোর যুক্তিবাদীর (Rationalist) স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, তা অক্ষয়কুমার দত্তের ছাড়া আর অন্য কারও বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরও তাঁর 'বহুবিবাহ' পুস্তকে বল্লালসেনের কুলকৌলীন্য

প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার এখানে প্রথাটিকে বিচার করেছেন বিশুদ্ধ যুক্তির (pure reason) দিক দিয়ে। তিনি কুলীনদের বলেছেন যে যুক্তি ও শাস্ত্র দুই-ই বহুবিবাহবিরোধী এবং বল্লালসেন যে-কোন সাধারণ মানুষের মতন "একজন ভ্রমশীল মনুষ্য" ছিলেন। সুতরাং যুক্তি ও বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বল্লালের পশ্চাদ্ধাবন করা কুলীনদের পক্ষে অর্থহীন।

এর পর 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।[৫] অনেকে কৌলীন্যপ্রথার বিষময় সামাজিক ফলাফল সম্বন্ধে পত্র লেখেন। অধিকাংশ পত্রলেখকই পল্লীবাসী। একজন লেখেন: "কুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধ করি বঙ্গদেশের ব্যক্তি মাত্রেরি বিদিত আছেঁ। যে অবধি এই ঘৃণিত কার্য্যের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষ্কর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্ব্বদাই নগর মধ্যে বসতি করেন, পল্লীগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না, গ্রাম্য সমাজে যাঁহারা কুলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাহারদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয় তাঁহারাই বল্লালসেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলীন ভার্য্যাগণের পরিত্রাণার্থ মহাশয়কে যত্নশীল দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। এইক্ষণে নিতান্ত মনে প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর মহাশয়কে অচিরাৎ কৃতকার্য্য করুন।" পত্রিকার এই সংখ্যায় 'অধিবেদন' নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'বিদ্যাদর্শন' লেখেন:

> কোন দেশীয় কুপ্রথার নিষেধ, এক বিদ্যার অনুশীলন অপর রাজার শাসন দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার মধ্যে জ্ঞানের উপদেশ অনেক বিষয়ে নিষ্ফল হয়, এবং অধিককালের প্রয়োজন করে, যেহেতু এক দেশীয় সমুদয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কোন কুসংস্কারের মোচন করিতে হইলে তৎস্থানের প্রত্যেক বা প্রায় সকল লোকের সদ্বিদ্যা আবশ্যক হয়, যাহা সুসিদ্ধ করা অতি কঠিন হয়, এবং বহুদিনের অপেক্ষা করে। এ প্রযুক্ত সুশীল রাজারা রাজ্য মধ্যে কুকর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সহ্য করিতে না

> পারিয়া রাজনিয়মের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আমরা সকল অপেক্ষা শেষোক্ত উপায়কে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করিলাম, এবং শাসনকর্ত্তাদিগকে যুক্তির সহিত অনুরোধ করিতে চেষ্টিত হইলাম।

কোন সামাজিক প্রথা (প্রধানত কুপ্রথা) যখন দৃঢ়মূল Institution-এ পরিণত হয়, এবং যখন তার বিলুপ্তি একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে, তখন যে রাজনিয়মের দ্বারাই তার উচ্ছেদসাধন প্রয়োজন হয়, একথা আমরা আগে বলেছি। সাধারণের শুভবুদ্ধির ক্রমোন্মেষের উপর নির্ভর করে, সেই কুপ্রথাজনিত সামাজিক অকল্যাণ ও অবনতির অবসান হবে দূর ভবিষ্যতে একদিন, একথা ভেবে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। কোন দেশের ও কোন সমাজের সংস্কারকেরা (Reformers) সেই আশায় আশ্বস্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকেননি। বড় বড় সমাজসংস্কারকর্ম রাজনিয়মের দ্বারাই সাধিত হয়েছে দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইজন্যই আগাগোড়া রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা তাঁর সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। বিধবা-বিবাহের মতন বহুবিবাহ নিবারণের জন্য চেষ্টা করতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু ১৮৫৫ সাল থেকে এ-চেষ্টা নিয়মিতভাবে আরম্ভ হবার আগে, ১৮৪২ সালে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার এই আন্দোলন ও আলোচনা উল্লেখযোগ্য। বহুবিবাহ-নিবারণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়নের এবং সরকারী হস্তক্ষেপের আবশ্যকতার কথা তাঁরাই প্রথম প্রচার করেন। বিদ্যাসাগরের সমদর্শী ও অন্যতম সহযোগী অক্ষয়কুমার দত্তই মনে হয় ১৮৪২এর এই বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলনের প্রধান পরিকল্পক ছিলেন।

১৮৫৫ সালে যে-'সুহৃদ সমিতির' পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহ-নিবারণের জন্য ভারত-সরকারের কাছে প্রথম আবেদন করেন, সেই সমিতিরও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে 'সুহৃদ সমিতি' তাঁদের আবেদনপত্র পাঠান, এবং ঐ বছরের শেষদিকে (১৮৫৫, ২৭ ডিসেম্বর) বিদ্যাসাগরও ভারত-সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানান। বিদ্যাসাগরের এই আবেদনপত্রে বর্ধমানের মহারাজা একজন অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এই আবেদনপত্রের পরে

প্রায় ১২৭ খানি আবেদনপত্র, কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ, বাংলাদেশ থেকে, এবং একখানি আবেদনপত্র বারাণসী থেকে ভারত-সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। ১৮৫৭, ৭ ফেব্রুয়ারি জে. পি. গ্র্যাণ্ট এ বিষয়ে একটি বিল শীঘ্রই খসড়া করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। রমাপ্রসাদ রায়, গ্র্যাণ্টের সহযোগিতায়, একটি বিল খসড়া করেন, কিন্তু বিধবাবিবাহ আইন এবং সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য এই সময় তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এই বিষয় উল্লেখ করে বাংলা-সরকার পরে ভারত-সরকারের কাছে লেখেন :[৬]

> 3. This petition of the Maharajah's...was followed by no less than 127 others of the same tenor, very numerously signed, from all parts of Bengal, and one from Beneras. These, together with one petition from certain inhabitants of Calcutta and its vicinity, in defence of Hindu Polygamy (রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রতিবাদ-পত্র)...were all ordered by the Council to be printed; and, on the 7th February 1857, Mr. (now Sir J. P.) Grant, then a Member of the Supreme Government, promised very shortly to introduce a Bill on the Subject.
>
> 4. It is known that a Draft Bill was prepared by the Late Baboo Ramaprosad Roy, in communication with Sir J. P. Grant, and that it was about to be introduced into the Council, when the Mutiny of the Bengal Native Army, and the events which followed, put a stop for a time to further action in the matter. Endeavour has been made to obtain a copy of Baboo Ramaprosad's Bill, but without success.

রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহন রায়ের পুত্র) বহুবিবাহ-নিবর্তক আইনের জন্য যে বিলটি রচনা করেছিলেন, তার কোন 'কপি' পাওয়া যায়নি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বহুবিবাহ' পুস্তকে রমাপ্রসাদ রায়ের এই প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : "লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে এই কুৎসিত প্রথার নিবারণবিষয়ে যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহসহকারে অশেষ প্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়"। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের গোলযোগের মধ্যে বহুবিবাহের আন্দোলন সাময়িক-ভাবে কিছুকালের জন্য চাপা পড়ে যায়। ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ মল্লিক, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক এবং আরও প্রায় ১৫৮০ জন হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারত-সরকারের কাছে বহুবিবাহ-নিবারণ আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনপত্রে তাঁরা লেখেন :[৭]

> Your Memorialists have ample grounds for believing that the almost unanimous feeling of the Native community is against an usage which has destroyed the domestic happiness of Hindoo women to a far greater extent than the doom of perpetual widowhood...
>
> Your Memorialists, therefore, are of opinion that morality and enlightened policy...equally demand an abrogation by law of the rite of polygamy, and for this your Memorialists most earnestly pray.

বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ' পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' ১৮৬৩ সালের এই আবেদনের কথা উল্লেখ করেননি। রমাপ্রসাদ রায়ের চেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন : "ব্যবস্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু...সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা, বিদ্রোহনিবারণবিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।" এই সময় বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বহুবিবাহ নিবারণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ও উদ্যোগী হন, এবং বড়লাট এলগিনের কাছে কৌন্সিলে

উপস্থিত করবার জন্য এবিষয়ে একটি খসড়া-বিল পেশ করেন— "to regulate the plurality of marriages between Hindoos in British India." এই খসড়া-বিলটি (ইংরেজী) বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহু-বিবাহ' পুস্তকের 'পরিশিষ্টে' মুদ্রিত করেছেন।

১৮৬৬, ১ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় ও অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র বাংলার ছোট-লাটের কাছে পাঠানো হয়। এই আবেদনপত্রের শেষে লেখা হয়:[৮] "It is the fervent hope and prayer of your Petitioners that, before your Honour laid down the responsibilities of your high Office, Your Honour might signalise the close of your long and successful career by emancipating the females of Bengal from the pains, cruelties and attendant crimes of the debasing custom of polygamy." ১ ফেব্রুয়ারি আবেদনপত্র পাঠানোর পর, ১৯ মার্চ, সোমবার, বিকেল পাঁচটায় ছোটলাট সিসিল বিডনের কাছে তাঁরা ডেপুটেশনে উপস্থিত হন। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, সারদাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মল্লিক, রাজেন্দ্র দত্ত, নরসিংহ দত্ত, কালিদাস দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখার্জি, দ্বারকানাথ মিত্র, দ্বারকানাথ মল্লিক, ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাচরণ সরকার, দেবেন্দ্র মল্লিক, দুর্গাচরণ লাহা, রমানাথ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল, মহেশচন্দ্র চন্দ্র, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল আবেদনপত্রটি পাঠ করেন। বর্ধমানের মহারাজা আর-একটি আবেদনপত্র পাঠান, রাজা সত্যশরণ সেটিও ছোটলাটের হাতে দেন। ছোটলাট সিসিল বিডন ডেপুটেশনের উত্তরে যা বলেন তার মর্ম এই:

রাজা, সানন্দে আমি আপনাদের আবেদনপত্র গ্রহণ করছি। আপনারা সমাজের সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার কাছে আজ আপনারা যে আবেদন নিয়ে এসেছেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বহু-

বিবাহের মতন একটি সামাজিক কুপ্রথাকে কোন আইন পাশ করে উচ্ছেদ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমি সাধ্য মতন চেষ্টা করব। এই কুপ্রথা প্রচলিত থাকার জন্য, সমাজের দুর্নীতি ও ব্যভিচার দিন দিন বাড়ছে, এবং তা নিবারণ করার প্রয়োজনীয়তাও আপনাদের হিন্দু-সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা বোধ করছেন। পরলোকগত রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় যখন এই বিষয় নিয়ে প্রবল আন্দোলন করেছিলেন, তখন থেকেই আমি এই বহুবিবাহের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করছি। ১৮৫৭, ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য প্রচুর আবেদনপত্র বাংলাদেশ থেকে পৌছয় তখন স্যার জন গ্র্যাণ্ট শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিপাহীবিদ্রোহের গোলযোগের মধ্যে তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তিন বছর আগে বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ এ বিষয়ে একটি বিল রচনা করে বড়লাটের কৌন্সিলে পেশ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আইন সম্বন্ধে জনমতের প্রকাশ আরও অনেক বেশী ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে বড়লাট লর্ড এলগিন তখন বিলটি পেশ করতে অনুমতি দেননি। আমি এই সামাজিক প্রথা সংস্কারের জন্য পূর্বেও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি. এবং এখন আবার চেষ্টা করব বলে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

১৮৬৬, ৫ এপ্রিল বাংলা-সরকার ভারত-সরকারকে বহুবিবাহ-নিবর্তক আইন-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে পত্র লেখেন। এই পত্রে বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করে, বাংলা-সরকার যা নিবেদন করেন তার মর্ম এই :[১]

পূর্বে রাজা দেবনারায়ণ সিংহ যে আইনের খসড়া করেছিলেন তা সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু সমস্যাটা সারা-ভারতের, না প্রধানত বাংলাদেশের, তাই নিয়ে মতভেদ হওয়াতে সেই সময় বিলটি উত্থাপন করা হয়নি। যদিও এই ধরনের একটি সামাজিক প্রথা সংক্রান্ত

আইন কেবল একটি মাত্র প্রদেশের জন্য পাশ করার অনেক অসুবিধা আছে, তাহলেও বাংলাদেশে এই কুপ্রথার আধিপত্য এত বেশী যে কেবল বাংলার জন্য ভারত-সরকারের কিছু করা কর্তব্য বলে মনে হয়—"...it seems far better that the practice of unlimited Polygamy should at once be restricted in Bengal, where it prevails to an extent unknown elsewhere..." ভারত-সরকারের কাছে এইজন্য বাংলা-সরকার বঙ্গীয় কৌন্সিলের আগামী অধিবেশনে এই বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করার অনুমতি চাইছেন।

দুঃখের বিষয়, ভারত-সরকার বাংলা-সরকারের এই আবেদন গ্রাহ্য করেননি। বাংলা-সরকারের পত্রের উত্তরে ভারত-সরকার (১৮৬৬, ৮ আগস্ট) যা লেখেন তার মর্ম এই :[১০]

ভারত-সরকার একথা স্বীকার করেন যে বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বহুবিবাহের স্বেচ্ছাচারিতা যে-কোন উপায়ে বন্ধ করতে চান এবং তাঁদের এই সদিচ্ছার প্রতি ভারত-সরকারের সহানুভূতিও আছে। কিন্তু বাংলাদেশে বহুবিবাহপ্রথার আধিপত্য বেশী হওয়া সত্ত্বেও, ভারত-সরকার মনে করেন না যে সেখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ, এমনকি শিক্ষিতসমাজের অধিকাংশ লোকও, রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ সমর্থন করেন। বহুবিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে বাংলাদেশের আবেদনপত্রগুলি পর্যালোচনা করে ভারত-সরকারের এই কথাই মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে বহুবিবাহপ্রথা ভারতের একটি সামাজিক ও ধর্মীয় 'ইনস্টিটিউশন', এবং এখনও তাতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার সময় আসেনি। বাংলাদেশেও এবিষয়ে উভয়পক্ষের যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে, স্থিরভাবে বিচার করে দেখলে তা থেকে মনে হয় না যে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যেও অধিকাংশই এ-প্রথার বিরোধী—"It must be remembered that polygamy as it exists in India, is a social and religious institution...and Governor-General

বেথুন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আন্দোলনে লোকসঙ্গীতের দান ছিল যথেষ্ট। রাসবিহারীবাবু নিজে বেশ ভাল পদ্য ও গান রচনা করতে পারতেন। তদানীন্তন ছোটলাট ক্যাম্পবেল সাহেবকে সম্বোধন করে তিনি কুলীনকন্যাদের বেদনা-বিষয়ে এই সঙ্গীতটি রচনা করেন :

(দাশরথীর সুর, তাল ঠেস কাওয়ালী)

কেম্বল ! কেন তোমার হল এমন উল্টো মত।
এ ভারত রসাতলের পথ···
নূতন নিয়ম তোমার সকল নূতন মত,
নাহি মান কার কথা, বল নূতন নূতন কথা,
হিন্দুর মাথা খেয়ে নাকি উঠাও রথ ;
আসল পথে নাইকো তোমার কিছুই মত,
(দেখ) বিদ্যাসাগর বিচার করে,
রাসবিহারী ঘুরে মরে,
আমাদের যে নয়ন ঝরে, তার কি পথ ?

রাসবিহারীর সঙ্গীতরচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকা নর্মাল স্কুলের সংস্কৃতের অধ্যাপক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্গীতটি রচনা করেন :

(জীব সাজ সমরে, এই গানের সুর)

মনোদুঃখ কব কায়,
দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়।
পিতা কপালদোষে কাপালিক প্রায়,
লিপ্ত আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়,
আজন্ম পালিয়ে এসব কুলমেয়ে
বলি দিবে কুলময়ীর পায়।

সঙ্গীতের বিষয়বস্তু কুলীন কন্যাদের খেদোক্তি। ঢাকার বনগ্রামনিবাসী রামচন্দ্র চক্রবর্তী আর-একটি সঙ্গীত রচনা করেন। বিষয়বস্তু একই, কুলীন কন্যাদের মনোবেদনা।

কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি চেলাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাই না গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরষাণ কর গো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি,
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।

প্রথমে এই তিনটি গান স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়, এবং চারিদিকে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। রাসবিহারী লিখেছেন: "এই তিনটি গানই 'ঢাকাপ্রকাশে' প্রকাশ করাইলাম। কেম্বলের গানটি অতি অল্পকাল মধ্যেই নানাস্থানে ব্যাপ্ত হওয়াতে হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদকবাবু যাহাতে সামাজিক লোকসকল লজ্জিত হয় এরূপ আরও কয়েকটি গান রচনা করার নিমিত্ত আমাকে স্বকীয় পত্রিকায় অনুরোধ করেন।" এরপর তিনি আরও কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। যেমন:

কোন্ পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে।
দিলেম্ যৌবন রতন, কাকের মতন,
বুড় মামার গলে তুলে।
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দন্ত নড়ে,
করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধীরে।
এমন অস্থিসারা আধামরা,
দেখে আমার অঙ্গ জ্বলে।
যে আমায় বাছা বলে, স্নেহে নিয়েছে কোলে
তার কোলে প্রেমের ডালি দেই কি বলে।
এমন মেল বেন্ধেছে যে দেবীবর,
খাঙ্গরা মারি তার কপালে।

ঢাকা বিক্রমপুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাসবিহারীবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা এই গানগুলি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ ও লোকমুখে

প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। গানগুলি অল্পদিনের মধ্যেই খুব লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। কেবল পুরুষদের মুখে নয়, মেয়েদের মুখে মুখেও গানগুলি রটনা হতে থাকল। গ্রামের মেয়েরা বিবাহের সময় 'অশ্লীল' গান গাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, বহুবিবাহ-বিষয়ে এই গানগুলি গাইতে আরম্ভ করেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন পূর্ববঙ্গে প্রায় লোকসঙ্গীতের আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের সামাজিক ফলাফলও ক্রমেই ভাল হতে থাকে। রাসবিহারী তাঁর আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে 'জীবনবৃত্তান্তে' লিখেছেন : "অনন্তর আমি বিক্রমপুর ও বাকরগঞ্জের প্রধান প্রধান পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া উক্ত গানগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলাম এবং সর্ব্বসাধারণেই গানগুলি শিখিয়া সর্ব্বদা ঘাটে মাঠে গাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রমণীগণ দ্বিতীয় বিবাহাদিতে অশ্লীল গান পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত উক্ত গানগুলি গাইতে লাগিল। সামাজিক লোকেরাও শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সকলের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। আমার চেষ্টার পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থা হইলেই এই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহুবিবাহকারী পাত্রে কন্যা প্রদান করিয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ করিতেন। এখন অনেকেই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া নামমাত্র কুলীনে সৎপাত্র পাইলেও কন্যা প্রদান করিতে লাগিলেন।" এই সামাজিক সুফলটুকু লাভের জন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যে কতখানি সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন তা স্থানীয় 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকার এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় :[২১]

বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, বোধ হয় না ঢাকাপ্রকাশের গ্রাহকমণ্ডলীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বহুদোষাকর অধিবেদন প্রথার নিরাকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই, তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহুবিবাহের বহুদোষদ্যোতক পুস্তক ও

গান রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন, অসহনীয় শীতবাতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দারিদ্র্যতা, পরিবার-বর্গের অন্নাচ্ছাদনঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেছেন না। রাসবিহারীর ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্ত্বের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা ইঁহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, ইনি উল্লিখিত বিষয়টী তাঁহার জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইঁহাকে উক্ত বিষয়ের চিন্তা আলোচনা অথবা কোন না কোনরূপে উদ্যোগচেষ্টাশূন্য থাকিতে দেখা যায় না।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের যে খুব অনুরাগী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। দূর থেকে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে কেবল আদর্শেরই সংযোগ ছিল তা নয়, প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগও ছিল। বহুবিবাহ-নিবারণ-আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ-পরামর্শের জন্য রাসবিহারী মধ্যে মধ্যে কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসতেন। তিনি নিজে যখন কৌলীন্যপ্রথা ভেঙে সর্বদ্বারী বিবাহ করতে প্রস্তুত হন, তখন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সে-বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাহায্য চান। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় ঢাকা অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছে রাসবিহারীর বিবাহকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। ভাওয়ালের রাজার কাছে লিখিত তাঁর পত্রখানি এই:

নানা গুণালঙ্কৃত
শ্রীযুত রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর মহাশয়
মদনুগ্রাহকেষু
জয়দেবপুর, ভাওয়াল, ঢাকা

বিনয়বহুমাননমস্কারপুরঃসরং নিবেদনমিদম্ তারপাশানিবাসী শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট

শুনিলাম কুলীনদিগের মধ্যে সার্ব্বদ্বারিক বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি কহিতেছেন এ বিষয়ে মহাশয়ের সম্পূর্ণ যত্ন, উৎসাহ ও মনোযোগ আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার বিষয়ে মহাশয় যে সবিশেষ যত্ন করিবেন সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্য্যসমাধাকালে আমি উপস্থিত থাকি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি, কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক পত্র না পাইলে, আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমি আর ১০।১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই যাইবার পূর্ব্বে মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হই।

আমি আষাঢ় মাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছি। মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়, কিমধিকমিতি ১৯এ পৌষ ১২৮২ সাল।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

•

জাজিপাড়ানিবাসী তারাপ্রসন্ন রায়কে, মাহুতটুলীনিবাসী রাসবিহারী রায়কে, কালীপাড়ানিবাসী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই পত্রের একটি করে প্রতিলিপি পাঠানো হয়। ১২৮২ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ৫৫ বছর উত্তীর্ণ হয়ে বেশ প্রৌঢ় হয়েছিলেন। তাছাড়া অসুখবিসুখেও তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সেই জীর্ণ অস্থিসার দেহের মধ্যে যে কতখানি উৎসাহ ও কর্মশক্তি সংরক্ষিত ছিল, এবং তা যে কত সহজে সমাজসংস্কারের কোন নতুন উদ্যমের কথা শুনলে উদ্বেল হয়ে উঠত, তা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনের এই বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায়। তাঁর দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হলেও, মন ক্লান্ত হয়নি। তাই তিনি রুগ্ন দেহ নিয়েও

৫৫ বছর বয়সে কলকাতা থেকে ঢাকা গিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বদ্বারী বিবাহের পুনরুদ্দ্যাপন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলন ও সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি।

বহুবিবাহ-নিবারণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সরকারী আইন প্রণয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তিনি অনেকখানি সার্থক হয়েছিলেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাঁরা আইনের দ্বারা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁরা তো বটেই, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে যাঁরা বাদানুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে, কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সুস্থ সামাজিক জনমতও গড়ে উঠেছিল। যতটুকু গড়ে উঠেছিল ততটুকুই বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন সার্থক হয়েছিল বলা যায়।

১০ | সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত : ১৮৫০—১৮৯০

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের যে বিবরণ আমরা দিয়েছি, তা প্রায় ১৮৫০-৫১ থেকে ১৮৭০-৭২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম দশ বছর (১৮৫০-৬০) বিদ্যাসাগরই ছিলেন বাংলার নতুন সমাজের প্রধান কর্ণধার। তাঁর শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ এই সময় বাঙালী সমাজকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করে। সেই তরঙ্গাঘাতে প্রাচীন সমাজের জীর্ণ কুসংস্কারের স্তম্ভগুলি একে-একে ভাঙতে থাকে, এবং তার প্রতিশব্দে সমগ্র সমাজ সচকিত হয়ে ওঠে। ১৮৬০ সালের পরেও সমাজে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই সময় থেকে প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের ধারায় নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হল।

১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে নবরূপান্তর ঘটল। কেশবচন্দ্র সেন হলেন তার প্রধান রূপকার। বিদ্যাসাগর তখন এখানে-ওখানে বিধবাবিবাহের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সাহায্য করছেন, এবং বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। ১৮৭০-৭২ থেকে ১৮৮৮-৯০ পর্যন্ত পরবর্তী কুড়ি বছরের ইতিহাসের ধারা নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করে। একেবারে নতুন খাত নয় অবশ্য, এবং সমাজের ইতিহাসে এরকম অপ্রত্যাশিত খাতবদল ঘটে না কখনও। নবযুগের

বাংলার সমাজ-জীবনের স্রোত দুটি স্বতন্ত্রমুখী খাতে, উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বয়ে চলেছিল। একটি সম্মুখগামী উন্নতিশীল ধারা, আর-একটি পশ্চাদ্‌গামী রক্ষণশীল ধারা। একথা মনে করা ভুল যে এই দুটি ধারার মধ্যে উন্নতিশীল ধারা কোনসময় বেশী শক্তিশালী ছিল। তা কোন সময়েই ছিল না। রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর পরবর্তীকালে, সাধারণ সমাজের দিক থেকে বিচার করলে, সব সময়েই রক্ষণশীল আন্দোলনই বেশী শক্তিশালী ছিল বলতে হয়। কিন্তু সমাজের নতুন চলৎশক্তি (new dynamics of society) যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁদের চলার গতি দেখেই সমাজের অগ্রগতি-পশ্চাদ্‌গতি বিচার করা হয়। নবযুগের সমাজের চলৎশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতেন শহরের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী। ১৮৭০-এর পর থেকে বাংলার এই নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর গড়ন ও রূপের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে, তাঁদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্বোধনকালে তাঁরা অত্যন্ত উগ্রভাবে ঐতিহ্যবাদী হয়ে ওঠেন। এই সব কারণেই এই সময় প্রাচীন আদর্শ ও ঐতিহ্যের পুনরুত্থান-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, এবং স্বভাবতঃই তা মধ্যে মধ্যে বাঁধ ভাঙার উপক্রম করে। এই সামাজিক তরঙ্গধারার বর্ণনা দেবার আগে সেইজন্য আমরা তার সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিটি বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

সামন্তযুগের ভাঙন এবং নতুন ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যযুগের অভ্যুদয় যখন হতে থাকে, তখন কাঁচামালের উৎপাদকদের সঙ্গে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রমে শ্রমবিভাগের ফলে বিচ্ছেদ ঘটে, নগরে-শহরে শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, এবং ক্রমে তার ফলে সমাজে একটি সুসংবদ্ধ মধ্যবর্তী জনস্তরের বিকাশ হতে থাকে। এই মধ্যবর্তী জনস্তরে ধীরে-ধীরে যখন নাগরিকতাবোধের বিকাশ হয়, তখন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারের চেতনাও তাঁদের মধ্যে জাগতে থাকে। তারপর সেকালের সামন্ত-সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ভেঙে গিয়ে যখন নতুন ধনতান্ত্রিক-সমাজ শ্রেণীবিন্যস্ত হতে থাকে, তখন এই 'মধ্যশ্রেণী' নানাস্তরের লোকের সংমিশ্রণে

ক্রমে বৃহৎ জটিল আকার ধারণ করে। বিখ্যাত সমাজবিদ্ অ্যালফ্রেড মিউসেল (Alfred Meusel) মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন :[১]

> The break up of the feudal economy, characterised by a growing division of labor as between the producer of raw materials and the small manufacturer and by the concentration of commercial and industrial enterprise in the towns, brought into existence a somewhat cohesive intermediate social and functional group *(Mittelstand).* This initial cohesiveness was intensified by the growth of a civic spirit, which gradually transformed the inhabitants of the towns into self-conscious burghers more or less united in their determination to secure legal privileges and rights and to bring to an end, ...the restrictions imposed by the feudal landowners.

তারপর, মিউসেল বলেছেন, গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পর্বান্তরের ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং তার বৈচিত্র্য ও জটিলতাও বাড়ে। বৈদেশিক পরাধীনতার জন্য, বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের যুগসম্মত স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু তার বিচ্ছিন্ন ও বিরোধ-বহুল অসমবিকাশের ধারার মধ্যেও সমাজজীবনে নবযুগের ঐতিহাসিক লক্ষণগুলি অধিকাংশই ফুটে উঠেছিল।

আঠার শতকের শেষপাদ থেকেই বাংলার প্রাচীন সমাজবিন্যাস ধীরে ধীরে বদলাতে আরম্ভ করেছিল, এবং উনিশ শতকের প্রথমপাদের মধ্যেই নবযুগের সমাজের শ্রেণীরূপায়ণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ তৎকালের সাহিত্য থেকে কিছু-কিছু পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সালে রচিত তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকে 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা' বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন :[২]

যাঁহারা প্রধান ২ কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদিপূর্ব্বক বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈলমর্দ্দন করিয়া থাকেন নানা প্রকার তৈল যাঁহার যাহাতে সুখানুভব হয় তিনি তাহাই মর্দ্দন করিয়া স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ব্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পাল্কী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন কর্ম্মানুযায়ি কাল বিবেচনাপূর্ব্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্ত-পাদাদি প্রক্ষালনানন্তর গঙ্গোদকস্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগানন্তর পুনর্ব্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে কেহ কোন কর্ম্মোপলক্ষে কেহ বা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।

দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাঁহারদিগের অনেক ঐ ধারা কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহ বা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয় ২ করিতে হয়, না করিলেও নয় পোড়া উদরের জ্বালা।

এই সকল কর্ম্মকারি বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা কহিলাম এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের কৃপাতে যাঁহার-দিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয় তাহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্ব্বক

মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি বা ছয় দণ্ড বেলা সত্ত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহ বা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।

এই বর্ণনার মধ্যে ভবানীচরণ কেবল সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের ইঙ্গিত করেননি, বিভিন্ন শ্রেণীর আচার-ব্যবহারেরও চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। * ১৮২৫ সালে রচিত তাঁর 'নববাবুবিলাস' পুস্তকে তিনি এই নতুন শ্রেণী-রূপায়ণের অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে বলেছেন:[৩] "ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জেষ্ঠ্যভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার···বেতনোপভুক হইয়া···সরদারী চৌকি-দারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া···কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···।" ভবানীচরণের এই বিশ্লেষণ অনেকটা সমজবিজ্ঞানসম্মত। বাংলাদেশে কলকাতা মহানগর নবযুগের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠল। যখন গড়ে উঠল তখন স্বর্ণকার কর্মকার প্রভৃতি অনেকে গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে যাত্রা করলেন, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। নতুন মহানগরে সর্দারি পোদ্দারি করেও উপার্জনের পথ খুলে গেল। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা করে (স্বয়ং রামমোহন রায়ই করতেন) এবং নতুন জমিদারী কিনে (রামমোহন রায়ও তা করেছেন) অনেকে প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেন। সর্বোচ্চ নতুন জমিদারশ্রেণী ছাড়া বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে তিনটি স্তর ক্রমে স্পষ্ট আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে। ভবানীচরণের বিবরণ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তের এই তিনটি স্তরেরই বিকাশের আভাস পাওয়া যায়। সমাজবিদ্‌রা

* এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় খণ্ডে' (৭৯-৮১ পৃষ্ঠায়) এবিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখানে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হল।—বি. ঘো.

এখন মধ্যবিত্তের এই তিনটি স্তরকে বলেন, 'Upper', 'Middle' ও 'Lower Middle-class'—উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত।

বাঙালী মধ্যবিত্তের সামাজিক রূপায়ণ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে 'বঙ্গদূত' পত্রিকা লেখেন :[৪]

> গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপীয় মহাশয়দিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।
>
> এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।

এত সুন্দর সামাজিক বিশ্লেষণ সমসাময়িক পত্রিকায় অত্যন্ত বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'বঙ্গদূত' বলেছেন ত্রিশ বছর আগেও যে-সব জমির দাম ছিল ১৫৲ টাকা, এখন তার দাম বেড়ে ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেক প্রসার ও উন্নতি হয়েছে। সেকালের কুলগত বৃত্তির বংশানুক্রমিক বন্ধন ছিন্ন করে অনেকে অবাধ বাণিজ্যের পথে যাত্রা করে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। সেকালের সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার অন্যতম মানদণ্ড ছিল কুল, জাতি বা বংশ। সেই কৌলিক মানদণ্ডের বদলে নতুন ধনতান্ত্রিক যুগে আর্থিক মানদণ্ডই বড় হয়ে উঠল, এবং সমাজে জাতি-উপজাতিগত স্তরবিন্যাস ভেঙে গিয়ে নতুন বিত্তগত শ্রেণীবিন্যাসের সূচনা হল। সেকালের সমাজ অচল স্তরবিন্যস্ত গড়নের জন্য স্থিতিশীল ছিল; নবযুগের সমাজ পরিবর্তনশীল শ্রেণীবিন্যস্ত গড়নের জন্য গতিশীল হল। জর্মান সমাজবিদ্ অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন বলেছেন :[৫]

> In the Middle Ages power belonged to him who owned the soil, the feudal lord; but now...he who knew how to exploit money and time fully could make himself the master of all things. Such are the new means to power of the Bourgeois. Money and time imply motion: 'there is no more apt symbol than money to show the dynamic character of this world. As soon as it lies idle it ceases to be money in the specific sense of the word...the function of money is to facilitate motion' (Simmel).

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় না হলেও, 'বঙ্গদূত' এই একই ভাবধারা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উৎপত্তির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মার্টিন বলেছেন: "Money, because it circulates, as landed property cannot, shows how everything became more mobile." 'বঙ্গদূত' লিখেছেন: "এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যে সকল উপকারোপযোগি

ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়।...অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্ত্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার...ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে।" টাকা যদি অচল অবস্থায় সিন্দুকে মজুত থাকে, তাহলে তার 'টাকাত্ব'ই থাকে না, বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী সিমেল একথা বলেছেন এবং একথা আধুনিক ধনবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। 'বঙ্গদূত'ও তাই বলেছেন। টাকার সঙ্গে সারমাটির তুলনা করে 'বঙ্গদূত' লিখেছেন যে সারমাটি যেমন এক-জায়গায় রাশীকৃত করে জমিয়ে রাখলে তাতে কোন উপকার হয় না, টাকাও তেমনি একজায়গায় মজুত করে রাখলে তাতে কোন 'ফলোদয় হয় না', কিন্তু 'বিস্তীর্ণ হইলেই' অর্থাৎ সচল হলেই ফল হয়। নিষ্ক্রিয় গচ্ছিত টাকা মূল উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগ করে সচল ও সক্রিয় করার জন্য 'বঙ্গদূত' এখানে পরোক্ষে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এদেশী গচ্ছিত মূলধন অর্থনৈতিক উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োগের পথে ইংরেজ শাসকরা অনেক অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন। তার জন্য ধনতন্ত্রের সুসঙ্গত ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়েছে বাংলাদেশে, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাংলার নবযুগোপযোগী সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ নবযুগের প্রকৃত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে উনিশ শতকে বিশেষ হয়নি বললেই চলে। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার এবং কর্মক্ষেত্রের (প্রধানত চাকরির) বৈচিত্র্যবৃদ্ধি ও ক্রমপ্রসারের ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। তাতেও, অর্থাৎ নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রমপ্রসারের ফলেও, বাংলার সমাজের সচলতা (social mobility) অনেক বেড়ে যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে এই সচলতা বাড়তে থাকে। এই সময়টাকে ডিরোজীয়ানদের যুগ বলা যায়। রামমোহনের যুগে মুষ্টিমেয় ধনিক অভিজাতগোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার চেয়ে পরবর্তী ডিরোজীয়ানদের বা ইয়ং-বেঙ্গলের যুগের সচলতা অনেক বেশী ছিল। কেবল উপার্জিত ধন নয়, বিদ্যাও তখন সামাজিক মর্যাদার নতুন মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডিরোজীয়ানদের

মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবারের সন্তান ছিলেন, এবং বিত্ত ছাড়াও তাঁদের সম্বল ছিল নবযুগের নতুন বিদ্যা, বিশেষ করে পাশ্চাত্যবিদ্যা। এই নতুন বিদ্বান ও বিত্তবান মধ্যবিত্তের চলার গতি খানিকটা উদ্দাম লক্ষ্যহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলেও, বাংলার সমাজের দীর্ঘস্থায়ী জড়তা, স্থবিরতা ও কূপমণ্ডূকতা ভাঙবার জন্য ইয়ংবেঙ্গলের এই বাধাবন্ধহীন বেগের ও প্রচণ্ড উদ্দামতার আঘাত কিছুটা প্রয়োজনও ছিল। একটা অনড় অচল জড় সমাজকে জঙ্গম করতে হলে তার রুদ্ধ দ্বারে আঘাতের উপর আঘাত করতে হয়। ইয়ংবেঙ্গল এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, শম্বুকগতি নিষ্ক্রিয় বাঙালী সমাজকে তাঁরা সক্রিয় ও বেগবান করে তুলেছিলেন।

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রসার হতে থাকে। এই সময় ডালহৌসি রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন করেন এবং আধুনিক ডাকবিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৩ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত রেলওয়ে-মিনিট রচনা করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে সহস্রাধিক মাইল রেলপথ তৈরি হয়ে যায় এবং প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী তাতে চলাচল করতে থাকে। ১৮৮৮-৮৯ সালের মধ্যে রেলপথ তৈরি হয় প্রায় ১৫,২৪৫ মাইল। হাণ্টার বলেছেন:[৬] "Lord Dalhousie seized the opportunity, afforded by the introduction of railways, to throw the country open to private enterprise and to English capital, in a degree before unknown, and with results which practically inaugurated a new industrial era in India." রেলওয়ে ও ডাক-তার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশের অন্তর্বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার হতে থাকে, এবং মানুষের চলাচল ও পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক বেড়ে যায়। ডালহৌসির আমলে 'পাবলিক ওআর্কস' বিভাগও পুনর্গঠিত হয়, এবং তার বাৎসরিক ব্যয় আগের আমলের ২৬০,০০০ পাউণ্ড-স্টার্লিং থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যেই প্রায় দশগুণ বেড়ে ২৫০,০০০০ পাউণ্ড-স্টার্লিং হয়।[৭] রাস্তা-ঘাট, খাল-নালা, সেতু, স্কুল-কলেজ, ডাকঘর, স্টেশান-বন্দর, আদালত ইত্যাদি এই সময় নির্মাণ করা হয়। ধনবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে

আমরা জানি, সাধারণ জনকল্যাণকর্মে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি হলে সমাজের লোকজনের বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত হবার সুযোগ বহুগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং ডালহৌসির আমলে আমাদের দেশে চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের (Salariat Middleclass) অতি দ্রুত কলেবরবৃদ্ধি হয়, এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্তের অধিকাংশ স্তরের অপ্রত্যাশিত আর্থিক উন্নতি হতে থাকে। শিক্ষার ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মধ্যবিত্তের বিকাশ তখন বাংলাদেশে যেমন হয়েছিল, সে-রকম আর ভারতের অন্য কোন প্রদেশে হয়নি। স্বভাবতঃই তাই বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী এই অর্থনৈতিক প্রসারণের যুগে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের বাঙালী মধ্যবিত্তের এই আর্থিক সচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও প্রবল সামাজিক সচলতার যুগের প্রতিভূ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সমাজের এই গতিবেগই প্রতিফলিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাসেও যুগান্তকারী সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সেখানেও এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান শহর-নগরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাধিকারবোধ ও সামাজিক চেতনা। ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান (G. M. Trevelyan) বলেছেন :[৮]

> In 1832 the nation had been made supreme and had been so defined as to include half the middle-class. In 1867 it was defined again so as to include the rest of the middle-class and the working-men of the towns. The immediate consequence, between 1868 and 1875, was a long list of reforms, including under the Liberals, Irish Church and Land Acts, popular education, army reform, the opening of the Civil Service and the Universities to free competition; under the Conservatives, sanitary and municipal legislation and new laws

আন্দোলনে লোকসঙ্গীতের দান ছিল যথেষ্ট। রাসবিহারীবাবু নিজে বেশ ভাল পদ্য ও গান রচনা করতে পারতেন। তদানীন্তন ছোটলাট ক্যাম্পবেল সাহেবকে সম্বোধন করে তিনি কুলীনকন্যাদের বেদনা-বিষয়ে এই সঙ্গীতটি রচনা করেন :

(দাশরথীর সুর, তাল ঠেস কাওয়ালী)

কেম্বল ! কেন তোমার হল এমন উল্টো মত।
এ ভারত রসাতলের পথ…
নূতন নিয়ম তোমার সকল নূতন মত,
নাহি মান কার কথা, বল নূতন নূতন কথা,
হিন্দুর মাথা খেয়ে নাকি উঠাও রথ ;
আসল পথে নাইকো তোমার কিছুই মত,
(দেখ) বিদ্যাসাগর বিচার করে,
রাসবিহারী ঘুরে মরে,
আমাদের যে নয়ন ঝরে, তার কি পথ ?

রাসবিহারীর সঙ্গীতরচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকা নর্মাল স্কুলের সংস্কৃতের অধ্যাপক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্গীতটি রচনা করেন :

(জীব সাজ সমরে, এই গানের সুর)

মনোদুঃখ কব কায়,
দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়।
পিতা কপালদোষে কাপালিক প্রায়,
লিপ্ত আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়,
আজন্ম পালিয়ে এসব কুলমেয়ে
বলি দিবে কুলময়ীর পায়।

সঙ্গীতের বিষয়বস্তু কুলীন কন্যাদের খেদোক্তি। ঢাকার বনগ্রামনিবাসী রামচন্দ্র চক্রবর্তী আর-একটি সঙ্গীত রচনা করেন। বিষয়বস্তু একই, কুলীন কন্যাদের মনোবেদনা।

কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি চেলাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাই না গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরষাণ কর গো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি,
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।

প্রথমে এই তিনটি গান স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়, এবং চারিদিকে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। রাসবিহারী লিখেছেন: "এই তিনটি গানই 'ঢাকাপ্রকাশে' প্রকাশ করাইলাম। কেম্বলের গানটি অতি অল্পকাল মধ্যেই নানাস্থানে ব্যাপ্ত হওয়াতে হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদকবাবু যাহাতে সামাজিক লোকসকল লজ্জিত হয় এরূপ আরও কয়েকটি গান রচনা করার নিমিত্ত আমাকে স্বকীয় পত্রিকায় অনুরোধ করেন।" এরপর তিনি আরও কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। যেমন:

কোন্ পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে।
দিলেম্ যৌবন রতন, কাকের মতন,
বুড় মামার গলে তুলে।
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দন্ত নড়ে,
করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধীরে।
এমন অস্থিসারা আধামরা,
দেখে আমার অঙ্গ জলে।
যে আমায় বাছা বলে, স্নেহে নিয়েছে কোলে
তার কোলে প্রেমের ডালি দেই কি বলে।
এমন মেল বেন্ধেছে যে দেবীবর,
খাঙ্গরা মারি তার কপালে।

ঢাকা বিক্রমপুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাসবিহারীবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা এই গানগুলি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ ও লোকমুখে

প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। গানগুলি অল্পদিনের মধ্যেই খুব লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। কেবল পুরুষদের মুখে নয়, মেয়েদের মুখে মুখেও গানগুলি রটনা হতে থাকল। গ্রামের মেয়েরা বিবাহের সময় 'অশ্লীল' গান গাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, বহুবিবাহ-বিষয়ে এই গানগুলি গাইতে আরম্ভ করেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন পূর্ববঙ্গে প্রায় লোকসঙ্গীতের আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের সামাজিক ফলাফলও ক্রমেই ভাল হতে থাকে। রাসবিহারী তাঁর আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে 'জীবনবৃত্তান্তে' লিখেছেন : "অনন্তর আমি বিক্রমপুর ও বাকরগঞ্জের প্রধান প্রধান পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া উক্ত গানগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলাম এবং সর্ব্বসাধারণেই গানগুলি শিখিয়া সর্ব্বদা ঘাটে মাঠে গাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রমণীগণ দ্বিতীয় বিবাহাদিতে অশ্লীল গান পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত উক্ত গানগুলি গাইতে লাগিল। সামাজিক লোকেরাও শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সকলের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। আমার চেষ্টার পূর্ব্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থা হইলেই এই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহুবিবাহকারী পাত্রে কন্যা প্রদান করিয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ করিতেন। এখন অনেকেই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া নামমাত্র কুলীনে সৎপাত্র পাইলেও কন্যা প্রদান করিতে লাগিলেন।" এই সামাজিক সুফলটুকু লাভের জন্য রাসবিহারী মুখোপ্যাধ্যায় যে কতখানি সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন তা স্থানীয় 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকার এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় :[২১]

> বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, বোধ হয় না ঢাকাপ্রকাশের গ্রাহকমণ্ডলীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বহুদোষাকর অধিবেদন প্রথার নিরাকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই, তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহুবিবাহের বহুদোষদ্যোতক পুস্তক ও

গান রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন, অসহনীয় শীতবাতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দারিদ্র্যতা, পরিবার-বর্গের অন্নাচ্ছাদনঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেছেন না। রাসবিহারীর ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্ত্বের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা ইঁহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, ইনি উল্লিখিত বিষয়টী তাঁহার জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইঁহাকে উক্ত বিষয়ের চিন্তা আলোচনা অথবা কোন না কোনরূপে উদ্যোগচেষ্টাশূন্য থাকিতে দেখা যায় না।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের যে খুব অনুরাগী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। দূর থেকে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে কেবল আদর্শেরই সংযোগ ছিল তা নয়, প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগও ছিল। বহুবিবাহ-নিবারণ-আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ-পরামর্শের জন্য রাসবিহারী মধ্যে মধ্যে কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসতেন। তিনি নিজে যখন কৌলীন্যপ্রথা ভেঙে সর্বদ্বারী বিবাহ করতে প্রস্তুত হন, তখন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সে-বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাহায্য চান। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় ঢাকা অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কাছে রাসবিহারীর বিবাহকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন। ভাওয়ালের রাজার কাছে লিখিত তাঁর পত্রখানি এই:

নানা গুণালঙ্কৃত
শ্রীযুত রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর মহাশয়
মদনুগ্রাহকেষু
জয়দেবপুর, ভাওয়াল, ঢাকা

বিনয়বহুমাননমস্কারপুরঃসরং নিবেদনমিদম্‌ তারপাশানিবাসী শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট

শুনিলাম কুলীনদিগের মধ্যে সার্ব্বত্রিক বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি কহিতেছেন এ বিষয়ে মহাশয়ের সম্পূর্ণ যত্ন, উৎসাহ ও মনোযোগ আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার বিষয়ে মহাশয় যে সবিশেষ যত্ন করিবেন সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্য্য-সমাধাকালে আমি উপস্থিত থাকি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি, কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক পত্র না পাইলে, আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমি আর ১০।১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই যাইবার পূর্ব্বে মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হই।

আমি আষাঢ় মাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছি। মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়, কিমধিকমিতি ১৯এ পৌষ ১২৮২ সাল।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

জাজিপাড়ানিবাসী তারাপ্রসন্ন রায়কে, মাহুতটুলীনিবাসী রাসবিহারী রায়কে, কালীপাড়ানিবাসী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই পত্রের একটি করে প্রতিলিপি পাঠানো হয়। ১২৮২ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ৫৫ বছর উত্তীর্ণ হয়ে বেশ প্রৌঢ় হয়েছিলেন। তাছাড়া অসুখবিসুখেও তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সেই জীর্ণ অস্থিসার দেহের মধ্যে যে কতখানি উৎসাহ ও কর্মশক্তি সংরক্ষিত ছিল, এবং তা যে কত সহজে সমাজসংস্কারের কোন নতুন উদ্যমের কথা শুনলে উদ্বেল হয়ে উঠত, তা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনের এই বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায়। তাঁর দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হলেও, মন ক্লান্ত হয়নি। তাই তিনি রুগ্ন দেহ নিয়েও

৫৫ বছর বয়সে কলকাতা থেকে ঢাকা গিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বদ্বারী বিবাহের পুনরুদ্‌যাপন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলন ও সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি।

বহুবিবাহ-নিবারণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সরকারী আইন প্রণয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তিনি অনেকখানি সার্থক হয়েছিলেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাঁরা আইনের দ্বারা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁরা তো বটেই, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে যাঁরা বাদানুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে, কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সুস্থ সামাজিক জনমতও গড়ে উঠেছিল। যতটুকু গড়ে উঠেছিল ততটুকুই বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন সার্থক হয়েছিল বলা যায়।

১০ সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত : ১৮৫০—১৮৯০

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের যে বিবরণ আমরা দিয়েছি, তা প্রায় ১৮৫০-৫১ থেকে ১৮৭০-৭২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম দশ বছর (১৮৫০-৬০) বিদ্যাসাগরই ছিলেন বাংলার নতুন সমাজের প্রধান কর্ণধার। তাঁর শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ এই সময় বাঙালী সমাজকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করে। সেই তরঙ্গাঘাতে প্রাচীন সমাজের জীর্ণ কুসংস্কারের স্তম্ভগুলি একে-একে ভাঙতে থাকে, এবং তার প্রতিশব্দে সমগ্র সমাজ সচকিত হয়ে ওঠে। ১৮৬০ সালের পরেও সমাজে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই সময় থেকে প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের ধারায় নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হল।

১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে নবরূপান্তর ঘটল। কেশবচন্দ্র সেন হলেন তার প্রধান রূপকার। বিদ্যাসাগর তখন এখানে-ওখানে বিধবাবিবাহের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সাহায্য করছেন, এবং বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। ১৮৭০-৭২ থেকে ১৮৮৮-৯০ পর্যন্ত পরবর্তী কুড়ি বছরের ইতিহাসের ধারা নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করে। একেবারে নতুন খাত নয় অবশ্য, এবং সমাজের ইতিহাসে এরকম অপ্রত্যাশিত খাতবদল ঘটে না কখনও। নবযুগের

বাংলার সমাজ-জীবনের স্রোত ছুটি স্বতন্ত্রমুখী খাতে, উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বয়ে চলেছিল। একটি সম্মুখগামী উন্নতিশীল ধারা, আর-একটি পশ্চাদ্‌গামী রক্ষণশীল ধারা। একথা মনে করা ভুল যে এই ছুটি ধারার মধ্যে উন্নতিশীল ধারা কোনসময় বেশী শক্তিশালী ছিল। তা কোন সময়েই ছিল না। রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর পরবর্তীকালে, সাধারণ সমাজের দিক থেকে বিচার করলে, সব সময়েই রক্ষণশীল আন্দোলনই বেশী শক্তিশালী ছিল বলতে হয়। কিন্তু সমাজের নতুন চলৎশক্তি (new dynamics of society) যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁদের চলার গতি দেখেই সমাজের অগ্রগতি-পশ্চাদ্‌গতি বিচার করা হয়। নবযুগের সমাজের চলৎশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতেন শহরের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী। ১৮৭০-এর পর থেকে বাংলার এই নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর গড়ন ও রূপের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে, তাঁদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্বোধনকালে তাঁরা অত্যন্ত উগ্রভাবে ঐতিহ্যবাদী হয়ে ওঠেন। এই সব কারণেই এই সময় প্রাচীন আদর্শ ও ঐতিহ্যের পুনরুত্থান-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, এবং স্বভাবতঃই তা মধ্যে মধ্যে বাঁধ ভাঙার উপক্রম করে। এই সামাজিক তরঙ্গধারার বর্ণনা দেবার আগে সেইজন্য আমরা তার সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিটি বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

•

সামন্তযুগের ভাঙন এবং নতুন ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যযুগের অভ্যুদয় যখন হতে থাকে, তখন কাঁচামালের উৎপাদকদের সঙ্গে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রমে শ্রমবিভাগের ফলে বিচ্ছেদ ঘটে, নগরে-শহরে শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, এবং ক্রমে তার ফলে সমাজে একটি সুসংবদ্ধ মধ্যবর্তী জনস্তরের বিকাশ হতে থাকে। এই মধ্যবর্তী জনস্তরে ধীরে-ধীরে যখন নাগরিকতাবোধের বিকাশ হয়, তখন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারের চেতনাও তাঁদের মধ্যে জাগতে থাকে। তারপর সেকালের সামন্ত-সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ভেঙে গিয়ে যখন নতুন ধনতান্ত্রিক-সমাজ শ্রেণীবিন্যস্ত হতে থাকে, তখন এই 'মধ্যশ্রেণী' নানাস্তরের লোকের সংমিশ্রণে

ক্রমে বৃহৎ জটিল আকার ধারণ করে। বিখ্যাত সমাজবিদ্ অ্যালফ্রেড মিউসেল (Alfred Meusel) মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন :[১]

> The break up of the feudal economy, characterised by a growing division of labor as between the producer of raw materials and the small manufacturer and by the concentration of commercial and industrial enterprise in the towns, brought into existence a somewhat cohesive intermediate social and functional group *(Mittelstand)*. This initial cohesiveness was intensified by the growth of a civic spirit, which gradually transformed the inhabitants of the towns into self-conscious burghers more or less united in their determination to secure legal privileges and rights and to bring to an end, ...the restrictions imposed by the feudal landowners.

তারপর, মিউসেল বলেছেন, গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পর্বান্তরের ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং তার বৈচিত্র্য ও জটিলতাও বাড়ে। বৈদেশিক পরাধীনতার জন্য, বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের যুগসম্মত স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু তার বিচ্ছিন্ন ও বিরোধ-বহুল অসমবিকাশের ধারার মধ্যেও সমাজজীবনে নবযুগের ঐতিহাসিক লক্ষণগুলি অধিকাংশই ফুটে উঠেছিল।

আঠার শতকের শেষপাদ থেকেই বাংলার প্রাচীন সমাজবিন্যাস ধীরে ধীরে বদলাতে আরম্ভ করেছিল, এবং উনিশ শতকের প্রথমপাদের মধ্যেই নবযুগের সমাজের শ্রেণীরূপায়ণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ তৎকালের সাহিত্য থেকে কিছু-কিছু পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সালে রচিত তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকে 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা' বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন :[২]

যাঁহারা প্রধান ২ কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদিপূর্ব্বক বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈলমর্দ্দন করিয়া থাকেন নানা প্রকার তৈল যাঁহার যাহাতে সুখানুভব হয় তিনি তাহাই মর্দ্দন করিয়া স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ব্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পাল্কী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন কর্ম্মানুযায়ি কাল বিবেচনাপূর্ব্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্ত-পাদাদি প্রক্ষালনানন্তর গঙ্গোদকস্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগানন্তর পুনর্ব্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে কেহ কোন কর্ম্মোপলক্ষে কেহ বা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।

দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাঁহারদিগের অনেক ঐ ধারা কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহ বা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয় ২ করিতে হয়, না করিলেও নয় পোড়া উদরের জ্বালা।

এই সকল কর্ম্মকারি বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা কহিলাম এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের কৃপাতে যাঁহার-দিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয় তাহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্ব্বক

মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি বা ছয় দণ্ড বেলা সত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহ বা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।

এই বর্ণনার মধ্যে ভবানীচরণ কেবল সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের ইঙ্গিত করেননি, বিভিন্ন শ্রেণীর আচার-ব্যবহারেরও চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। * ১৮২৫ সালে রচিত তাঁর 'নববাবুবিলাস' পুস্তকে তিনি এই নতুন শ্রেণী-রূপায়ণের অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে বলেছেন:[৩] "ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জেষ্ঠ্যভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার···বেতনোপভুক হইয়া···সরদারী চৌকি-দারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া···কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···।" ভবানীচরণের এই বিশ্লেষণ অনেকটা সমাজবিজ্ঞানসম্মত। বাংলাদেশে কলকাতা মহানগর নবযুগের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠল। যখন গড়ে উঠল তখন স্বর্ণকার কর্মকার প্রভৃতি অনেকে গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে যাত্রা করলেন, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। নতুন মহানগরে সর্দারি পোদ্দারি করেও উপার্জনের পথ খুলে গেল। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা করে (স্বয়ং রামমোহন রায়ই করতেন) এবং নতুন জমিদারী কিনে (রামমোহন রায়ও তা করেছেন) অনেকে প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেন। সর্বোচ্চ নতুন জমিদারশ্রেণী ছাড়া বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে তিনটি স্তর ক্রমে স্পষ্ট আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে। ভবানীচরণের বিবরণ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তের এই তিনটি স্তরেরই বিকাশের আভাস পাওয়া যায়। সমাজবিদ্‌রা

* এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় খণ্ডে' (৭৯-৮১ পৃষ্ঠায়) এবিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখানে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হল।—বি. ঘো.

এখন মধ্যবিত্তের এই তিনটি স্তরকে বলেন, 'Upper', 'Middle' ও 'Lower Middle-class'—উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত।

বাঙালী মধ্যবিত্তের সামাজিক রূপায়ণ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে 'বঙ্গদূত' পত্রিকা লেখেন :[৪]

> গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপীয় মহাশয়দিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।
>
> এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।

এত সুন্দর সামাজিক বিশ্লেষণ সমসাময়িক পত্রিকায় অত্যন্ত বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'বঙ্গদূত' বলেছেন ত্রিশ বছর আগেও যে-সব জমির দাম ছিল ১৫৲ টাকা, এখন তার দাম বেড়ে ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেক প্রসার ও উন্নতি হয়েছে। সেকালের কুলগত বৃত্তির বংশানুক্রমিক বন্ধন ছিন্ন করে অনেকে অবাধ বাণিজ্যের পথে যাত্রা করে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। সেকালের সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার অন্যতম মানদণ্ড ছিল কুল, জাতি বা বংশ। সেই কৌলিক মানদণ্ডের বদলে নতুন ধনতান্ত্রিক যুগে আর্থিক মানদণ্ডই বড় হয়ে উঠল, এবং সমাজে জাতি-উপজাতিগত স্তরবিন্যাস ভেঙে গিয়ে নতুন বিত্তগত শ্রেণীবিন্যাসের সূচনা হল। সেকালের সমাজ অচল স্তরবিন্যস্ত গড়নের জন্য স্থিতিশীল ছিল ; নবযুগের সমাজ পরিবর্তনশীল শ্রেণীবিন্যস্ত গড়নের জন্য গতিশীল হল। জর্মান সমাজবিদ্ অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন বলেছেন :[৫]

> In the Middle Ages power belonged to him who owned the soil, the feudal lord ; but now...he who knew how to exploit money and time fully could make himself the master of all things. Such are the new means to power of the Bourgeois. Money and time imply motion : 'there is no more apt symbol than money to show the dynamic character of this world. As soon as it lies idle it ceases to be money in the specific sense of the word...the function of money is to facilitate motion' (Simmel).

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় না হলেও, 'বঙ্গদূত' এই একই ভাবধারা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উৎপত্তির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মার্টিন বলেছেন : "Money, because it circulates, as landed property cannot, shows how everything became more mobile." 'বঙ্গদূত' লিখেছেন : "এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যে সকল উপকারোপযোগি

ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়।...অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্ত্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার...ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে।" টাকা যদি অচল অবস্থায় সিন্দুকে মজুত থাকে, তাহলে তার 'টাকাত্ব'ই থাকে না, বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী সিমেল একথা বলেছেন এবং একথা আধুনিক ধনবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। 'বঙ্গদূত'ও তাই বলেছেন। টাকার সঙ্গে সারমাটির তুলনা করে 'বঙ্গদূত' লিখেছেন যে সারমাটি যেমন এক-জায়গায় রাশীকৃত করে জমিয়ে রাখলে তাতে কোন উপকার হয় না, টাকাও তেমনি একজায়গায় মজুত করে রাখলে তাতে কোন 'ফলোদয় হয় না', কিন্তু 'বিস্তীর্ণ হইলেই' অর্থাৎ সচল হলেই ফল হয়। নিষ্ক্রিয় গচ্ছিত টাকা মূল উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগ করে সচল ও সক্রিয় করার জন্য 'বঙ্গদূত' এখানে পরোক্ষে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এদেশী গচ্ছিত মূলধন অর্থনৈতিক উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়োগের পথে ইংরেজ শাসকরা অনেক অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলেন। তার জন্য ধনতন্ত্রের সুসঙ্গত ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়েছে বাংলাদেশে, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাংলার নবযুগোপযোগী সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ নবযুগের প্রকৃত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে উনিশ শতকে বিশেষ হয়নি বললেই চলে। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার এবং কর্মক্ষেত্রের (প্রধানত চাকরির) বৈচিত্র্যবৃদ্ধি ও ক্রমপ্রসারের ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। তাতেও, অর্থাৎ নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রমপ্রসারের ফলেও, বাংলার সমাজের সচলতা (social mobility) অনেক বেড়ে যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে এই সচলতা বাড়তে থাকে। এই সময়টাকে ডিরোজীয়ানদের যুগ বলা যায়। রামমোহনের যুগে মুষ্টিমেয় ধনিক অভিজাতগোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার চেয়ে পরবর্তী ডিরোজীয়ানদের বা ইয়ং-বেঙ্গলের যুগের সচলতা অনেক বেশী ছিল। কেবল উপার্জিত ধন নয়, বিদ্যাও তখন সামাজিক মর্যাদার নতুন মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডিরোজীয়ানদের

মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবারের সন্তান ছিলেন, এবং বিত্ত ছাড়াও তাঁদের সম্বল ছিল নবযুগের নতুন বিদ্যা, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা। এই নতুন বিদ্বান ও বিত্তবান মধ্যবিত্তের চলার গতি খানিকটা উদ্দাম লক্ষ্যহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলেও, বাংলার সমাজের দীর্ঘস্থায়ী জড়তা, স্থবিরতা ও কূপমণ্ডূকতা ভাঙবার জন্য ইয়ংবেঙ্গলের এই বাধাবন্ধহীন বেগের ও প্রচণ্ড উদ্দামতার আঘাত কিছুটা প্রয়োজনও ছিল। একটা অনড় অচল জড় সমাজকে জঙ্গম করতে হলে তার রুদ্ধ দ্বারে আঘাতের উপর আঘাত করতে হয়। ইয়ংবেঙ্গল এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, শম্বুকগতি নিষ্ক্রিয় বাঙালী সমাজকে তাঁরা সক্রিয় ও বেগবান করে তুলেছিলেন।

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ও প্রসার হতে থাকে। এই সময় ডালহৌসি রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন করেন এবং আধুনিক ডাকবিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৩ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত রেলওয়ে-মিনিট রচনা করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে সহস্রাধিক মাইল রেলপথ তৈরি হয়ে যায় এবং প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী তাতে চলাচল করতে থাকে। ১৮৮৮-৮৯ সালের মধ্যে রেলপথ তৈরি হয় প্রায় ১৫,২৪৫ মাইল। হান্টার বলেছেন:[৬] "Lord Dalhousie seized the opportunity, afforded by the introduction of railways, to throw the country open to private enterprise and to English capital, in a degree before unknown, and with results which practically inaugurated a new industrial era in India." রেলওয়ে ও ডাক-তার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশের অন্তর্বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার হতে থাকে, এবং মানুষের চলাচল ও পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক বেড়ে যায়। ডালহৌসির আমলে 'পাবলিক ওআর্কস' বিভাগও পুনর্গঠিত হয়, এবং তার বাৎসরিক ব্যয় আগের আমলের ২৬০,০০০ পাউণ্ড-স্টার্লিং থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যেই প্রায় দশগুণ বেড়ে ২৫০,০০০০ পাউণ্ড-স্টার্লিং হয়।[৭] রাস্তা-ঘাট, খাল-নালা, সেতু, স্কুল-কলেজ, ডাকঘর, স্টেশান-বন্দর, আদালত ইত্যাদি এই সময় নির্মাণ করা হয়। ধনবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে

আমরা জানি, সাধারণ জনকল্যাণকর্মে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি হলে সমাজের লোকজনের বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত হবার সুযোগ বহুগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং ডালহৌসির আমলে আমাদের দেশে চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের (Salariat Middleclass) অতি দ্রুত কলেবরবৃদ্ধি হয়, এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্তের অধিকাংশ স্তরের অপ্রত্যাশিত আর্থিক উন্নতি হতে থাকে। শিক্ষার ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মধ্যবিত্তের বিকাশ তখন বাংলাদেশে যেমন হয়েছিল, সে-রকম আর ভারতের অন্য কোন প্রদেশে হয়নি। স্বভাবতঃই তাই বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী এই অর্থনৈতিক প্রসারণের যুগে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের বাঙালী মধ্যবিত্তের এই আর্থিক সচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও প্রবল সামাজিক সচলতার যুগের প্রতিভূ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সমাজের এই গতিবেগই প্রতিফলিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাসেও যুগান্তকারী সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সেখানেও এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান শহর-নগরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাধিকারবোধ ও সামাজিক চেতনা। ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান (G. M. Trevelyan) বলেছেন :[৮]

> In 1832 the nation had been made supreme and had been so defined as to include half the middle-class. In 1867 it was defined again so as to include the rest of the middle-class and the working-men of the towns. The immediate consequence, between 1868 and 1875, was a long list of reforms, including under the Liberals, Irish Church and Land Acts, popular education, army reform, the opening of the Civil Service and the Universities to free competition ; under the Conservatives, sanitary and municipal legislation and new laws

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
সমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভট্টপল্লী বংশবাটী কলিকাতা প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ি পণ্ডিতদিগের বিজ্ঞপ্তি বিনয়পুরঃসর সমাবেদনমিদং। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্যসম্প্রদায়ের কতিপয় যুবক সহযোগে আপনকারদিগের সমীপে প্রার্থনা করাতে আপনারা হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইনের যে সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে মনোযোগ করিতে আজ্ঞা হউক।

প্রথমতঃ হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ বেদস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

বেদ যথা

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে, যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ইতি।

স্মৃতি যথা মনু

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ১৫১

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ ১৫৭

আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥ ১৫৮

আবেদনপত্র

Taruck Nauth Thakur

Rusic Krishna Mullick

Kissory Chand Mittra

Radhanath Sickdhar

Obhoy Churn Mullick

Shama C. Mookerjee

Peary Chand Mittra

Gooroodoss Chatterjea

Mudhoosoodun Bhuttacharjya

Hurry Churn Ghose

Bromonath Sen

Gopee Kissen Mitter

Hemochunder Dutt

Mahendra Nath Roy

Hurry Mohun Mullick

Jodoo Nauth Saha

ইয়ং বেঙ্গল দলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র,

to assist Trade Unionism; and finally, after another interval, the inclusion of the agricultural labourer in the national franchise in 1884, leading a few years later to the establishment of Local Self-Government in the rural districts.

এই সময় জন স্টুয়ার্ট মিল ওদেশের চিন্তাধারায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেন এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাকে তিনি সমাজের বহুদূর স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করে নিয়ে যান। ১৮৫৯ সালে তাঁর রচিত *On Liberty*, ১৮৬১ সালে *Representative Government* এবং ১৮৬৯ সালে *Subjection of Women* নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ সালে ডারুইনের *Origin of Species* গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। মিল, ডারুইন, কার্ল মার্ক্স ও অন্যান্য মনীষীরা উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে তোলেন। ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের ইতিহাসে সামাজিক সংস্কারকর্মের ও উন্নতিশীল আন্দোলনের এক নতুন পর্বের সূচনা হয়। আমাদের দেশেও এই সময় সমাজসংস্কার আন্দোলনের এক স্বর্ণযুগের অভ্যুদয় হয়। তার প্রথম পর্বে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় পর্বে কেশবচন্দ্র সেন। বিদ্যাসাগর যখন তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠার মধ্যগগনে বিরাজ করছেন তখনই কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। বিদ্যাসাগরযুগের প্রচণ্ড সামাজিক গতিবেগ কেশবচন্দ্র উপলব্ধি করেন, এবং তাকে আরও বর্ধিত করে সমাজের নতুন অগ্রগতির পথ নির্মাণের চেষ্টা করেন।

বিদ্যাসাগরযুগে, বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবে, তরুণ কেশবচন্দ্রের চরিত্র গড়ে উঠেছিল। যদিও কেশবের জীবনে ১৮৫৯ সালে ২১ বছর বয়সে 'বিধবাবিবাহ নাটক' অভিনয় করে শহরময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা একটি সামান্য ঘটনা মাত্র, তাহলেও সামাজিক ইতিহাসের ধারার দিক থেকে এই সামান্য ঘটনাটির গুরুত্ব আছে। কেশব নিজে ছিলেন স্টেজ-ম্যানেজার ও প্রযোজক। চিৎপুরে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে কেশবের প্রযোজনায় 'বিধবাবিবাহ নাটকের' অভিনয় দেখতে বিদ্যাসাগর

নিজে একাধিকবার গিয়েছিলেন। কেশবজীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন:[১] "The performance was first opened to the public in the beginning of 1859, and produced a sensation in Calcutta, which those who witnessed it, can never forget. The representatives of the highest classes of Hindu society were present. The pioneer and father of the widow marriage movement, Pandit Ishwara Chandra Vidyasagar came more than once, and tender-hearted as he is, was moved to floods of tears." কেশব ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী বিদ্যাসাগরের আদর্শের প্রতি যে কতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা এই ঘটনাটি থেকে খানিকটা বোঝা যায়। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০-৭২ সাল পর্যন্ত বাংলার সমাজে কেশবচন্দ্রের প্রাধান্যের যুগকে 'ব্রাহ্মসমাজের নবোত্থানের' যুগ বলা হয়। ব্রাহ্মসমাজকে কেশবচন্দ্র এই সময় যে নবজীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তার প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ থেকে। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনের আঘাতে ম্রিয়মাণ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্জীবন লাভ করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায় বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মসমাজও সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় মানবচক্ষুর গোচর হইল।"

এই সময় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়, সঙ্গত সভা, কলিকাতা কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করে, বাংলার শিক্ষিত তরুণসমাজকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন। প্রগতিশীল তরুণ বাংলার আদর্শ মুখপাত্র হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর চরিত্রের সারল্যে ও বলিষ্ঠতায়, তাঁর প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে ও অসাধারণ বাগ্মিতায় বাংলার সমগ্র তরুণসমাজ তাঁর প্রতি মন্ত্র-মুগ্ধের মতন আকৃষ্ট হয়। প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি বক্তা, পুস্তিকা-লেখক, সংস্কারকর্মী, ধর্মপ্রচারক ও মানবহিতৈষী বলে জনসমাজে পরিচয়লাভ করেন—"During these five years, he

developed into a lecturer, tract-writer, reformer, missionary, and philanthropist.” (মজুমদার, ৮৭)।* বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি নতুন ব্রাহ্মধর্মের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৪ সালে এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত-ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে বাংলার ব্রাহ্মধর্মের ‘উদ্বোধনী-বাণী’ প্রচারের জন্য যাত্রা করেন (“unattempted before in the history of the Brahmo Samaj”—মজুমদার, ৯৮)। রামমোহনের আমল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা বাংলার ব্রাহ্মধর্মের কথা শুনেছিলেন বটে, কিন্তু সেই আদর্শপন্থী কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে তার পরিচয়লাভের সুযোগ তাঁদের হয়নি। কেশবচন্দ্রই প্রথম সেই সুযোগ করে দেন। বাংলার সামাজিক জাগরণ এবং সংস্কারকর্মের কথা তার আগেই ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়। বিদ্যাসাগরের আন্দোলন বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয়দলের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এই আলোড়নের পরেই তরুণ বাংলার প্রতিনিধিরূপে কেশবচন্দ্র তাঁর দীপ্ত প্রতিভা নিয়ে তাঁদের কাছে নবজাগরণের বাণী শোনাতে গিয়েছিলেন। দক্ষিণভারতের লোক তাঁকে ‘thunderbolt of Bengal’ বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভারত-ভ্রমণ শেষ করে আরও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কেশবচন্দ্র বাংলাদেশে ফিরে এলেন।

তরুণ কেশবপন্থীরা তখন সমাজসংস্কারের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা প্রথম দাবী করলেন, ব্রাহ্মধর্মের আচার্যদের ব্রাহ্মণত্বের সনাতন প্রতীক ‘উপবীত’ ত্যাগ করতে হবে। প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তরুণদের এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তরুণদের উৎসাহে ব্রাহ্মরীতি অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহও আরম্ভ হল, এবং প্রথম অসবর্ণ বিবাহ হল ১৮৬২, আগস্ট মাসে। তার সঙ্গে সোৎসাহে বিধবা-

* প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী জীবনচরিত The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen (1931).

বিবাহের উদ্‌যোগ, আয়োজন ও অনুষ্ঠানও চলতে থাকল। বাইরে বিরোধিতা না করলেও, দেবেন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন না। যখন ব্রাহ্ম-পদ্ধতিতে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হল, তখন তিনি বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর এই সময় চুপ করে বসে ছিলেন না। বিধবাবিবাহের আয়োজনে ও অনুষ্ঠানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নানাদিক থেকে সহযোগিতা করছিলেন, এবং তরুণ ব্রাহ্মরা স্বভাবতঃই তাঁর কাছ থেকে একাজে যথেষ্ট প্রেরণা পাচ্ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহের সঙ্গে তরুণ ব্রাহ্মরা মেয়েদের নানারকমের সামাজিক অধিকারও দাবী করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের দাবী হল, ব্রহ্মোপাসনার সময় পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও যোগ দেওয়ার অধিকার থাকবে, এবং প্রকাশ্যস্থানে স্বামী-স্ত্রীর একত্র যাতায়াতের কোন বাধা থাকবে না। নবীন ব্রাহ্মরা এই সময় সস্ত্রীক বাইরে চলাফেরা করতে আরম্ভ করেন এবং বাইরে লোকসমাজে তাই নিয়ে প্রবল ঠাট্টা-তামাসা ও সমালোচনাও আরম্ভ হয়। নবীন ব্রাহ্মদলের এই দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে প্রাচীন দেবেন্দ্রপন্থী ব্রাহ্মগোষ্ঠীর তাল রেখে চলা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং প্রবীণ ও নবীন দুই দলের মধ্যে বিচ্ছেদও অনিবার্য হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৬৬, ১১ নবেম্বর কেশবপন্থীরা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন, এবং দেবন্দ্রপন্থীদের পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের নাম হয় 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' থেকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। নবীনেরা স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সংস্কারকর্মে অদম্য উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। বিদ্যাসাগর তখন প্রত্যক্ষভাবে বহুবিবাহ-নিবারণ অন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং তাঁর আন্দোলন নবীন ব্রাহ্মদের সংস্কারকর্মের ফলে অনেকটা শক্তিশালীও হয়েছিল। তাঁর নিজের সীমানা ছাড়িয়েও যে প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা আরও বেশী দূর অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল, একথা বিদ্যাসাগর বোধ হয় তখন বুঝতেও পেরেছিলেন।

১৮৭০, ১৫ ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে এই সময় মিল-ডারুইন, ডিসরেলি-গ্ল্যাডস্টোনের যুগ। কেবল মধ্যবিত্তশ্রেণীর চেতনা নয়, প্রায় পঞ্চাশবছরব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের ফলে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক দাবী ও রাষ্ট্রিক অধিকারবোধ তখন

অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। তাছাড়া, মানুষের গতানুগতিক চিন্তা-ধারার মূল পর্যন্ত তখন নাড়া দিয়েছেন মিল-ডারুইন, কার্ল মার্ক্স ও অন্যান্য মনীষীরা। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রবল তরঙ্গ উঠেছে তখন ইংলণ্ডে। এমন সময় তরুণ বাংলার প্রতিনিধিরূপে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে পৌছলেন। তাঁর প্রতিভায় ও বাগ্মিতায় শিক্ষিত ইংরেজসমাজ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। 'Thunderbolt of Bengal' কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বিলেতের সুরসিক Punch পত্রিকা লিখলেন :

> Big as a Lion or small as a wren
> Who is this Chunder Sen ?

ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্র সমাজের নানাস্তরের লোকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং সেখানকার নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগও হয়েছিল। গ্ল্যাডস্টোন ও ডিসরেলি উভয়ের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন, এবং Female Suffrage Society, Ragged School Union, Peace Society, Temperence Society, Unitarian Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে তিনি তাদের আদর্শ ও কর্মধারার প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভ করেছিলেন। সেখানকার জনসাধারণের আত্মোন্নতির ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আবেদন তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৭০ সালের শেষদিকেই কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। এসেই তিনি কার্যক্ষেত্রে নানাদিকে তাঁর নতুন আদর্শ প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। 'ভারতসংস্কার সভা' (Indian Reform Association) নামে একটি সভা স্থাপন করে তিনি তার কর্মসূচী পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করেন : (১) সুলভ-সাহিত্য, (২) সুরাপান-নিবারণ, (৩) শ্রমজীবী বিদ্যালয়, (৪) স্ত্রী-শিক্ষা, (৫) দান-দাতব্য-সেবা। 'সুলভ-সাহিত্য' বিভাগে তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে একপয়সা মূল্যের একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'শ্রমজীবী-বিদ্যালয়' বিভাগে শ্রমিকদের জন্য একটি

নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হয় এবং দলের একজন ব্রাহ্ম যুবকের উপর তার পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। স্ত্রী-শিক্ষা-বিভাগেও মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খোলা হয় এবং ব্রাহ্মদের স্ত্রী-ভগিনী প্রভৃতি বয়স্কা মহিলারা সেখানে লেখাপড়া শিখতে থাকেন। দানসেবাবিভাগে আর্ত ও পীড়িতদের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে (যেমন বেহালায়) ম্যালেরিয়াপীড়িতদের সেবার কাজে ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়োগ করা হয়। তারপর বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলেও ব্রাহ্ম যুবকরা সেবাকার্যের জন্য যেতে থাকেন। এইভাবে ভারতসংস্কার সভার কাজকর্ম পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়।

কেশবচন্দ্রের এই সমাজতান্ত্রিক জনকল্যাণকর আদর্শ তাঁর 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছিল। সুলভ পত্রিকা প্রচারের ইচ্ছার মধ্যেই তা অভিব্যক্ত। "সুলভ সমাচার, এদেশে সুলভ সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন করিল। এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র যে বাহির হইতে পারে, এবং বাহির হইলে যে তিষ্ঠিতে পারে, তাহা কেহ অগ্রে জানিত না। 'সুলভ' যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে আলোচনা পড়িয়া গেল।"[১১] নানাবিষয় নিয়ে এই পত্রে আলোচনা হত। রচনার ভাষা খুব প্রাঞ্জল এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি অধিকাংশ রচনায় প্রকাশ পেত। 'বড়লোক' শীর্ষক একটি রচনার নিদর্শন এখানে দিচ্ছি :[১২]

> দেশের বড় লোক কাহারা? যাহাদের টাকা আছে—অর্থাৎ যাহারা আগে মিস্ত্রিগিরি ধোপাগিরি কি খানসামাগিরি করিয়া গুজরান চালাইতেন কিন্তু এখন কোন মত প্রকারে টাকা উপার্জ্জন করিয়া এদেশে বড় মানুষ বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত হইয়াছেন। বলিতে গেলে বনেদি বড় ঘর এদেশে অল্প। কিন্তু বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা? আমাদের দেশে এদেশের ছোট লোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড় দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমাদের সর্ব্বস্ব দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা

বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে। তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন রাত্রি কষ্ট করিয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছে, কিন্তু কয়জন তাহাদিগের অবস্থা একবারও মনে করে।

বিলাতের যে এত টাকা এত বলবিক্রম, তাহা কোথা হইতে আসিল? সেই ছোট লোকদের হইতে। পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোট লোকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর দুঃখে মাটির শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না। এখনই বিলাতে তাহারা এমনি বলবান হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা আর রাজাকে মানে না। আপনাদের অধিকার আপনাদের বিক্রম আপনারাই প্রকাশ করিতে যায়।...সকল বড় বড় দেশে বড় মানুষে ছোট লোকে লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা নহে যে রেওতেরা সেই রকম অত্যাচার করে। কিন্তু অন্যায় না করিয়া তাহারা তাহাদের পীড়নকারী জমিদারদের জব্দ করে, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

ইহা করিতে হইলে লেখাপড়া শিক্ষা করা আবশ্যক। আমাদের পাঠকগণ যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কারিগর আছ, সকলে একত্র হইয়া গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরতা, প্রজাপীড়ন বলপূর্ব্বক থামাইতে পার, ইহাতে একান্ত যত্ন কর। তোমাদের ভালর জন্য দেখ আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি বাহির করিয়াছি। তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে উঠ, দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক নাই। রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড় মানুষেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা চিরকাল সহ্য করিবে? তোমরা কি মানুষ নও?

ইংলণ্ডের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ যে কেশবের মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষ করে সেখানকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তিনি যে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকার

এই ধরনের একাধিক রচনা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু ক্রমে কেশবের চিন্তাধারায় ও কাজকর্মে নানারকমের অসঙ্গতি দেখা দিতে থাকল। ব্রাহ্মসমাজের যুবকগোষ্ঠীর সামনে তিনি যে গণতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, সমাজ-পরিচালনার ব্যাপারে ও অন্যান্য কাজকর্মে তিনি নিজেই তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ঈশ্বরপ্রেরিত মনুষ্যাবতার সম্বন্ধে তাঁর গভীর বিশ্বাস জন্মাল, সে-বিষয়ে তিনি আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন এবং নিজেকেও অবশেষে 'অবতার' ভাবতে লাগলেন। বিলাতযাত্রার আগেই তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ পায়, পরে ধীরে ধীরে তা বদ্ধমূল হতে থাকে। এ সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন :[১৩]

> অধুনাতন ব্রাহ্মদের কথায় ও কার্য্যে আমাদের প্রতীতি হইতেছে, ব্রাহ্মেরা সাধারণতঃ একটি মহৎ ভ্রমে পড়িয়াছেন। সে ভ্রমটি তাঁহাদের মহৎ লোক সম্বন্ধীয় মত, সহজরূপে বুঝিতে গেলে, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় মনুষ্যেও ছোট বড় আছে।…আমরা মহৎ লোকের অর্থ এইরূপ বুঝি। কিন্তু অধুনাতন ব্রাহ্মরা মহৎ লোক সম্বন্ধে এইরূপ নূতন মত প্রচার করিতেছেন।…তাঁহারা মনে করেন মহৎ লোক স্বতন্ত্র এক শ্রেণী লোক। তাহাদের স্বভাব আর সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব প্রকৃতিগত ভিন্ন। মহৎ লোক সামান্যতঃ জন্মগ্রহণ করেন না, আবশ্যক মত ঈশ্বর ইহাদিগকে প্রেরণ করেন। এই মত একটি ভয়ানক মত। অবতারে বিশ্বাস করা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, এই মত তাহা হইতে বড় অধিক ভিন্ন নয়। মনুষ্য মাত্রেই কি বড় নহে? কোন্ ব্যক্তি তাহাকে ছোট বলিলে ক্রোধান্ধ না হয়?

কেবল অবতারবাদ নয়, বৈষ্ণব ভক্তিবাদও ক্রমে কেশবচন্দ্রের মন আচ্ছন্ন করে ফেলল। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান তিনি, শেষ পর্যন্ত পারিবারিক ধর্মৈতিহ্যে অভিভূত হয়ে গেলেন। এই সময় ব্রাহ্মদের নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে, খোল-করতালসহ ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়ে নগর-সংকীর্তনে বাইরে বেরুতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মনামের ভাবাবেগে

যখন তিনি বিভোর হয়ে যেতেন, তখন ব্রাহ্মভক্তরা তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়তেন, এবং তিনি তাতে বাধা তো দিতেনই না, মনে মনে নিজেকে 'অবতার' ভেবে ভক্তদের আত্মসমর্পণ উপভোগ করতেন। ক্রমে ক্রমে অবতারবাদ ও ভক্তিবাদের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে কেশবের ব্রাহ্মসমাজ তার প্রগতিশীল আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকল। তার উপর, ১৮৭৬ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তিনি এমনভাবে মাতৃভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন যে নিজেকে 'জননী' এবং ভক্তদের 'সন্তান' ছাড়া আর কিছু তিনি ভাবতে পারতেন না। সমগ্র সমাজ ও মানুষ ক্রমে তাঁর কাছে এই মাতৃভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যেত। এইভাবে কেশবের ব্রাহ্মধর্ম লুপ্ত হয়ে গেল হিন্দুধর্মের মধ্যে। অন্তত অন্তঃসার বলে তার আর আলাদা কোন পদার্থ রইল না, যদিও তার বাইরের সংঘগত অস্তিত্ব বজায় থাকল। কেশবভক্তরা এই সময় প্রায় বৈষ্ণব নেড়াদের দলে পর্যবসিত হলেন, এবং মুখে তাঁদের পাপ-পুণ্য, ভক্তি-মুক্তি, ভগবান-অবতার ইত্যাদি কথা অনবরত উচ্চারিত হতে থাকল, এবং বড় বড় সামাজিক আদর্শ ও কর্তব্যের বুলি, এমন কি ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত প্রায় অন্তর্ধান করে গেল। এই সময়ের কথা স্মরণ করে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'আত্মজীবনচরিতে' লিখেছেন :[১৪]

> In fact, the natural humanity of the general body of Brahmo young men of my generation was almost completely overwhelmed by their religiosity. They were almost always talking of sin and salvation, of prayer and divine worship. All these unrealities of the current ideals and practices of Samaj seriously influenced the generation of youthful students to which I belonged. I had, therefore, not only no attraction for the Brahmo Samaj when I first came to Calcutta, but even felt an increasing repulsion towards it.

এর আগে থেকেই হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ

হয়েছিল। কেশবগোষ্ঠীর এই আদর্শ-সঙ্কটের ফলে এই পুনরভ্যুত্থানের পথ আরও নিষ্কণ্টক ও প্রশস্ত হয়ে গেল। হিন্দু ঐতিহ্যবাদীদের মতামতের প্রতিবাদ করার মতন বিশেষ কেউ থাকলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :[১৫]

> 'The hold of the movement upon the younger generation which had attracted so much notice at the commencement of Mr. Sen's career had well-nigh ceased before 1876. No new candidates for initiation were forthcoming.... Views opposed to the principles of the Samaj were being openly and publicly propagated by a class of Hindu revivalists, in many public platforms, without being controverted by the leaders of the Brahmo Samaj.

আদর্শচ্যুতির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সামাজিক আচার-ব্যবহারেও নানারকম ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটতে লাগল। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালের 'তিন আইনের বিবাহবিধি' পাশ হয়, কিন্তু তিনি নিজেই কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে নিজের কন্যা সুনীতি দেবীর হিন্দু মতে বিবাহ দেন। তাছাড়া স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি তাঁর সহকর্মী ও অনুগামীদের পদে পদে বাধা দিতে থাকেন। এই সময় তরুণ ব্রাহ্মরা 'সমদর্শী' নামে একটি দল (group) গঠন করে ঐ নামে একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—এঁরাই ছিলেন সমদর্শীগোষ্ঠীর প্রধান মুখপাত্র। শিবনাথ ছিলেন দলের গুরু। কেশবের অবতারবাদ ও ভক্তিবাদ থেকে মুক্ত করে, শিবনাথ ব্রাহ্ম আদর্শকে তখন আবার নতুন করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। ১৮৭৮, মে মাসে কেশববিদ্রোহীদল 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' থেকে পৃথক হয়ে 'সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজ' নামে স্বতন্ত্র একটি সমাজ গঠন করেন। এই সময় থেকে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও আন্দোলনের ধারা অতিক্রত জাতীয়তার আদর্শ ও আন্দোলনের ধারার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে থাকে। এই মিলনপর্বের তিনজন প্রধান নেতা হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবনাথের ব্রাহ্মআদর্শ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন :[১৬]

> Shivanath's Brahmoism was more attractive to me than that of the Keshub...Shivanath's Brahmo ideal was more instinct with the spirit of freedom and individualism...Social freedom and national emancipation were both organic elements of Shivanath's religion and piety.

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে শিবনাথ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম সামাজিক উপাসনাতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করার রীতি প্রবর্তন করেন। "এ সময়ে তিনি স্বদেশের মুক্তি-কামনায় যে সঙ্গীত রচনা করেন, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে বোধ হয় সেইটী একমাত্র স্বদেশী সঙ্গীত। এখনকার ব্রাহ্মেরা সেই সঙ্গীতটী প্রায় ব্যবহার করেন না বলিয়া লোকে তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে।"[১৭] সঙ্গীতটি এই :

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে অবচেতন হে ;
একবার দয়া করি তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তার করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্যামি জানিছ যে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।

কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপা গুণে দেখি শুভক্ষণে
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন।

ব্রাহ্ম উপসনাসঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতে রূপান্তরিত করার এই প্রথম প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, জাতীয়তাবোধ তখন শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে কতখানি সজাগ হয়েছিল, এটি তার প্রমাণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল তখন, এবং শিবনাথ শাস্ত্রী তার আচার্যরূপে এই মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবোধকেই জাগিয়ে তুলেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন :[১৮]

যখন ব্রাহ্মসমাজে এই সকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে আর-এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মনুষ্যদের কর্ম্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উপযুক্ত একটী রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক।...এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল...আনন্দমোহন বাবু সম্পাদক, সুরেন বাবু সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজনে কমিটীর সভ্য, আমি প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত-সভা বসিল। আমরা ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীটে একটী ঘর ভাড়া করিয়া ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপিস-ঘরের অবস্থা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার কাব্যে লিখিলেন, 'কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেঁড়ে'। বাস্তবিক উহার দশা ঐ প্রকারই ছিল।

এই ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু

থাকিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তখন ভারত-সভার ঘরে কমিটীর সম্মতিক্রমে 'সমদর্শী' দলেরও বৈঠক চলিত।...যে চিরস্মরণীয় রাত্রে কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ হয়, সে রাত্রে এই ভারত-সভার গৃহেই আমাদের বৈঠক হইয়াছিল। বলিতে কি ভারত-সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। একই লোক দুদিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্য্য চলিয়াছিল।

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই সময়টিকে একটি সন্ধিক্ষণ বলা যায়। এই সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য একাধিক কারণে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হল, নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই সময় বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্রুত প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে তাঁদের জাতীয় চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও ঘটে। যে নতুন জাতীয়তাবোধে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন, তার প্রধান দুটি উপাদান হল আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মগৌরববোধ। পূর্বের অন্ধ পাশ্চাত্ত্যভাবপ্রীতি ও প্রবল অনুচিকীর্ষার বদলে নবজাতীয়তাবোধ তাঁদের ক্রমে স্বদেশের অতীত মহিমা ও ঐতিহ্যকীর্তনের পথে পরিচালিত করল। তাঁদের প্রথম মানসিক প্রতিক্রিয়া তাই স্বভাবতঃই বেশ খানিকটা যুক্তিহীন আবেগসর্বস্ব উগ্ররূপ ধারণ করল। অতীত মহিমা ও ঐতিহ্যও হল হিন্দুভাবপ্রধান, তার কারণ যে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী নব্য-স্বাদেশিকতাবোধ থেকে ঐতিহ্যসজাগ হয়েছিলেন, তাঁরা প্রধানত ছিলেন হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলার সমাজের এই নতুন ভাবতরঙ্গ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজী 'আত্মজীবনচরিতে' লিখেছেন :[১৯]

When in 1879 I left the University...the Brahmo Samaj was still a great intellectual and moral force in the country. Middle-Nineteenth Century Rationalism and

Individualism of European culture were still the dominating ideas in the life and evolution of modern Bengal. But the conflict of political interests between the new generation of English-educated Indians and the British officialdom in the country, and the more fundamental cultural conflict between European modernism and Indian mediaevalism soon provoked a new revolt against this foreign domination in the wake of which rapidly followed a new national self-consciousness which, in the first flush of its new-found pride of race and culture, commenced to repudiate whatever was foreign, irrespective of the intrinsic reason and value of it, and set up a new defence even of those social institutions and religious and spiritual tendencies that had previously been openly repudiated as false and harmful.

অনেক কারণে এই মানসিক প্রতিক্রিয়া সেদিনকার শিক্ষিত বাঙালী সমাজে দেখা দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র দুটি প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি কারণ হল, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা মধ্যযুগীয় হিন্দুভাবধারা প্রচুর পরিমাণে আমদানি করেছিলেন। তার ফলে, বাংলার প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল, তা থেকে সামলে ওঠা তার পক্ষে সহজে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় কারণ হল, থিয়োজফিকাল সোসাইটির আন্দোলন। আনুমানিক ১৮৭৬ সালে ওলকট (Col. Olcott) ও মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি (Madmae Blavatsky) বোম্বাইয়ে আসেন এবং থিয়োজফিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন: "And the Theosophical Society which they founded was perhaps the most powerful of the forces that brought in this movement of Hindu religious revival and social reaction."

এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারা ও মুখপাত্ররা আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজের কাছে বড় গলায় প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে, এদেশের প্রাচীন ভাবধারা, ঐতিহ্য, শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের বাণী সমগ্র মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এবং তা সীমাবদ্ধ যুগসত্য নয়, যুগোত্তীর্ণ শাশ্বত সত্য। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও সত্য তার চেয়ে বড় নয়, এবং এদেশের এই সব সনাতন ভাবধারা ও সত্য পরিহার করে তা গ্রহণ করাও উন্নতির বা প্রগতির পরিচায়ক নয়। পাশ্চাত্ত্য সমাজের সুশিক্ষিত প্রতিনিধিরাই যখন এই কথা আমাদের সামনে বলতে, আরম্ভ করলেন, তখন স্বভাবতঃই অতীত ঐতিহ্যের গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল এবং অতীতের বাছা-বাছা মন্দগুলিকেও আমরা ভাল বলে জোরগলায় প্রচার করতে লাগলাম। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন :[২০] "This new message coming from the representatives of the most advanced peoples of the modern world, the inheritors of the most advanced culture and civilization the world has as yet known, at once raised us in our own estimation and created a self-confidence in us that commenced to find easy expression in a new propaganda which, instead of apologising for our current and mediaeval ideas and institutions and seeking to reform and reconstruct these after modern European ideals, boldly stood up in defence of them." বাংলাদেশে এই আন্দোলনই নবজাতীয়তাবোধের তরঙ্গের সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুত্থানধারায় মিশে গেল।

এই পুনরুত্থানধারার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমত, বাঙালী মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য বিচার করা দরকার, এবং দ্বিতীয়ত, বাংলার নব্য-স্বাদেশিকতাবোধের হিন্দু-ঐতিহ্যকেন্দ্রিক ক্রমপ্রকাশের ধারাটিও লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতিতে

কতখানি তারতম্য ঘটে, ১৮৭১-৭২ সালের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট থেকে তা বোঝা যায় :

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোটসংখ্যা
স্কুলের ছাত্র	১৪৯,৭১৭	২৮,০৯৬	১৫,৪৮৯	১৯৩,৩০২
আর্টস্ কলেজের ছাত্র	১,১৯৯	৫২	৩৬	১,২৮৭
মোট	১৫০,৯১৬	২৮,১৪৮	১৫,৫২৫	১৯৪,৫৮৯

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এই রিপোর্ট-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :[২১] "This result shows that the education of Musalmans demands much careful attention. They have fallen behind the time, and require still the inducements held out forty years ago to the whole community, but of which the Hindus only availed themselves." ১৮৮১-৮২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ও তার আনুপাতিক হার ছিল এই :[২২]

	ডিপার্টমেণ্টাল কলেজ		'এডেড' কলেজ		'আন-এডেড' কলেজ		মোট	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
ছাত্রসংখ্যা	১২১৪	৭৫	৮০৭	৩০	৫০৯	১	২৫৩০	১০৬
মোট ছাত্রের শতকরা হার	৯৩·০৩	৫·৭৫	৯০·১৭	৩·৩৬	৯৪·৬১	·১৯	৯২·৪১	৩·৮৭

উচ্চশিক্ষার দিক থেকে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা যে কতখানি পিছিয়ে পড়েছিলেন, তা এই হিসেব থেকে বোঝা যায়। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৯৫ জনই হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা যে অনেক বেশী দ্রুতহারে বাড়ছিল তাও এই হিসেব থেকে বোঝা যায় :[২৩]

উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের আবেদনপত্র ॥ বিপক্ষে

সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও হিন্দুদের বিধবাবিবাহের
আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপাঙ্ক

১৮৮১-৮২ সালে আর্টস কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা

বাংলাদেশ :	২৭৩৮
মাদ্রাজ :	১৬৬৯
বোম্বাই :	৪৭৫
পঞ্জাব :	১০৩
মধ্যপ্রদেশ :	৬৫

বাংলাদেশ বোম্বাই মাদ্রাজ, ভারতের এই তিনটি প্রধান প্রদেশে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা কি হারে বাড়ছিল, এবং তাদের মধ্যে কতজন কি ধরনের কাজ-কর্মে নিযুক্ত হচ্ছিল, তা নিচের এই তালিকা থেকে বোঝা যায় :[২৪]

	১৮৭১—১৮৮২				
	গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা	ব্রিটিশ ও দেশীয় পাবলিক সার্ভিসে নিযুক্ত	আইন-ব্যবসায়ে নিযুক্ত	মেডিক্যাল	ইঞ্জিনিয়ারিং (সিবিল)
মাদ্রাজ	৮০৮	২৯৬	১২৬	১৮	...
বোম্বাই	৬২৫	৩২৪	৪৯	৭৬	২৮
পঞ্জাব	৩৮	২১	৫	...	...
মধ্যপ্রদেশ	১৪	৮	...	...	...
বাংলাদেশ	১৬৯৬	৫৩৪	৪৭১	১৩১	১৯

বাংলাদেশে মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা মাদ্রাজের দ্বিগুণ, বোম্বাইয়ের প্রায় আড়াইগুণ। শিক্ষিতদের মধ্যে ব্রিটিশ ও দেশীয় পাবলিক সার্ভিসে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী, মাদ্রাজের প্রায় দ্বিগুণ, বোম্বাইয়ের প্রায় দেড়গুণ। আইনব্যবসায়ীর সংখ্যা বাংলাদেশে মাদ্রাজের প্রায় চার-গুণ, এবং বোম্বাইয়ের প্রায় দশগুণ। ডাক্তারের সংখ্যাও বাংলাদেশে সর্বাধিক, মাদ্রাজের প্রায় আটগুণ, বোম্বাইয়ের প্রায় দ্বিগুণ। ১৮৭১-১৮৮২ সালের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা, এবং শিক্ষিত চাকুরিজীবী ও স্বাধীন বৃত্তিজীবীর সংখ্যা বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশী বেড়েছিল। বিভিন্ন আয়গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা

(income-groups) থেকে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের রূপটি আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কত আয়ের কত লোক আছে, তার একটি হিসেব দাখিল করা হয়। এই হিসেবটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন :[২৫]

	বার্ষিক আয় ৫০০৲—১০০০৲ লোকসংখ্যা	বার্ষিক আয় ১০০০৲—২০০০৲ লোকসংখ্যা	বার্ষিক আয় ২০০০৲—১০০০০৲ লোকসংখ্যা	বার্ষিক আয় ১০০০০৲—১ লক্ষ লোকসংখ্যা	বার্ষিক আয় ১ লক্ষের অধিক
মাদ্রাজ	৪৬০৩৯	৯৩৯৮	৪৮২০	৪১৫	২২
বোম্বাই	৭৯৩৭১	৩৭১২৭	১৪৭৪৯	১৪৫৬	২০৮
বাংলাদেশ	১৪২৯৪৭	২৬২০০	১৬৬৯১	২৫০৮	১৮০

এই আয়ের হিসেবটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মাসিক ৪০৲-৫০৲ টাকা থেকে ৮০৲-৯০৲ টাকা আয়ের নিম্ন-মধ্যবিত্ত (Lower Middle-class) লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী, মাদ্রাজের তিনগুণ, বোম্বাইয়ের প্রায় দ্বিগুণ। মাসিক ৮০৲-৯০৲ টাকা থেকে ১৫০৲-১৭৫৲ টাকা আয়ের সাধারণ মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাংলাদেশে যথেষ্ট, তবে বোম্বাইয়ের তুলনায় কম। মাসিক ১৫০৲-২০০৲ টাকা থেকে ৮০০৲-৯০০৲ টাকা আয়ের উচ্চ-মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাও তখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ছিল, বোম্বাইয়ের চেয়ে কিছু বেশী এবং মাদ্রাজের প্রায় চারগুণ। এমনকি তার চেয়েও উচ্চতর স্তরের ধনিকের সংখ্যা (যাঁদের বার্ষিক আয় ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা) বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ছিল দেখা যায়, বোম্বাইয়ের প্রায় দ্বিগুণ, মাদ্রাজের প্রায় ছগুণ। সর্বোচ্চ স্তরের ধনিক, যাঁদের বার্ষিক আয় একলক্ষ টাকারও বেশী, তাঁদের সংখ্যা বোম্বাইতে সর্বাধিক হলেও, বাংলাদেশে তার চেয়ে খুব বেশী কম ছিল না। বোম্বাইতে ছিল ২০৮ জন, আর বাংলাদেশে ছিল ১৮০ জন, মাত্র ২৮ জন কম। মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিম্ন-মধ্য-উচ্চ-উচ্চতর-সর্বোচ্চ সকল স্তরেই

দেখা যায়, বাঙালীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী (একমাত্র সর্বোচ্চ স্তরটি ছাড়া), এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংখ্যা অত্যধিক। এর কারণ, আমরা আগে দেখেছি, বাংলাদেশে সাধারণ-শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত দুয়েরই বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ডালহৌসির আমল থেকে সাধারণ উন্নয়নকর্মের খাতে সরকার যখন বেশী পরিমাণে টাকা খরচ করতে আরম্ভ করেন, তখন নানারকম কাজকর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যাও (Volume of Employment) দ্রুত বাড়তে থাকে। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা তখন যেহেতু বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ছিল, সেইজন্য চাকুরির সুযোগও তাঁরাই সবচেয়ে বেশী পেয়েছিলেন। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চস্তরের আয়ের লোক-সংখ্যা সেই কারণেই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী হয়েছিল।

মধ্যবিত্তের এই বিপুল কলেবরবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশী এই শ্রেণীর মধ্যেই জাতীয়তাবোধ জেগেছিল। আত্ম-মর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের অনেক পশ্চাতে ছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা বহুগুণ বেশী ছিল। সুতরাং বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষপাদে যে বিশালকায় মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল তা হিন্দুপ্রধানই ছিল; মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই দেখা যায়, মধ্যবিত্তের যে জাতীয়তা-বোধের বিকাশ হল এই সময় বাংলাদেশে, তার মধ্যে হিন্দুত্বের সুর ও রং মিশে গেল সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ বাংলার নবজাতীয়তাবোধ প্রধানত হিন্দু-ঐতিহ্যনির্ভর হয়ে বিকাশলাভ করতে থাকল।

হিন্দু-ঐতিহ্যের পুনরুত্থানের আরও একটি কারণ ছিল বলে মনে হয়। বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিপুল সংখ্যা থেকে বোঝা যায়, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছাড়াও বাংলার নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও, আর্থিক আয় ও শিক্ষা দুয়েরই বলে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের নতুন মধ্যবিত্তের শ্রেণীরূপায়ণ হয়েছিল হিন্দুসমাজের সর্ববর্ণের সংমিশ্রণে। প্রথম পর্বে যখন সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে মধ্যবিত্তের বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিল, তখন উদার-নীতির (liberalism) আভিজাত্যই ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরে

যখন মধ্যবিত্তের স্তরে সর্ববর্ণের লোকের দ্রুত মিশ্রণ ঘটতে থাকল, তখন তার উদারনীতির মোলায়েম সুরের মধ্যেও বেসুরো বহু নীতি-আদর্শের ঝঙ্কার শোনা গেল। সমাজের বর্ণবিন্যাসের যত নিম্নস্তরে যাওয়া যায়, তত দেখা যায় তার ঐতিহ্য-গোঁড়ামি বাড়ছে। যে-কোন সমাজের ক্ষেত্রে একথা সত্য, হিন্দুসমাজের ক্ষেত্রে তো বটেই। সুতরাং বহুবর্ণের সংমিশ্রণে বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী যখন বিশাল আকার ধারণ করতে থাকল, তখন তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও খানিকটা ঐতিহ্য-গোঁড়ামির দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করল। সামাজিক গতির এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কার্ল ম্যানহাইম বলেছেন :[২৬]

> If a society in which the various classes have very unequal standards of life, very unequal opportunities for leisure, and vastly dissimilar opportunities for psychological and cultural development, offers the chances of cultural leadership to larger and larger sections of the population, the inevitable consequence is that the average outlook of those groups which have been doomed to a more unfortunate position in life, tends more and more to become the prevalent outlook of the whole society. Whereas in an aristocratic society in which a very small minority was culturally active, the low average level of culture of the less fortunate classes was confined to their own sphere of life; now as a result of large-scale ascent, the limited intelligence and outlook of the average person gains general esteem and importance and even suddenly becomes a model to which people seek to conform.

বাংলার হিন্দুপ্রধান মধ্যবিত্তের এই ক্রমবর্ধমান মিশ্ররূপ সমাজের প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারাকে উনিশ শতকের সত্তর থেকে ক্রমে অতীত-ঐতিহ্যমুখী

করে তুলেছিল। কিন্তু এর চেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে বর্ধিষ্ণু বাঙালী মধ্যবিত্তের মন জাতীয় ঐতিহ্যের ঔজ্জ্বল্যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমেই সাবালক হয়ে উঠছিল, এবং দেশাত্মবোধের বিকাশের সঙ্গে তার সাবালকত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ হচ্ছিল জাতীয় ঐতিহ্যপ্রীতির মধ্যে। মধ্যবিত্তের হিন্দুপ্রাধান্যের জন্য এই ঐতিহ্য-প্রীতিও হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠছিল। উনিশ শতকের ষাটের মাঝামাঝি থেকে এই ধারার উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। এতদিন যাঁরা প্রগতিশীল সমাজচিন্তার ধারাকে নানাদিক থেকে বলিষ্ঠ করে তুলেছিলেন, তাঁরাই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই হিন্দুভাবধারা প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন। রাজনারায়ণ বসু কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত "জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা" থেকে আমরা এই নব্য-চিন্তাধারার ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাজনারায়ণ বসু এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সভার কার্যবিবরণ—*Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal*—১৮৬৬ সালের গোড়ার দিকে National Paper-এ ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' মুদ্রিত হয়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, যে 'জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভার' সভ্যেরা 'good night' না বলে 'সুরজনী' বলতেন; ১লা জানুয়ারি পরস্পর অভিনন্দন না জানিয়ে ১লা বৈশাখে জানাতেন; বাংলার সঙ্গে ইংরেজী না মিশিয়ে বিশুদ্ধ বাংলাতে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করতেন এবং যিনি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন তাঁর এক-পয়সা করে জরিমানা হত।[২৭]

সভার উদ্যোক্তাদের দেশাত্মবোধ যে কত প্রখর ছিল তা এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়। যে-সব বিষয়ের দিকে রাজনারায়ণ দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন সেগুলি এই: ইংরেজীশিক্ষার আগে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সংস্কৃত ও বাংলাভাষার অনুশীলন, শুদ্ধ বাংলাভাষায় কথোপকথন, বাঙালীকে বাংলায় পত্র লেখা, বাঙালীর সভায় বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমাজসংস্কার করা, দেশীয় উৎসব-অনুষ্ঠান রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি রক্ষা করা, বিদেশী পরিচ্ছদ বর্জন করে দেশীয় পোশাক

ব্যবহার করা, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা, দেশীয় সঙ্গীত ও দেশীয় ব্যায়াম খেলাধুলা ইত্যাদি চর্চা করা। এই অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলা' ('চৈত্র মেলা' ও 'জাতীয় মেলাও' বলা হত) প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মেলার কার্যনির্বাহক সভার নাম হয় 'জাতীয় সভা'। ১৮৬৭ সালে 'হিন্দু মেলার' প্রথম অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

> এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্রিত হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা 'হিন্দু মেলা' ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।
>
> ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। ...মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে ; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।

মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মনোমোহন বসু বলেন : "ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়াবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষরা অথবা অপরাপর ইংরাজ

মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্র মেলায় নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীর উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।

১৮৭৩ সালে যখন বারুইপুরে (দক্ষিণ ২৪-পরগণা) হিন্দু মেলার অধিবেশন হয়, তখন মনোমোহন বসু দেশের জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা বর্ণনা করে এই গানটি রচনা করেন :

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন !
ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই কাটি—তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে—
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান থেকেই বাংলাদেশে প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বলা চলে। কিন্তু এই স্বাদেশিকতা হিন্দু ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই পুষ্টিলাভ করতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজই এই হিন্দুত্বের ভাবধারাকে খানিকটা প্রতিরোধ করতে পারত, কিন্তু তা করার মতন তখন তার অবস্থা ছিল না। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের মধ্যে অনেকেই তখন হিন্দুধর্মের জালে জড়িয়ে পড়েছেন, এবং তার শ্রেষ্ঠতা প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কেশবচন্দ্র সেন অবতারবাদ, সংকীর্তন, ভক্তিবাদ প্রভৃতি আমদানি করেন। প্রবীণ রাজ-নারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম ও আদর্শকে বৈদেশিক আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুধর্মের নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। 'আত্মচরিতে' রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে।

আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি।" জাতীয় সভার অধিবেশনে তিনি ১৮৭২, ১৫ সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতা শুনে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার' ভারতচন্দ্র শিরোমণি, কালীকৃষ্ণ দেব প্রমুখ সভ্যেরা মুগ্ধ হন এবং তাঁকে প্রশংসা করেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁকে সনাতন ধর্ম্মসভায় ঐ বিষয়ে পুনরায় বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু রাজনারায়ণ লিখেছেন, "সাকারবাদীদিগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার ভয়ে আমি তাহা হইতে বিরত হই।" সনাতনধর্মীদের মধ্যে অনেকে তাঁকে 'হিন্দুকুল-চূড়ামণি' বলে সম্বোধন করতেন। হিন্দুসমাজের গোঁড়া নেতা শিবচন্দ্র গুহ বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন, রাজনারায়ণ বসুর একটি প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করা কর্তব্য। ত্রিবেণীর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ একটি উপাসনাসভায় তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "রাজনারায়ণবাবু অন্য জাতের ব্রাহ্ম, হিন্দু-ব্রাহ্মও বলা যায়।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই বক্তৃতা সম্বন্ধে লেখেন : "রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক।"

এগুলি উল্লেখ করার কারণ হল, প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসুর ধর্মচিন্তা গোঁড়া হিন্দুদের যে কতখানি উৎসাহিত করেছিল তারই প্রমাণ দেওয়া। পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের প্রবল টানে ব্রাহ্মসমাজের নীতি-আদর্শের বড় বড় স্তম্ভগুলি পর্যন্ত উপড়ে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। নবীন ব্রাহ্মদের 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির জাতীয়তাবাদী ব্রাহ্ম আদর্শ, ব্রাহ্ম আন্দোলনের অধঃপতনের এই গতি সেদিন প্রতিরোধ করতে পারেনি। হিন্দু ঐতিহ্য ও গোঁড়ামির পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলন এই কারণে, উনিশ শতকের সত্তরে ও আশীতে, অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। একদিকে রাজনারায়ণ-নবগোপাল-বঙ্কিমচন্দ্র এবং আর-একদিকে শশধর তর্কচূড়ামণি-অক্ষয়চন্দ্র সরকার-কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এই আন্দোলনকে নানাভাবে শক্তিশালী করে তোলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন : "He had the power to rouse popular sentiments by vulgar witticism and through playing upon words." শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে লিখেছেন যে তিনি "adopted a

new line of interpretation seeking to reconcile ancient Hindu ritualism and mediaeval Hindu faith with modern science." অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্বন্ধে লিখেছেন যে তিনি বোধ হয় "most powerful opponent of progressive social views" ছিলেন।[২৮] বাংলা রঙ্গালয়ে এই সময় প্রগতিশীল ভাবধারা ও আন্দোলনকে লক্ষ্য করে প্রচুর ব্যঙ্গাভিনয় হতে থাকে। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন : "While Bankim Chandra's 'Prachar' and Akshay Babu's 'Nabajeevana' tried to combat Brahmo rationalism by argument, the Bengalee stage sought to kill the social idealism of it by satire and ridicule." উনিশ শতকের প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা এই সময় বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বের সংস্কারকরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন, হিন্দু-ঐতিহ্যের ও নব-জাতীয়তার প্রবল জোয়ারের টানে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রচার', 'নবজীবন', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় এই সময় সমাজসংস্কারের নানাদিক নিয়ে যেসব আলোচনা হয় তা পঁচিশ বছর পূর্বের সাময়িক পত্রিকার আলোচনার সুরের সঙ্গে তুলনা করলে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। সমাজের প্রবহমান ভাবতরঙ্গ যে কিভাবে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত হয় তা উনিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের এবং সত্তর-আশীর পত্রিকাগুলি পাশাপাশি পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়।

এই রক্ষণশীল আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সমাজের প্রগতিশীল আদর্শকে যে কতখানি আঘাত করেছিল, এবং কিভাবে করেছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। উৎকট হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারকার্য যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তখন ১৮৮৪ সালে 'সাবিত্রী লাইব্রেরীর' একটি সভায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তরুণ বিপিনচন্দ্র পাল এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অক্ষয়-চন্দ্রের বক্তৃতার প্রতিবাদ করে তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার পর 'নবজীবন' 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবাবিবাহের

সামাজিক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। বিতর্কের মধ্যে রক্ষণশীল চিন্তাধারাই প্রাধান্য লাভ করে। জীবনসায়াহ্নে বিদ্যাসাগর তখন, নিশ্চয় ব্যথিতচিত্তে, তাঁর উত্তরপুরুষদের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। তরুণ বাংলা তখনও অবশ্য তাঁর আদর্শের দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিল। তিনি দেখছিলেন, হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রয়ী নব্যস্বাদেশিকতার প্রবল ঝড়ে সেই শিখা প্রায় নিভনিভ হয়ে আসছে। কিন্তু পশ্চাদ্‌মুখী ঝড় যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, হঠাৎ তার ঝাপটায় চলমান সমাজের অগ্রগতির আদর্শ কখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তরুণ বাংলার প্রতিমূর্তি বিপিনচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর শেষজীবনের নিষ্প্রভ দৃষ্টি দিয়ে আশার এই ক্ষীণ আলোকটুকু দেখতে পেয়ে হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন।

১১ | সাহিত্য ও সাংবাদিকতা

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা বলে পরিচিত। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগর বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন বেশী, সাহিত্য রচনা বিশেষ করেননি। কিন্তু বাংলা গদ্যভাষা তখন বিকাশের এমন স্তরে ছিল যে তা দিয়ে সাহিত্য রচনা করা সম্ভব ছিল না। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষাকে নতুন সাহিত্যের যোগ্য বাহনরূপে গড়ে তুলেছিলেন। নিরাকার একখণ্ড পাথরকে ভাস্কর যেমন বাটালি দিয়ে কেটে-কুঁদে সুন্দর মূর্তিতে রূপায়িত করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি শ্রীছাঁদহীন বাংলাভাষাকে সংযত ও সুবিন্যস্ত করে শিল্পরূপ দান করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যভাষার শিল্পী যিনি, তাঁর পক্ষে তাই পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু বাংলাভাষার আদি রূপশিল্পী যিনি, তিনি পাঠ্যপুস্তকের লেখক হলেও, বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান চিরস্থায়ী হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের এই দানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন :[১]

> বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা

আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ-যোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণের পুনর্ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যভাষার আদিস্রষ্টা বিদ্যাসাগরকে রবীন্দ্রনাথ

কেবল ভাষা-ভাস্করের সম্মান দেননি, তাঁকে আদিকবিরূপেও সম্মানিত করেছেন। তাঁর বাল্যজীবনের শিক্ষারম্ভের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :[২]

"কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বিদ্যাসাগর যে কেবল ভাষাশিল্পী ছিলেন না, সাহিত্যস্রষ্টাও ছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—এই চারটি মাত্র কথার ঝংকার বিশ্বকবির বালকচিত্তে এক বিচিত্র অনুরণনের সৃষ্টি করেছিল। সারাজীবন তিনি সেই অনুভূতি ভুলতে পারেননি। ঘটনাটা যত 'সাধারণ' মনে হয়, তত 'সাধারণ' নয়। কিছুটা অসাধারণ না হলে এইভাবে 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ একথা উল্লেখ করতেন না। সেই অসাধারণত্ব হল, ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যরসবোধ, এবং তাঁর গদ্যরচনার সাহিত্যরসোত্তীর্ণ গুণ। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্যভাষার রচয়িতারা এই গুণের অধিকারী হতে পারেননি। বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর সেইজন্য তাঁর পূর্বসূরী ও সমকালীনদের মধ্যে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। কেবল পাঠ্যপুস্তক রচনা করলেও, সেই স্থান থেকে তাঁকে একটুও বিচ্যুত করা যায় না।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর ইংরেজ সিবিলিয়ানদের এদেশের ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য একটি বাংলা-বিভাগ খোলা

হয়। পাদ্রি উইলিয়ম কেরি বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সিবিলিয়ান-দের বাংলা পড়াতে গিয়ে কেরি পাঠোপযোগী গদ্যগ্রন্থের অভাব বোধ করেন, এবং তাঁর সহকারী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু প্রমুখ বাঙালী পণ্ডিতদের বাংলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে উৎসাহিত করেন। এই সময় থেকেই আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁদের গদ্যরচনায় সেকালে পণ্ডিতীরীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের রচিত বেশীর ভাগ বই ছিল সংস্কৃতের অনুবাদ। এই সব অনূদিত গ্রন্থে সংস্কৃতরীতিরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। রামরাম বসু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, এবং তিনি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। রামরামের রচনারীতি সাধু-ভাষানুগত হলেও পণ্ডিতীরীতি নয়, কতকটা কথকতা ধরনের কথ্যরীতি। কেরির অনুরোধে রামরাম বসু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামে একখানি বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন: "I got Ram Boshu to compose a history of one of their Kings, the first prose book ever written in the Bengali language..." (Mr. Carey to Dr. Ryland, Serampore, June 15, 1801).[৩] রচনার নিদর্শন এই:

"দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকের-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে।"

রামরাম বসুর গদ্যরচনারীতির সারল্য ও বৈমল্য লক্ষণীয়। কথ্যভাষা, সাধুভাষা ও বিদেশীভাষার সংমিশ্রণে রামরামের গদ্যরীতিতে অনেক সময় বৈপরীত্যদোষ ঘটেছে। লৌকিক বাক্‌ভঙ্গির জন্য তাঁর গদ্য গাঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠেনি, এবং সাহিত্যের বাহনোপযোগিতা লাভ করেনি। সাধু প্রকাশভঙ্গির

সঙ্গে লৌকিক শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার অধিকাংশ সময় ভাষায় বেগ ও বলের সঞ্চার না করে, রচনাকে দুর্বল করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও রামরামের গদ্যরচনার প্রয়াস প্রশংসনীয় বলতে হয়, কারণ বাংলা গদ্য প্রায় ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে রামরাম বসু ছাড়া উইলিয়ম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির বাংলা গদ্যসাহিত্যে দান আছে। তাঁরা প্রত্যেকেই গদ্য রচনা করেছেন, কিন্তু সেই রচনার মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব ছিল না। সেইজন্য তাঁদের রচনার ভিতর দিয়ে বাংলা গদ্যভাষার প্রাথমিক বিকাশের ধারাও বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। এই পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। তাঁর রচিত 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮) ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় নানাদিক থেকে বিশুদ্ধ বাংলা গদ্যরীতির পরীক্ষা করেছেন। তার রচনার নিদর্শন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—

> সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার ও আমার আহার হউক। বানর কহিল শুন হে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট করিব না।
>
> (বত্রিশ সিংহাসন)
>
> যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে

> সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। (রাজাবলি)

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার এই দুটি নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, বাংলা গদ্যভাষার বাল্যকালেই তিনি কতখানি তাকে সাহিত্যের বাহন হবার উপযোগী করে তুলেছিলেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' বা 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র মধ্যে তিনি দুরূহ পণ্ডিতীভাষা ব্যবহার করলেও, কেবল সেইটাই তাঁর বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা উচিত নয় বলে মনে হয়। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ পণ্ডিতেরা কেউ কেউ মৃত্যুঞ্জয়ের এই পণ্ডিতী গদ্যরীতির উৎকটত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতার' মধ্যে 'প্রবোধচন্দ্রিকার' "কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরান্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে", এই বাক্যটি বারংবার উদ্ধৃত করে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার সমাসবদ্ধ জড়ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে বিভক্তিচ্যুত ও ছন্দমুক্ত করে এই চলৎশক্তিহীন কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি কখনই নিজে এই ধরনের সমাসবহুল রচনাকে গদ্যভাষার আদর্শ বলে মনে করেননি। তা যদি করতেন, তা হলে 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'রাজাবলি'র মতন গদ্যগ্রন্থ রচনা করতে পারতেন না। তিনি যেমন সাধুভাষায় চমৎকার গদ্য রচনা করেছেন, তেমনি চলতি ভাষাতেও যে রচনাকুশলতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাঁর চলতি ভাষার নমুনা এই :

> যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাকপাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি।

মৃত্যুঞ্জয়ের এই ভাষা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :[৪] "ইহা যে খাঁটি বাঙ্গলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস।

ইহার গতি মুক্ত; ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই।” চৌধুরী মহাশয় মৃত্যুঞ্জয়ের এই গদ্যরীতিকে সত্যকার ‘বঙ্গীয় রীতি’ বলেছেন। কালের দিক থেকে ও ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে বাস্তবিকই মৃত্যুঞ্জয়কে বাংলা গদ্যভাষার সাধু ও চলিত উভয় রীতির আদি প্রবর্তক বলতে হয়।

ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী ছাত্রদের পাঠোপযোগী বই গদ্যভাষায় রচনা করেছিলেন, এবং তাও প্রধানত বিদেশী ছাত্রদের জন্য। তাঁদের রচনায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, জ্যোতিষ, রাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি নানাবিষয়ে অনেক জ্ঞানের কথার উল্লেখ থাকলেও, রচনানৈপুণ্যের নিদর্শন বিশেষ নেই। ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ গ্রন্থের ‘বিজ্ঞাপনে’ লেখা আছে, “এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং ইহার লিপিনৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন বলা যাইতে পারে।” একথা মিথ্যা নয়। ‘প্রবোধচন্দ্রিকার’ মতন গ্রন্থ পাঠ করলে ছাত্রদের বাংলাভাষায় জ্ঞান তো হবেই, সংস্কৃতভাষায় ও শাস্ত্রেও বেশ কিছুটা জ্ঞান জন্মাবে। কিন্তু বাংলা গদ্যভাষার আসল রীতি সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও, বএং বাংলা গদ্যরীতি সম্বন্ধে সচেতনভাবে তিনি নানাবিধ পরীক্ষা করলেও, উপযুক্ত প্রেরণার অভাবে তিনি বাংলা গদ্যভাষার আধুনিক যুগোপযোগী রূপ দিতে অনেকটা ব্যর্থই হয়েছিলেন বলা চলে। গদ্যভাষা হল বুদ্ধিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান ভাষা। প্রাঞ্জলতা, প্রত্যক্ষতা, বলিষ্ঠতা ও গতিশীলতা তার প্রধান ধর্ম। পাঠ্যপুস্তক রচনায় পণ্ডিতলেখকরা গদ্যভাষায় এই সব গুণের সমাবেশ করতে পারেননি। তা করবার মতন ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গীও সকলের ছিল না, এবং সেকালের পণ্ডিতী মনোভাব থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেননি। এমনকি মৃত্যুঞ্জয়ের মতন সুদক্ষ ও সচেতন গদ্যলেখকেরও দোষত্রুটি ছিল যথেষ্ট। ‘প্রবোধচন্দ্রিকার’ রচনা সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন অভিযোগ করেছেন :‘ “কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া থালা, ঘটী, বাটি, বস্ত্র, পুস্তক, পেড়া, বাক্স, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, লেপ, কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর প্রভৃতি বস্তুসকল একত্র বিশৃঙ্খল ও উপর্য্যুপরিভাবে অবস্থাপিত দেখিলে নয়নের যেরূপ অপ্রীতি জন্মে,

'প্রবোধচন্দ্রিকা' পাঠেও সেইরূপ অপ্রীতি উপস্থিত হয়; ঐ সকল বস্তু সুশৃঙ্খলভাবে যথাযথস্থানে সজ্জীকৃত দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, ইহাতে সে আহ্লাদ জন্মে না।" ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। চৌধুরী মহাশয় বাংলা গদ্যভাষার যে 'বঙ্গীয় রীতির' আদি প্রবর্তক বলে মৃত্যুঞ্জয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তা যোগ্য অভিনন্দন স্বীকার করেও বলা যায় যে মৃত্যুঞ্জয় গদ্যভাষায় যথার্থ শৃঙ্খলা ও গতিবেগ সঞ্চার করতে পারেননি। তবু বাংলা গদ্য রচনায় যতটুকু শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন; তা কালের বিচারে সত্যই বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর পর বাংলা গদ্য রচনায় সম্পূর্ণ এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন রামমোহন রায়। তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সাধারণের জ্ঞাতব্য ও পঠিতব্য নানাবিষয় নিয়ে গদ্য রচনা করেন। সেই কারণেই রামমোহনের গদ্য সর্বপ্রথম গদ্য-ভাষার বিবিধ গুণে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

শিল্পকলার বিভিন্ন আঙ্গিকের মতন সাহিত্যেরও গদ্যভাষারীতির একটা বিশেষ সমাজতত্ত্ব আছে। কেন মানুষের আদিম ভাবপ্রকাশের ভাষা ছন্দোবদ্ধ কবিতা ও সঙ্গীতের ভাষা, এবং কেন ছন্দোবদ্ধ ভাষার অনেক পরে, সমাজ-জীবনের অনেক উচ্চ ও জটিল স্তরে গদ্যভাষার বিকাশ হল? তার কারণ কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দোবদ্ধ ভাষার উৎস হল মানুষের কয়েকটি মৌলিক অনুভূতি—ভয় ভক্তি দয়া করুণা প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সব অনুভূতিই ছিল মানুষের চিন্তাভাবনার প্রধান উপজীব্য। পারমার্থিক ও ঐহিক সমস্ত চিন্তার আদি উৎস ছিল এই সব মৌলিক অনুভূতি। জীবনযাত্রাও ছিল সহজ সরল ও গতানুগতিক। তার মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল না, বিস্তার ছিল না, দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল না এবং উত্থানপতনের গতিও বিশেষ ছিল না। একঘেয়ে একটানা ছন্দে জীবন কেটে যেত। মানুষের ও সমাজের সামনে কোন সমস্যা বা কোন প্রশ্ন জটিল রূপ নিয়ে দেখা দিত না, এবং বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে তার মীমাংসাও দাবী করত না। মানুষের ভাবপ্রকাশের ভাষা ছিল তার একঘেয়ে জীবনের

একটানা ছন্দের মতন নির্দিষ্ট ছন্দে বাঁধা। সেকালের সমাজ-জীবনে তাই ভাবপ্রকাশের জন্য মানুষের গদ্যভাষার প্রয়োজন হয়নি। পৃথিবীর কোন দেশেই হয়নি, বাংলাদেশেও হয়নি। মাত্রাবদ্ধ পয়ার ছন্দই ছিল সেকালের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বাহন এবং সাহিত্য ছিল তখন প্রধানত আবৃত্তি-সাহিত্য ও স্মৃতিসাহিত্য। তাছাড়া যে-সময় হাতেলেখা পুঁথির পাতায় বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া সাহিত্যভাষার আর কোন উপায় ছিল না, সে-সময় ভাষা ছন্দোবদ্ধ না হলে লোকসমাজে সাহিত্যের প্রসারও সম্ভব হত না। স্মৃতিশক্তির সহায়ক আবৃত্তির উপযোগী ভাষায় ছন্দোবদ্ধ কাব্য ও সঙ্গীতই তাই তখন রচিত হত বেশী। গদ্যভাষার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়েছে আধুনিক যুগে। কারণ আধুনিক যুগে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়, দ্বন্দ্বময় ও সংঘাতমুখর হয়ে উঠেছে, এবং জীবনযাত্রায় জটিলতা ও সচলতাও অনেক বেড়েছে। আধুনিক যুগে মানুষ এমন এক সামাজিক পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে যেখানে সংঘাত, সংশয় ও নানাবিধ সমস্যা মিলিত হয়ে এক জটিল আবর্ত রচনা করেছে তার সামনে। তার উপর গদ্যভাষার জন্ম হয়েছে ছাপাখানার যুগে, এবং সেইজন্য তার পাঠকগোষ্ঠীও অনেক বিস্তৃত হয়েছে। মুদ্রণের যুগে সাহিত্যের ভাষা বাঁধাধরা ছন্দের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গদ্যের রূপ ধারণ করেছে। সমস্যাসঙ্কুল ও সংঘাতমুখর আধুনিক সামাজিক পরিবেশে গদ্যভাষা হয়েছে বিচারবুদ্ধিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান আদান-প্রদানের ভাষা। এই হল গদ্যভাষার সাধারণ সমাজতত্ত্ব। এই সমাজতাত্ত্বিক কারণে বাংলাদেশে উনিশ শতকের গোড়া থেকে, সামাজিক জীবনের সমস্যা, সংঘাত ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাংলা গদ্যভাষার বিকাশ হতে থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমভাগে যাঁরা সামাজিক সংঘাত ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সবচেয়ে বেশী, প্রধানত তাঁরাই বাংলা গদ্যভাষাকে কালোপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। আধুনিক বাংলার সমাজ-সংগ্রামের প্রধান নায়ক রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার প্রকৃত স্রষ্টা।

নবযুগের বাংলার ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান নায়ক হলেন রামমোহন রায়। সমস্যা ও সংঘাতের আবর্তের

মধ্যেই তাঁর জীবন কেটেছে এবং অনেক দুরূহ জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়েছে। এই সামাজিক সমস্যার সংগ্রামে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী কৃপাণ হয়েছে তাঁর লেখনী, এবং স্বভাবতঃই সেই লেখনীর মুখে ভাবের বাহনরূপে যে ভাষা প্রকাশ পেয়েছে, সে হল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্তিদীপ্ত গদ্যভাষা। সমস্যাসঙ্কুল সামাজিক জীবনের প্রেরণা রামমোহনের গদ্যভাষার প্রধান উৎস ছিল বলে, তিনি বাংলা গদ্যভাষাকে সর্বপ্রথম সুসংযত, বলিষ্ঠ ও গতিশীল রূপ দিতে পেরেছিলেন।

রামমোহনের গদ্যভাষার ত্রুটী ছিল অনেক, তার মধ্যে দুটি ত্রুটী প্রধান। প্রথম ত্রুটী 'বিরামচিহ্নের অভাব', দ্বিতীয় ত্রুটী 'দূরান্বয়'। এই ত্রুটী সম্বন্ধে রামমোহন রায় নিজেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য রচনা 'বেদান্তগ্রন্থ' ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান' বা ভূমিকায় তিনি বাংলা গদ্যভাষার তাৎকালিক দোষত্রুটী ও তাঁর নিজস্ব রচনার দোষ বিশ্লেষণ করে লেখেন :

> প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন

যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিত কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়।

সরল, সুষম ও সুগম গদ্যরচনা সম্বন্ধে রামমোহন যে কতখানি সচেতন ছিলেন, তা তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। রামমোহনের এই বাংলা রচনা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন : 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।' রামমোহন যে 'জলের মতন' সহজ ভাষা লিখতেন,

একথা শুনে আজ আমরা নিশ্চয় বিস্ময় বোধ করব, কিন্তু তাঁর কালের লেখকদের রচনার তুলনায় তিনি যে সবচেয়ে সহজবোধ্য সরল গদ্য রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুপ্তকবি তাঁর গদ্যভাষা সম্বন্ধে বিশেষ অতিশয়োক্তি করেননি। তাঁর ভাষায় পারিপাট্য ও মিষ্টতা তেমন ছিল না, তা থাকতেও পারে না। গদ্যভাষার শব্দসমন্বয় ও বাক্যবিন্যাসের যে কঠিন সমস্যা ছিল, তা সমাধানের জন্য রামমোহন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন শব্দের বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদির যথার্থ অন্বয়সাধন করে, গদ্যরীতি অনুযায়ী সুষম বাক্য গঠনের চেষ্টায় তিনি অবশ্য সম্পূর্ণ কৃতকার্য হননি, কিন্তু যতটুকু হয়েছিলেন তাতে বাংলা গদ্যরীতির সাহিত্যিক ভিত্তি কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর রচনায় প্রাচীনত্বের ছাপ এবং পণ্ডিতীরীতির প্রভাব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যভাষাকে তিনি সেই প্রভাব থেকে খানিকটা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন : 'কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসংকল্প অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত।' এই বিবাদ-বিচারঘটিত লেখায়, অর্থাৎ polemical writing-এ রামমোহন অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেহেতু তাঁকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে হয়েছে এবং তাঁদের যুক্তিও খণ্ডন করতে হয়েছে, সেইজন্য তাঁর গদ্যরচনা যুক্তিবুদ্ধিপ্রধান হয়ে উঠেছে বেশী। বিবাদ ও বিচারকালে রামমোহন তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে যে সংযম ও শালীনতা-বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা তখনকার কালে দুর্লভ ছিল। কিন্তু তাঁর সুরুচিবোধ শেষ পর্যন্ত তাঁর রচনাকে বেশীমাত্রায় যুক্তিসর্বস্ব ও নীরস করে তুলেছিল। পাছে কটূক্তি করা হয় এই ভয়ে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে পরিহাস-ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহার করে চলতেন। হাস্যকৌতুক ব্যঙ্গরস অধিকাংশ সময় বিচারশীল রচনার প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠে। রামমোহনের গদ্যরচনা এই গুণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহীন হয়ে গেছে, এবং তা সহজবোধ্য হলেও সাধারণের কাছে উপভোগ্য ও সুখপাঠ্য হয়নি।

রামমোহনের পর বাংলা গদ্যরচনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত, খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে বাংলা গদ্যভাষার যে চর্চা হয়েছিল তাতে

গদ্যরীতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। রামমোহন বাংলা গদ্যের একটা নিজস্ব রীতি যতটুকু প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন এবং গদ্যভাষাকে যে স্তরে উন্নীত করেছিলেন, প্রায় সেই স্তরেই তা দীর্ঘকাল স্থিতিশীল হয়ে ছিল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের যুগে বাংলা গদ্যভাষার ও গদ্যরীতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, এবং এই সময় বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' পরিচালনায় বিদ্যাসাগর ছিলেন অক্ষয়কুমারের সহযোগী। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪৩, ১৬ আগস্ট প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকার Paper Committee-র বা প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর। সম্পাদক অক্ষয়কুমারের রচনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত জেগে প্রথমে সংশোধন করে দিতেন, তারপর গ্রন্থাধ্যক্ষদের কাছে পাঠাতেন। গ্রন্থাধ্যক্ষদের মধ্যে বিদ্যাসাগরই অক্ষয়কুমারের রচনা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করে দিতেন বেশী। জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস দর্শন পুরাবৃত্ত সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' নিয়মিত অনুশীলন করা হত। যাঁদের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' এই গম্ভীরভাবের রচনা প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার অন্যতম। অক্ষয়কুমারের রচনাশক্তির বিকাশে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে নানাদিক থেকে সাহায্য করেছিলেন।* কেবল গদ্যসাহিত্যের নয়, বাংলা জ্ঞানসাহিতের সমৃদ্ধিতে অক্ষয়কুমারের দান অতুলনীয়। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন: "তাঁহার রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞানপ্রদ। তিনি অতি দুরূহ বিষয় সকলও যেন চিত্রাঙ্কনপূর্ব্বক এমন সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠমাত্র সে সকল পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।" বাস্তবিকই তাই। জ্ঞানগম্ভীর দুরূহ বিষয়, যা পূর্বে কখনও বাংলাভাষায় আলোচিত হয়নি, তাই অক্ষয়কুমার তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রধান উপজীব্য করে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা',

* এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় খণ্ড' ২৬৭-২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', 'চারুপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। 'চারুপাঠ' সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখেছেন, "ইহার পূর্ব্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে কত নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থকার ইংরেজি গ্রন্থ হইতেই ঐ সকল বিষয় সংকলন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইংরেজির অনুবাদ। বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহা মূল রচনাই হইয়া যাইত।"

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থও অক্ষয়কুমার জর্জ কুম্বের (George Coombe) *Constitution of Man* অবলম্বনে রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা অনুবাদ বা সারগ্রন্থ হয়নি। তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের জন্য তা প্রায় মৌলিক রচনার মতন উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। বাংলা গদ্যভাষা তাঁর প্রতিভার স্পর্শে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছিল, তা তাঁর রচনার নিদর্শন থেকে বোঝা যায় :

> ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে ২ যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। (ভূগোল, ইং ১৮৪১)
>
> আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি

নাই, কোন কর্ম্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোন বিপদ মস্তকোপরি পতিত না হয় তত ক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও হয় না। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে এ দেশীয় লোক ইতর জন্তুর ন্যায় আহার বিহারাদি অলীক আমোদকেই জীবনের মূলাধার কার্য্য বোধ করেন, এ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কালের ঐন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে রাশি রাশি ধন সমর্পণ করেন ; কিন্তু ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে জগদীশ্বর কি নিমিত্তে তাঁহারদিগকে ইতর পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধির সহিত ভূষিত করিয়াছেন ? (শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, ইং ১৮৪৫)

দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক রূপে অবগত না থাকাতে মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। (বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রথম ভাগ, 'বিজ্ঞাপন', ইং ১৮৫১)।

অক্ষয়কুমারের এই গদ্যরচনায় দেখা যায়, রামমোহনের গদ্যের দূরান্বয়-দোষ লোপ পেয়েছে, এবং তার ফলে তাঁর বাক্যগঠন অনেক সবল, সাবলীল, সুষম ও সুগম হয়েছে। বাংলা গদ্যের সহজ সাধুরীতির আধুনিক রূপায়ণে অক্ষয়কুমার অনেকটা সার্থক হয়েছেন। শব্দবিন্যাসের দক্ষতায়, অন্বয়-সাধনে, বিরামচিহ্নের ব্যবহারে এবং বাক্যান্তর্গত গতি সঞ্চারে অক্ষয়কুমার বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই গদ্যরচনায় যে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ দান ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট, সে কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর দুজনে সমবয়সী ছিলেন, একজনের সাহিত্যপ্রতিভা অন্যের তুলনায় কম ছিল না। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দুজনেই সমান প্রগতিশীল ও উন্নতিকামী ছিলেন। বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিও দুজনের প্রায় সমান ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার

আন্দোলনের সঙ্গে যতখানি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অক্ষয়কুমার তা ছিলেন না। সেইজন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক বেশী সক্রিয় ও সচেতনভাবে, সমাজ-সংগ্রামের ও শিক্ষাসংস্কারের শক্তিশালী হাতিয়াররূপে, বাংলা গদ্য-ভাষাকে গড়ে-পিটে তৈরী করতে হয়েছিল। সেইজন্যই দেখা যায়, বেগ বলিষ্ঠতা ঋজুতা ও ওজস্বিতা গুণে বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনারীতি অক্ষয়কুমারের তুলনায় আরও বেশী সমৃদ্ধ হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন, তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকেও সহজপাঠ্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর অনুরোধ রক্ষার জন্য প্রথমে 'বাসুদেব-চরিত' রচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে 'বাসুদেব-চরিত' লেখা হয়। কলেজের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেননি বলে বইখানি ছাপা হয়নি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই প্রথম রচনা থেকেই বোঝা যায়, বাংলা গদ্যভাষার গঠনসৌষ্ঠব সম্বন্ধে তিনি গোড়া থেকেই কত সচেতন ছিলেন। বিহারীলাল সরকার বলেছেন :[৬]

> অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠার্থীদের জন্য বাঙ্গালা পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন পাঠ্যই এমন সুপাঠ্য হয় নাই; সুপাঠ্য কি, কদর্য্য ভাষার জন্য তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য হইয়াছিল। কেবল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য কেন, যে সময় 'বাসুদেব-চরিত' রচিত হয়, সেই সময় এবং তাহার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখানি ভাষা-পরিপাটিতে, 'বাসুদেব-চরিতের' সহিত তুলনীয় হইতে পারে না।...কেবল সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের রচিত বাঙ্গালা ভাষায় এ পরিপাটি কি কম প্রশংসনীয়? সংস্কৃতে অভিজ্ঞ হইলেই যে এরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার শক্তি হয়, একথা বলিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তো সংস্কৃত ভাষায় অল্প-বিস্তর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের পুষ্টিসাধন জন্য সামান্য প্রয়াস

> পান নাই। বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন-কল্পে তাঁহারাও কম সহায় নহেন। সেজন্য তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য পাত্র, সন্দেহ নাই। তাঁহারাও কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার পুস্তক প্রণয়ণে সমর্থ হন নাই।

'বাসুদেব-চরিতের' রচনার নিদর্শন যাচাই করলে সত্যই বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার বিশিষ্টতা প্রথমেই নজরে পড়ে। রচনার নিদর্শন এই :[৭]

> এক দিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন; অতএব মহারাজ! অতঃপর সাবধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন।

এই গদ্যভাষা পাঠ করলে মনে হয় না যে গত শতাব্দীর চল্লিশের গোড়ার দিকের রচনা। বাক্যগঠন ও শব্দবিন্যাসের এই রীতি আজও আমাদের বাংলা সাহিত্যের সাধুভাষার আদর্শ রীতি। 'বাসুদেব-চরিতের' পর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (ইং ১৮৪৭) থেকে 'ভূগোলখগোল-বর্ণনম' (ইং ১৮৯২) পর্যন্ত বিদ্যাসাগর রচিত প্রায় ২৭খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বেনামীতে রচিত প্রায় পাঁচখানি বই বিদ্যাসাগরের লেখা বলে কথিত আছে। তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত ও বাংলা বইয়ের সংখ্যাও প্রায় ১২খানি। এই সব রচনার মধ্যে অধিকাংশই কোন-না-কোন মূলগ্রন্থের অনুবাদ অথবা পাঠ্যপুস্তক। সেইজন্য কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে বিদ্যাসাগরের রচনা উৎকৃষ্ট হলেও, তার উদ্ভাবনীশক্তি (creative power) ও মৌলিকতা (originality) বলে কিছু নেই। এ কথা অবশ্য ঠিক যে বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনা হয় কোন মূলগ্রন্থের

অনুবাদ, না হয় তার ভাব-অবলম্বনে রচিত। পাঠ্যপুস্তকও তিনি সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী রচনা করেছিলেন সত্য, কিন্তু রচনার মৌলিকতা ও স্বকীয়তা পুস্তকের শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে না, রচনার নিজস্ব গুণের উপর নির্ভর করে। যাঁর রচনাশক্তি নেই তিনি তথাকথিত 'মৌলিক' রচনা লিখলেও তা যেমন অপাঠ্য হয়, পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদগ্রন্থ লিখলেও তার চেয়ে বেশী সুপাঠ্য হয় না। সুতরাং বিদ্যাসাগর কোন্ শ্রেণীর বই রচনা করেছিলেন, তা দিয়ে তাঁর রচনাশক্তির মৌলিকতা যাচাই করা অর্থহীন ও যুক্তিহীন। তা ছাড়া বিদ্যাসাগরের রচনার গোত্রবিচার করার সময় তাঁর রচনাকাল সম্বন্ধেও চেতনা থাকা উচিত। এ সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন ঠিকই বলেছেন :[৮]

> বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মূলরচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।

কোন মূলগ্রন্থের ভাব অবলম্বনে রচিত হলেও, রচনার মধ্যে রচয়িতার নিজস্ব সৃষ্টিশক্তি যে কতখানি প্রকাশ পেতে পারে তা বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' পড়লেই বোঝা যায়। প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে ও ভাষার মাধুর্যে এ-রচনা বিদ্যাসাগরের নিজস্ব মৌলিক রচনায় রূপান্তরিত হয়েছে। রচনার নিদর্শন কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

> এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেক

করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম ভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লব সঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি; দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষনাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। (শকুন্তলা, ইং ১৮৫৪)।

সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, মা! মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞ দর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকটে গিয়া রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা যার পর নাই মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেক? সে বলিল, যজ্ঞ সমাধানের জন্য বশিষ্ঠদেব পুনরায় দার-পরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই; সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীর কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেক। (সীতার বনবাস ইং ১৮৬০)

'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের ভাষা একেবারে আধুনিক বাংলা

সাধুভাষা বলা যায়। প্রসাদগুণ ও অর্থব্যক্তির দিক থেকে এই গদ্যভাষার সমসাময়িক কোন তুলনা নেই। রচনার মৌলিকতা বিচারের যে-কোন মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে এই রচনাকে মৌলিক রচনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। রামায়ণ-মহাভারতের নানাকাহিনী অবলম্বন করে অনেক কবি ও শিল্পী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের রচনাও মূলরচনা নয়। কিন্তু সেজন্য কালিদাস বা কৃত্তিবাসের মতন কবির রচনাকে কেউ যদি মৌলিক রচনা বলতে কুণ্ঠিত হন, তা হলে তা হাস্যকর ব্যাপার হয় না কি? বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, অনুবাদ বা ভাবানুসরণের জন্য কোথাও তা এতটুকু ম্লান হয়নি। তাঁর কালের পাঠকরা এই রচনা পাঠ করে কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন, তা রামগতি ন্যায়রত্নের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখেছেন :[১]

> বিদ্যাসাগর-রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে 'কান্নার জোলাপ' বলেন। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয়ভাগ কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিককাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমত একটি পৃষ্ঠাও নাই, যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে, কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্য্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া তৎকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বিদ্যাসাগরের লেখনীই মধুময়ী; উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই মধুবর্ষী হইয়া পড়ে। বলিতে কি, সীতার বনবাস পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে ঐরূপ কার্য্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্ব-নামাঙ্কিত একটি স্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশ-সম্পাদকদ্বারা অপ্রকাশ্যভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল; লেখনী নির্ম্মাণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু

নানাকারণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই—ভাবিয়াছিলাম, অপর কোন সুযোগে উহা প্রদান করিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না।

বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক বিদ্যাসাগরের নিতান্ত সরল রচনার উদাহরণস্থল। ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে যে, বিদ্যাসাগর কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী—যেরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনাই লোকে সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে সেই সেই পুস্তককে আদর্শস্বরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

•

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতন পাঠকেরা 'সীতার বনবাস' পড়ে মনে মনে স্থির করেছিলেন যে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হাত দিয়ে একটি সোনার কলম, নাম খোদাই করে, বিদ্যাসাগরকে উপহার দেবেন। সে-ইচ্ছা তাঁদের পূর্ণ হয়নি, কিন্তু ইচ্ছাটাই পাঠকদের মনে জাগা বড় কথা। বিদ্যাসাগরের লেখা পাঠ্যপুস্তকগুলির কথা উল্লেখ করে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেছেন যে 'কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী', সকল রকমের রচনাতেই বিদ্যাসাগর সমান কৃতী ছিলেন। বাস্তবিকই তাই। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি শিশুপাঠ্য বইগুলি পড়লে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার সহজ-সরল রূপেরও একজন আদর্শ রূপকার ছিলেন।

'বর্ণপরিচয়' প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা আরও বিশেষ করে মনে হয়। কেবল সরল ভাষার জন্য নয়, বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা ভাষাশিক্ষার উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য। বিদ্যাসাগরের আগেও বাংলা 'বর্ণপরিচয়' একাধিক লেখার চেষ্টা হয়েছে এবং লেখাও হয়েছে, কিন্তু আজও প্রায় একশ বছর পরেও, 'বর্ণপরিচয়' বলতে বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগর বলতে 'বর্ণপরিচয়' বোঝায় কেন ? কারণ 'বর্ণপরিচয়' বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি তো বটেই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও। বর্ণপরিচিত যাঁরা, তাঁরা

হয়ত বর্ণপরিচয় সম্বন্ধে একথা ভেবে দেখেননি, ভাববার অবকাশও পাননি। বিদ্যার দুর্গম সাধনপথে যাত্রা করে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় মাত্র কয়েকদিনের জন্য। তারপর পাঁচ বছর বয়সের অন্যান্য বাল্যস্মৃতির সঙ্গে 'বর্ণপরিচয়'স্মৃতিও আমাদের মন থেকে মুছে যায়। জীবনের যাত্রাপথে কত কাক ডাকে, কত পাখি ওড়ে, কত জল পড়ে, কত পাতা নড়ে, কিন্তু 'বর্ণপরিচয়ের' কথা পরে আর মনে পড়ে না। আমরা ভুলে যাই যে 'বর্ণপরিচয়' নিছক বাংলা বর্ণেরই পরিচয় নয়, প্রকৃতি-পরিচয়ও। বিদ্যাসাগর এই দুই পরিচয়েরই সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন 'বর্ণপরিচয়ের' মধ্যে। আরও একটি তৃতীয় পরিচয়ও ছিল গোপাল ও রাখালের কাহিনীর মধ্যে। তাকে 'সমাজ-পরিচয়' বলা যেতে পারে। মাতৃভাষার বর্ণশিক্ষার সঙ্গে বাইরের প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধেও প্রাথমিক শিক্ষা 'বর্ণপরিচয়ে' শেষ হত। তারপর শিশুদের বোধের উদয় হলে 'বোধোদয়' 'কথামালা' প্রভৃতি পাঠ করতে কোন অসুবিধা হত না।

'বর্ণপরিচয়' রচনার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বিচার করলে বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হতে পারে। ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' নামে একখানি বইয়ের মধ্যে দেখা যায়, বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস ভূগোল গণিত ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও এ বইখানিকে ঠিক শিশুদের পাঠোপযোগী বলা যায় না। এরপর 'স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে 'বর্ণমালা' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়।[১০] এ-বইয়ের শিক্ষাপ্রণালী জটিল। প্রথমে ক খ গ দিয়ে আরম্ভ করে, পরে 'ব্যুৎক্রম স্বর' অ এ ঐ উ ঋ ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তারপর ব্যুৎক্রম ব্যঞ্জন, যুক্তাক্ষর, ত্র্যক্ষরযুক্ত, স্বরান্ত দ্ব্যক্ষর, স্বরান্ত ত্র্যক্ষর, স্বরান্ত চতুরক্ষর, স্বরান্ত পঞ্চাক্ষর ইত্যাদি ভেদ বিভাগ করে পাঠ দেওয়া হয়েছে। এ-প্রণালীকে সহজ-সরল ও বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। 'বর্ণমালা' দ্বিতীয়ভাগে যে-সব পাঠপ্রকরণ ও গল্প আছে, তার অধিকাংশই বিদেশী ভাবের ছায়াবলম্বনে রচিত। ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও অন্যান্য আরও দু-একজনের যে বর্ণমালা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, স্কুল বুক সোসাইটির বর্ণমালার পাঠরীতির সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।[১১]

further delay) than the necessary form of your Honorable Council require.

That your petitioners have good reason to believe that the proposed Act if passed, will be hailed with joy in every part of the Empire as a powerful means towards the amelioration of the social condition of Hindoos and as one of the greatest blessings conferred on the Country by the British Government.

And your Petitioners as in duty bound shall ever pray

Calcutta }

Ramkhonauth Chatterjea
Rykissen Ram Roy
Dwarkanauth Bose
Shibchunder Dut
Degumber Mitter
Bhoy Chorn Bose
শ্রী রামনারায়ণ তর্করত্ন

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে

বিদ্যাসাগরের পূর্বে এই ধরনের বর্ণমালাশ্রেণীর রচনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ ১৮৪৯ সালে এবং তৃতীয়ভাগ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য এই তিনখানি বই রচনা করা হয়। 'বর্ণমালা' বা 'শিশুশিক্ষা'-শ্রেণীর বই প্রকাশিত হবার আগে শিশুদের অন্যভাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হত। গুরুমশায়েরা শিশুদের হাতে প্রথমে খড়ি দিয়ে ক খ গ প্রভৃতি কয়েকটি হল্‌বর্ণ শেখাতেন। পরে তালপাতায় লিখিয়ে সমস্ত হল্‌বর্ণ, এবং ক্য ঙ্ক স্ক প্রভৃতি সংযুক্তবর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর 'সিদ্ধিরস্তু' বলে অ আ ই প্রভৃতি স্বরবর্ণ, এবং হল্‌বর্ণের সঙ্গে তাদের যোগ হলে কিভাবে আকার পরিবর্তন হয়, 'বানান' নামে তা শিক্ষা দেওয়া হত। কেউ কেউ বলেন, স্বরবর্ণের পূর্বে 'সিদ্ধিরস্তু' এই মঙ্গলাচরণসূচক বাক্য থাকায় বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা শিশুদের প্রথমে স্বরবর্ণই শিক্ষা দিতেন, কিন্তু বিশুদ্ধ স্বরবর্ণে বেশী কথা শিখতে বা লিখতে পারা যায় না বলে পরে বোধ হয় পণ্ডিতেরা প্রথমে হল্‌বর্ণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।[১২] পল্লীগ্রামের পাঠশালাতে এই প্রথাই পরে প্রচলিত হয়েছিল, এবং কলকাতা শহরেও এইভাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়া হত। পরে ইংরেজীশিক্ষার অনুকরণে 'বর্ণমালা' শিশুশিক্ষা প্রভৃতি বর্ণশিক্ষাগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর এই প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশিত হবার আগে মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' তিন ভাগ সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখেছেন: "এক্ষণে ১ম ও ২য় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থলে অনেকগুলি ঐরূপ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহার কোনখানিই শিশুশিক্ষার ন্যায় কোমল, মধুর ও শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক হয় নাই। ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যায় শিশুদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধ হয় এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। উহার বিষয়গুলিও যেমন সুন্দর, রচনাও তেমনই মধুর। তর্কালঙ্কারের আর কোন গ্রন্থ না থাকিলেও তিনি এই এক শিশুশিক্ষাদ্বারাই এদেশে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন।"[১৩] আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন: "যিনি 'বাসবদত্তা'র প্রণেতা তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ।

তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে?"[১৪]

বন্ধু মদনমোহনের শিশুশিক্ষার মধ্যে যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল, সেগুলি সংস্কার করেও বিদ্যাসাগর সন্তুষ্ট হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই একখানি পূর্ণাঙ্গ 'বর্ণপরিচয়' রচনার সিদ্ধান্ত করেন। ১৮৫৫ সালে তাঁর 'বর্ণপরিচয়' ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। বহুকাল পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালা ১৬ স্বর ও ৩৪ ব্যঞ্জন, এই ৫০ অক্ষরে পরিগণিত হত। তার মধ্যে যেগুলির প্রয়োগ নেই সেগুলি বাতিল করে (যেমন দীর্ঘ- ৠ, দীর্ঘ- ৡ), উচ্চারণভেদে স্বতন্ত্র বর্ণ সৃষ্টি করে (যেমন ড় ঢ়), অনুস্বর-বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণভুক্ত করে, চন্দ্রবিন্দুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে, ক্ষ-কে সংযুক্তবর্ণ (ক+ষ) করে, তিনি নতুন বর্ণপরিচয় সূচনা করলেন। পাঠপ্রণালীর বিন্যাস করলেন এমনভাবে যা সহজ তো হলই, বিজ্ঞানসম্মতও হল। বর্ণপরিচয় ২য় ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখলেন: "সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরুশিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক। ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ করিতে গেলে, অতিশয় নীরসও বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটী পাঠ দেওয়া হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে।"

এর মধ্যে বিদ্যাসাগর স্বকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীরও ইঙ্গিত করেছেন। 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' ইত্যাদি কথার অর্থ নিয়ে পাছে গুরুমশায়রা মাথা ঘামান এবং বেত নিয়ে বালকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তাই এই সাবধানবাণী তাঁকে উচ্চারণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রসিকতাও আছে— "অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরুশিষ্য উভয়েরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক।" দ্বিতীয়-ভাগের সমস্ত দুরূহ শব্দের অর্থ গুরুমশায়দের পক্ষেও বোঝা কঠিন। কিন্তু 'শব্দার্থ' শিক্ষা দেওয়া দ্বিতীয় ভাগে আসল লক্ষ্য ছিল না। বিদ্যাসাগর 'দ্বিতীয় ভাগ' রচনা করেছিলেন শিশুদের বর্ণবিভাগ শিক্ষা দেবার জন্য।

ক্রমাগত উচ্চারণ করে শিশুরা বর্ণবিভাগ শিখবে, এবং তাতে তাদের বিরক্তি জন্মাতে পারে বলে তিনি শব্দের সঙ্গে সহজপাঠ্য কাহিনী যোগ করে দিয়েছিলেন। প্রায় একশ বছর পরে বাংলা সাধু গদ্যভাষা যে সহজ রূপ ধারণ করেছিল, বিদ্যাসাগর সেই ভাষাতেই বর্ণপরিচয়ের গল্পগুলি রচনা করেছিলেন। "অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়"—এরকম গদ্যভাষা রচনা করা তখন আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের কাহিনী রচনায়, এবং বর্ণশিক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে, কতকটা অসাধ্যসাধন করেছিলেন বলা চলে।

ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক ও শ্লেষাত্মক রচনায় বিদ্যাসাগর তাঁর সমসাময়িক কালে অদ্বিতীয় ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই শ্রেণীর রচনার শক্তিশালী পথপ্রদর্শক ছিলেন। রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের সময় থেকে সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গবিদ্রূপশ্লেষের প্রাধান্য ক্রমেই বাড়তে থাকে। সজাগ সুরুচিবোধের জন্য রামমোহন নিজে অবশ্য তাঁর রচনায় শ্লেষবিদ্রূপের আশ্রয় বিশেষ নেননি। বিদ্যাসাগরের কালে সমাজসংস্কার আন্দোলনের ব্যাপকতার জন্য, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে ব্যক্তিগত মতামতের সংঘর্ষ যখন বেড়ে যায়, তখন বিভিন্ন লেখকের রচনার মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের দংশনের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। আগেকার কালে সমাজে ও সাহিত্যে শ্লেষ-বিদ্রূপ বা রঙ্গরসিকতা থাকলেও, তা সাধারণত প্রচ্ছন্ন থাকত, 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক' হত না। কোন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই ব্যঙ্গরস পরিবেশিত হত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিকাশ হয়েছে আধুনিক কালে, যখন সমাজে গোষ্ঠীজাতির বদলে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে। জেকব বুর্খার্ট তাঁর ইটালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন [১৫]

...Wit could not be an independent element in life

> till its appropriate victim, the developed individual with personal pretensions, had appeared.

উনিশ শতকের বাংলার সমাজের মধ্যপর্বে এই শ্রেণীর 'developed individual with personal pretensions' অনেক দেখা দিয়েছিলেন। স্বভাবতই বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে তাঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন ও বহুবিবাহ-নিবর্তনের ব্যাপার নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই সব 'ব্যক্তির' প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়েছিল, এবং সেই বিরোধ থেকেই উভয়পক্ষের রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপশ্লেষের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠত। প্রতিপক্ষ যখন শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে যেতেন, তখনও বিদ্যাসাগর বিচলিত হতেন না। উত্তরের প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রূপের বিষাক্ত বাণ তিনিও নির্মমভাবে নিক্ষেপ করতেন। এ-বিষয়ে তাঁরও দক্ষতা কম ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী ছিল বলা চলে। তাঁর ব্যঙ্গোক্তির ও বিদ্রূপাত্মক রচনার নিদর্শন দিচ্ছি।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহুবিবাহ-নিবর্তনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধী ছিলেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে তারানাথের পুস্তক প্রকাশিত হবার পরে বিদ্যাসাগর লেখেন :

> অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই ; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়েটি কথা অনেক অংশে স্বপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। (বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক)

তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁর পুস্তকের উপসংহারে লিখেছিলেন : "বিদ্যাসাগর প্রমাণ ব্যতিরেকেই, ত্রৈবিধ্য বিভাজক উপাধি স্বরূপে, যে বিবাহের কেবলনিত্যত্ব ও কেবলনৈমিত্তিকত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিত হইল। এক্ষণে তিনি, দুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ

গ্রহণ করিয়া, তাহার সমাধান করুন।" একথার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখেন :

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি তাঁহার মত সর্ব্বজ্ঞ নহি, সুতরাং, পুস্তক-বিরহিত ও উপদেশ নিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, আমার এরূপ সাহস বা এরূপ অভিমান নাই বস্তুতঃ, তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সমাধানের নিমিত্ত, আমায় বহু পুস্তক দর্শন ও সংশয়স্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি আত্মীয়তাভাবে ঈদৃশ উপদেশ প্রদান না করিলেও, আমায় তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃত-পাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক আহরণ করিয়াছি। কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন সরল, কেমন পরহিতৈষী, এক গাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত হইবেক না, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা দুই গাড়ী পরিমিত হইবেক না ; বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যূন হইবেক ; সুতরাং, সম্পূর্ণভাবে তদীয় তাদৃশ নিরুপম উপদেশ পালন করা হয় নাই ; এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হইতেছি। দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যেরূপ দয়া করিয়া, আমায় ঐ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয়া করিয়া, আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করেন। আর, এ স্থলে ইহাও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, যদিও তদীয় উপদেশের এ অংশে আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে, কিন্তু অপর অংশে, অর্থাৎ তাঁহার উত্থাপিত আপত্তির সমাধান বিষয়ে, যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই। সুতরাং, সে বিষয়ে মহানুভব তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমায় নিতান্ত অপরাধী করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। (বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক)

এক বিদ্যাবাগীশ, কোনও বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাকে সর্ব্বস্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণী, নিরতিশয় ব্যাকুলা হইয়া, কাতর বচনে কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ সর্ব্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না; এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবেক; ছেলেগুলি খেতে না পাইয়া মারা পড়িবেক। তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আরে হাবি তুই সে জন্যে ভাবিস কেন; আমি যদি না বুঝি, কার বাপের সাধ্য, আমায় বুঝায়। শ্রীযুত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এই তিন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মহাপুরুষ উল্লিখিত বিদ্যাবাগীশের দলের লোক। সুতরাং, উপরি পরিদর্শিত প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের স্পষ্ট লিখন দৃষ্টে, তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবেক, সে প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। তাঁহাদের বুদ্ধিও স্বতন্ত্র, বিদ্যাও স্বতন্ত্র, ব্যবহারও স্বতন্ত্র। তাঁহাদের অলৌকিক লীলা বুঝিয়া উঠা ভার। (রত্নপরীক্ষা)

এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তাঁর সমসাময়িক অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শাস্ত্রবিচারে ও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বিপক্ষের পণ্ডিতেরা যেমন ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন, তিনিও তেমনি তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁদের জবাব দিতেন, এবং তাঁর রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ ও শ্লেষ, কখন প্রচ্ছন্নরূপে কখন নগ্নরূপে, প্রকাশ পেত। 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', রত্নপরীক্ষা', প্রভৃতি কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা যা তাঁর 'বেনামী' রচনা বলে কথিত আছে, তা কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের রচনা নয় বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হল, কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের মতন গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ এতদূর নিষ্ঠুরভাবে রঙ্গতামাসা করতেন না। কিন্তু বাইরে যাঁরা গম্ভীর হন, সাধারণত দেখা যায় তাঁদেরই ভিতরে পরিহাসরসের নির্ঝর আত্মগোপন করে থাকে। বিদ্যাসাগরও সেই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার আসরে তিনি ছিলেন রঙ্গরসিকতার অফুরন্ত আকর। সুতরাং বিতর্করচনায়

তাঁর বিদ্রূপবাণ স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হত। তাঁর 'বেনামী' রচনাগুলি পড়লে মনে হয় না যে এই শ্রেণীর রচনা তাঁর লেখা হতেই পারে না। রচনার নিদর্শন বিচার করে, এবং তার ভিতরে তাঁর নিজের সম্বন্ধে উক্তিগুলি দেখে মনে হয়, বিদ্যাসাগরই এগুলির রচয়িতা। 'ব্রজবিলাস' পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' লিখিত আছে :

> ফাজিলচালাকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ, বোদ্ধা, যোদ্ধা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করেন, অন্যে যাহা বলুক, তাঁহাদের মতে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিলচালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগরের লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।
>
> এক গণ্ডা এক মাস অতীত হইল বিদ্যাসাগর বাবুজি, অতি বিদকুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া, পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ অবস্থায় তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, এ কথা যিনি রটাইবেন, অথবা এ কথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধির দৌড় কত তাহা সকলে, স্ব স্ব প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।

এই আত্মকথনভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, ছদ্মবেশী লেখক এখানে স্বগতোক্তিই করেছেন। এ-লেখা যদি অন্যের হত, তা হলে বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গ এইভাবে উত্থাপন করার প্রয়োজন হত না। ছদ্মবেশী লেখক নিজের ছদ্মবেশকে আরও বেশী সুরক্ষিত করার জন্য যে এই কৌশল অবলম্বন করেছেন, তা সাহিত্য-রসিকেরা সহজেই বুঝতে পারবেন। বিদ্যাসাগরের নিজের ব্যক্তিত্ববোধ খুবই প্রখর ছিল। উনিশ শতকের বাংলার সমাজে তাঁর মতন আত্মসচেতন ব্যক্তি দু'চারজন ছিলেন কি না সন্দেহ। নবযুগের সমাজে যখন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছিল, তখন আরও অন্যান্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের

ব্যক্তিত্বের সংঘাত হওয়া স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের পর্বত-শৃঙ্গে অনেক ছোট-বড়-মাঝারি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আঘাত খেয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। এই খরব্যক্তিত্বের দ্যুতি হাস্য-পরিহাস-শ্লেষ-ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে তাঁর বহু বিতর্করচনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা, অর্থব্যক্তি, গাঢ়বদ্ধতা, কোমলতা, উদারতা, মাধুর্য, শ্লিষ্টতা, যথাসংখ্যা প্রভৃতি গদ্যরচনার অধিকাংশ গুণই বিদ্যাসাগরের ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এই সব গুণের আশ্চর্য সংমিশ্রণ তাঁর রচনার এই নিদর্শনটি থেকে অনেকটা বুঝতে পারা যায়।

> ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত-বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে; ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষের শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিকরক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি

দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।

হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান! (বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক)

এই রচনায় বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করে, তার গতির মধ্যে "একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত" রক্ষা করে, এবং সরল ও সুশ্লিষ্ট শব্দ নির্বাচন করে ভাষাকে যতদূর সম্ভব সুন্দর, গাঢ়বন্ধ, গম্ভীর ও গতিশীল করা হয়েছে। কোন পণ্ডিত বা বৈয়াকরণের পক্ষে এই রচনাকলানৈপুণ্য দেখানো সম্ভব নয়, যথার্থ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরকে "বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী" বলেছেন, তা যে কত সত্য তা বিদ্যাসাগরের এই সব রচনা থেকে বোঝা যায়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ আরও পরিষ্কার করে বলেছেন :[১৬]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক্ থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহন-রূপে রসসৃষ্টিতে; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে…

ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে; সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টিকার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ণ করেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলাভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত

ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পজনোচিত বেদনাপথ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলাভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারে নি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলাভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় মর্যাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয় নি।

শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার ছাঁদটি বাংলাভাষায় সাহিত্য-রচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গীর অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।

বাংলাভাষায় ও বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দানের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তা এর চেয়ে আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরযুগের তরুণ পাঠকসমাজের মনে বিদ্যাসাগরের রচনা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং তাঁর সাহিত্যসাধনাকে তাঁরা কি গভীর

শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতিকথা থেকে উল্লেখ করব। অক্ষয়চন্দ্র লিখেছেন : "কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখনও নিজের জিনিস বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে বাজিত। প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না কাহাকে বলে প্রসাদ গুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ।...আর প্রাণে লাগিত না কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি সকলের পূর্ব্বে বাঙ্গলার লেখকরূপে অবতীর্ণ হন রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সে হইল আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বে ; তাহার পর আমাদের এল.এ, বি.এ পরীক্ষার বাঙ্গালার পরীক্ষক তিনিই ছিলেন। তাঁহার লিখিত বাঙ্গলা পুনঃ পুনঃ এণ্ট্রান্সের কোর্স ছিল, কিন্তু সেই যে ছেলেবেলা কৃষ্ণবন্দী বাঙ্গলা প্রাণে লাগে নাই, ভালবাসি নাই, সেইরূপ কখন উহা ভালবাসিতে পারি নাই। এখন বুঝিয়াছি কৃষ্ণবন্দ্যের বাঙ্গলায় প্রাণ নাই বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পণ্ডিতি বাঙ্গলা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি (ষ্টাইল), না আছে রস, না আছে আবেগ।" সেইজন্য অক্ষয়চন্দ্রের মতন সাহিত্যপ্রিয় তরুণেরা তখন মানসচক্ষে যে সাহিত্যপ্রতিমা ধ্যান করতেন তা এই :[১৭]

> দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতীস্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর-চূড়া টেরি-কাটা কার্ত্তিকস্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহা দেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক।

যদিও অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "অনর্থক পিতৃ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য, পিতৃদেবকে (গঙ্গাচরণ সরকার) মধ্যস্থানে অধিষ্ঠিত করিতেছি, এমন কেহ মনে করিবেন না", তাহলেও তিনি যে সত্যই তাই করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে-সময়ের কথা তিনি বলেছেন, সেই সময় মধ্যস্থানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধিষ্ঠিত হবার কথা। অক্ষয়চন্দ্রের ধ্যানমূর্ত্তিকে কিছুটা সংস্কার করে আমরা বলতে পারি—মধ্যে শক্তিস্বরূপ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, বামে সরস্বতীস্বরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁর পাশে গণেশমূর্ত্তি ভারতচন্দ্র, অন্যপাশে কার্ত্তিকরূপী ঈশ্বর গুপ্ত, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন তর্কালঙ্কার—সাহিত্যের এই প্রতিমাই উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে পূজিত হয়েছে।

বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে বাংলার সাংবাদিকতার কথাও কিছুটা উল্লেখ করা উচিত। সাংবাদিক বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর ঠিক তা ছিলেন না। কিন্তু বাংলা সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে কয়েকখানি পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল তার মধ্যে প্রধান হল: (১) সর্বশুভকরী পত্রিকা, (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (৩) সোমপ্রকাশ, এবং (৪) ইংরেজী পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'। বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'সোমপ্রকাশ', বাঙালী পরিচালিত ও সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ধরনের যে পত্রিকাগুলি বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে, বিদ্যাসাগর ঠিক সেই পত্রিকাগুলির সঙ্গেই যখন সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তখন সাংবাদিকতাতেও তাঁর দান অস্বীকার করা যায় না।

১২৫৬ সনের ফাল্গুন মাসে কলকাতা শহরে ঠনঠনিয়া অঞ্চলে 'সর্বশুভকরী সভা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যবৃন্দ ১২৯৭ সনের ভাদ্র মাসে (আগস্ট ১৮৫০) 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যার গোড়াতে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখা হয়:[১৮]

আমরা কএক জন বন্ধু একমতাবলম্বী হইয়া গত ফাল্গুন মাসে

> 'সর্ব্বশুভকরী' নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভাসংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহু কালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা হইবেক।

এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই নামে পত্রিকা প্রকাশিত হত। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, "ইনি (মদনমোহন তর্কালঙ্কার) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্ব্বশুভকরী' নামে পত্রিকা বাহির করেন।" পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি করে দীর্ঘ প্রবন্ধ থাকত। প্রথম সংখ্যায় ছিল 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিল 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ। প্রথমটির লেখক বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয়টির লেখক মদনমোহন। পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর ১৮৫১ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের নামে প্রবন্ধ ছাপা না হলেও, এবং সম্পাদনা ও পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর নাম কোথাও না থাকলেও, তিনি ও তাঁর বন্ধু মদনমোহন যে এই পত্রিকার সাক্ষাৎ প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন, তা কারও অজানা ছিল না। ১৮৫১ সালে সমাজসংস্কার ও সমাজকল্যাণের আদর্শ নিয়ে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা বিদ্যাসাগরই দিয়েছিলেন। এ-পত্রিকা স্বল্পস্থায়ী হলেও, উনিশ শতকের প্রগতিশীল বাংলা পত্রিকার মধ্যে অন্যতম।

১৮৪৩, ১৬ আগস্ট 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কি সম্পর্ক ছিল এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিচালনা ও সম্পাদনার ব্যাপারে 'পেপার-কমিটির' সভ্যরূপে তিনি কত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আগে সে-বিষয়ে আলোচনা করেছি। গত শতকের চল্লিশে অথবা তার আগে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সমকক্ষ আর কোন বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:[১৯]

"তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না। 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী (রামতনু) মহাশয়কে বলিলেন—'রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ' বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।"

বাস্তবিক গম্ভীর বিষয়ের পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' প্রকাশিত হবার পূর্বে ছিলই না বলা চলে। তত্ত্ববোধিনীর যুগে বাংলাসাহিত্যের আদর্শ ও আস্বাদ দুইই বদলে গেল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন :[২০]

> তখন পদ্যে যেমন প্রভাকরের প্রসার, গদ্যে তেমনই তত্ত্ববোধিনীর গৌরব। ১৮৪৩ সাল হইতে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ ১ সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী আমাদের বাটিতে ছিল। একদিকে অক্ষয়কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্যদিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চকচকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,—এই গৌরব, এই আদর দেখিয়া বালকহৃদয়ে একরূপ বুঝিয়াছিলাম, যে সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেলনা জিনিষ নয়।

বন্ধু অক্ষয়কুমারের সাহিত্যচর্চায় এবং তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধনির্বাচনে বিদ্যাসাগরই ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী সহযোগী। তত্ত্ববোধিনীর সামাজিক আদর্শ নির্ধারণেও তিনি অক্ষয়কুমারকে সাহায্য করতেন। আদর্শ, নীতি, রুচি ও গম্ভীর বিষয়ে বাংলা রচনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যে সাময়িক পত্রিকাজগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তক হতে পেরেছিল, তা কেবল অক্ষয়কুমারের একার চেষ্টাতেই সম্ভব হয়নি, বিদ্যাসাগরেরও তাতে দান ছিল যথেষ্ট। তত্ত্ববোধিনীর নৈতিক মেরুদণ্ড বিদ্যাসাগরই ঋজু ও বলিষ্ঠ রেখেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনীর পরে বাংলা সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারা প্রবর্তন করে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা। এই পত্রিকাখানিরও আদি-পরিকল্পনা বিদ্যাসাগরের। ১৮৫৮, ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ, ১২৬৫) 'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫, ২ জানুয়ারি থেকে সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যখন কিছুদিনের জন্য সম্পাদকীয় পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা লেখেন :[২১]

> The *Shoma Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him. But he fell sick and made over the paper to Pandit Dwarkanauth, under whose able management the paper attained the foremost place among the Bengalee newspapers.

শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেছেন : "শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদাপ্রসাদ নামে তাহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাজ যোগান, তাহার অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল।" সোমপ্রকাশ কিভাবে বাংলার পাঠকসমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন :[২২]

> দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত

করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি, আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃসৃত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০৲ দশ টাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।

'সোমপ্রকাশ' যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়; ইহা একদিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসীগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতায় চাঁপাতলার এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা পদার্পণ করিতেন; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন।

দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে 'সোমপ্রকাশে' নিয়মিত আলোচনা হত। সামাজিক বিষয় ও ধর্মবিষয় নিয়ে পূর্বে তত্ত্ববোধিনী ও

অন্যান্য পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা তেমন হয়নি। সোমপ্রকাশের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ, এবং নির্ভীক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা ও সমালোচনা করা হত। আলোচনার মানও এত উন্নত ছিল যে আজকের দিনেও সোমপ্রকাশের রচনাবলী পড়লে একেবারে আধুনিক রচনা বলে মনে হয়। একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই ধরনের একখানি বলিষ্ঠ প্রগতিশীল বাংলা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পত্রিকার আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন, এবং তাঁর প্রীতিভাজন বন্ধু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে সেই পত্রিকা সঠিকভাবে নির্দিষ্টপথে পরিচালনার ব্যাপারে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পরবর্তী কীর্তি বিখ্যাত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা পরিচালনা। 'হিন্দু প্যাট্রিয়টের' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১, ২৫ জুলাই পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্যাট্রিয়ট কার্যালয় ভবানীপুর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫০০০৲ টাকা দিয়ে পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্রিকা-পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর তখন যুবক কৃষ্ণদাস পালকে প্যাট্রিয়ট-সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত করেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন :[২৩]

> কৃষ্ণদাস শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না হইলে হয়ত কৃষ্ণদাসকে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার চাকরী করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত। হয়ত তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আশায় ছাই পড়িত।...হরিশের মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রাইজ ও রাইতের খ্যাতনামা সম্পাদক*) ঐ কাগজ

* **Reis and Rayyet** পত্রিকা।

চালাইতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্রের নিঃসহায় পরিবারদিগের ভরণপোষণার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় হরিশের হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজ ও ছাপাখানার জিনিষ পত্রাদি ৫০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। এইরূপে কালীপ্রসন্ন বাবু হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী হন। শম্ভুবাবু হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকতা অতি অল্প দিন মাত্র করিয়াছিলেন।...এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাসের উপর বিদ্যাসাগরের দয়া হইল। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুপেট্রিয়ট চালাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বালক। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণদাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রবন্ধাদি তাহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া হিন্দুপেট্রিয়ট চালাইতে লাগিলেন। এই সময় হিন্দুপেট্রিয়টের দুই এক সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের নিযুক্ত এক ম্যানেজারের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস এইরূপে কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্যাসাগরের অধীনে থাকিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য্য করেন। একথা বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে তিনি উহা বলিয়া দিতে অস্বীকৃত হন। তৎপরে আমরা বহু অনুনয় বিনয় করিলে আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া দেন। কৃষ্ণদাসের লেখার মধ্যে এই কথা কোন স্থানে স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। লেখা না থাকিবার কারণ আছে। কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি তলায় ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদিগকে উক্ত কাগজের স্বত্বাধিকারী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব হইতে লাগিল যে, হিন্দুপেট্রিয়ট বিদ্যাসাগরের অধীনে না রাখিয়া উহা কতিপয় ট্রষ্টির হস্তে সমর্পিত হউক। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বিদ্যাসাগরের নিকট কে করিবে এ বিষম সমস্যা প্রস্তাবকারীদিগের মনে উদিত হইল। এই কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট এ প্রস্তাব

হইতেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর এইরূপ লুকোচুরির মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে হিন্দুপেট্রিয়টের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দুপেট্রিয়টের ট্রষ্ট ডিড কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন।

এই বিবরণের মধ্যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পরিচালনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কৃষ্ণদাস পালের মতবিরোধের যে আভাস পাওয়া যায়, তা আদর্শগত ও নীতিগত বিরোধ বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগর হিন্দু প্যাট্রিয়টকে ঠিক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার মুখপত্র করতে চাননি। তিনি হরিশ্চন্দ্রের আমলের প্রগতিশীল আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দু প্যাট্রিয়টকে বর্ধিষ্ণু বাঙালী মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামের মুখপত্র করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল চেয়েছিলেন তাকে রক্ষণশীল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার মুখপত্র করতে। বিরোধ তাই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, এবং বিদ্যাসাগর সেই কারণে প্যাট্রিয়টের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যে কয়েকখানি পত্র-পত্রিকার কথা আমরা উল্লেখ করলাম, তার প্রত্যেকটির সঙ্গে বিদ্যাসাগর কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র তিনি ছিলেন অন্যতম পরামর্শদাতা ও প্রেরণাস্বরূপ। 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' ও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, এবং তাদের আদর্শসংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতাও করেছিলেন, দুর্দিনের সময় 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার কাণ্ডারীও হয়েছিলেন তিনি। অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণদাস পাল, তাঁরই উপদেশ ও উৎসাহের জোরে সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। নিজে সম্পাদক না হয়েও, এবং সাংবাদিকের কাজ যথাযথভাবে না করেও, বাংলা সাংবাদিকতাকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে বিদ্যাসাগর বৃহত্তর ও সুস্থতর সমাজ-জীবনের দর্পণস্বরূপ করে তুলেছিলেন। বাংলাদেশে এই কারণে তাঁকে বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক সাংবাদিকতার অন্যতম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক বলা যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন, সাংবাদিকতাক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর দান অবিস্মরণীয়।

১২ | কর্মবৈচিত্র্য

বৈচিত্র্য বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের ঠিক সেরকম কোন বৈচিত্র্য ছিল না। তা থাকতেও পারে না। সারাজীবন যাঁরা একটা বড় আদর্শ অনুসরণ করে চলেন, সাধারণত তাঁদের কর্মক্ষেত্র তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আদর্শ বড় বলে তাঁদের কর্মক্ষেত্রও বড় মনে হয়। একই আদর্শ চূর্ণরশ্মির মতন কর্মজীবনের বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের কাছে তা কর্মবৈচিত্র্য বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা একই কর্মের বিচিত্র প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের কর্মবৈচিত্র্যকে এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের নানাবিধ কাজকর্ম ছাড়া বিদ্যাসাগর যে আর অন্য কোন কাজের জন্য তাঁর জীবনের সামান্য কয়েকটা দিনও অতিবাহিত করেছিলেন, তা কল্পনা করা যায় না। সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়বার পর বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান ও বহুবিবাহের আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য স্বাধীন কাজকর্মের মধ্যে এই দুটি কাজ থেকে তিনি শেষজীবন পর্যন্ত মুক্তি পাননি। তা ছাড়া আরও একটি কাজ তাঁর জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িয়ে ছিল। সেটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাসংস্কারের কাজ। বাকি সময়টুকু তিনি নানাবিষয়ে

গ্রন্থরচনার কাজে নিয়োগ করেছেন। তাঁর অবশিষ্ট কাজের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ড এবং সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরি স্থাপন। সংস্কৃতপ্রেস প্রতিষ্ঠা ও পুস্তক-প্রকাশের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল আমরা তাঁর বাকি তিনটি কাজের কথা বলব।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় কীর্তি। সংস্কারক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য কীর্তির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, এটি কোনদিক থেকেই নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন :

> সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটুশ্যন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত-বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।......
>
> মেট্রোপলিটান-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই

> যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না ; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা কেন যে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় কীর্তি, তা রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়। 'সবল কর্মবুদ্ধি', যা বাঙালীর মধ্যে সত্যই বিরল, তারই সাক্ষী হল এই ইনষ্টিটিউশন। ১৮৫৯ সালে উত্তর-কলকাতায় শঙ্কর ঘোষ লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত ও বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। এঁরাই সকলে মিলে স্কুল-প্রতিষ্ঠার খরচপত্র বহন করেছিলেন। অন্যান্য হিন্দুভদ্রলোকেরাও টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামাচরণ মল্লিক অন্যতম। ওয়েলিংটন স্কয়ারের দত্তরা স্কুলের পাঠাগারের জন্য অনেক বইপত্র দান করেছিলেন। সরকারী ইংরেজী-স্কুলে শিক্ষার খরচ বেশী, সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলা, যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত-পরিবারের বাঙালী ছেলেরা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প খরচে ইংরেজীশিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁরা বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ অনেক বেশী কার্যকর হবে মনে করে তাঁকে ও তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল পরিচালনার কাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হন, এবং তাঁদের দুজনকে নিয়ে নতুন ম্যানেজিং-কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৮৬১, মার্চ মাস পর্যন্ত স্কুল পরিচালনা করেন।

এই সময় ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ও মাধবচন্দ্র ধাড়া, এই দু'জন প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে কমিটির মতবিরোধ হয়, এবং তাঁরা সদস্যপদ ত্যাগ করেন। 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যাসাগরের উপর স্কুল-পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দিলেন, এবং পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষ, এই ক'জনকে নিয়ে একটি নতুন কমিটি গঠিত হল। প্রেসিডেণ্ট হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, এবং সেক্রেটারি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৬৪ সালে স্কুলের নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' নাম রাখা হল।[১] ঐ বছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বি. এ. পর্যন্ত পাঠের অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হল। সিণ্ডিকেট আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৬৬ সালে প্রতাপচন্দ্র সিংহের এবং ১৮৬৮ সালে হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের একার উপর পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। ১৮৭২, জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণদাস পাল ও দ্বারকানাথ মিত্রকে নিয়ে বিদ্যাসাগর নতুন একটি কমিটি গঠন করেন। এই সময় আবার তিনি এফ. এ. পর্যন্ত পাঠ অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন। আবেদন নামঞ্জুর হতে পারে এবং সিণ্ডিকেটের ব্রিটিশ সভ্যেরা আপত্তি করতে পারেন ভেবে, বিদ্যাসাগর বেলি সাহেবের (E. C. Bayley) কাছে একখানি ব্যক্তিগত পত্রে ২৭ জানুয়ারি, ১৮৭২ তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানান। বেলি তখন সিণ্ডিকেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সেইজন্য বিদ্যাসাগর তাঁকে সকল বিষয় জানিয়ে তাঁর সমর্থন লাভের আশায় লেখেন :

> If it should be urged at the Syndicate that the character of the instruction to be imparted in the Institution would be inferior inasmuch as the instructive staff would enlist exclusively of natives, I would take the liberty to remind you that the Sanskrit

College, which teaches up to the B.A. standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident, that native Professors, if selected with care and judgement, would be found quite competent, but should we from experience feel the necessity of entertaining an English Professor for instruction in the English language in which alone English aid might be necessary, we would certainly employ one—our object, it is needless for me to mention, is the good of the Institution and we will spare no means to accomplish it. I believe there is a desire in certain quarters to know the scale of pay we will allow to our Professor, that is a matter I submit between the employer and the employee, and the affiliation rules, so far as I can understand them, do not require such details. It will be our aim to combine efficiency with economy, and as I have spent, I may say, my whole life in managing Schools, I hope you will allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating their pay...The high rate of schooling charged at the Presidency College is prohibitory to many middle-class youths, while their parents being opposed to their boys being sent to Missionary Colleges, they are obliged to give up academic education after matriculation. This Institution would be a great boon to them...

উনিশ শতকের সত্তরেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের ইংরেজ সদস্যদের ধারণা ছিল না যে এদেশীয় ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা কোন

কলেজের পরিচালনার বা অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে পারেন। বিশেষ করে ইংরেজ শিক্ষক ছাড়া যে ইংরেজীসাহিত্য শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। সিণ্ডিকেটের সাহেব সদস্যরা এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্তারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন যে ইংরেজী কলেজ চালাবার মতন যোগ্যতা বাঙালীরা এখনও অর্জন করেননি, অতএব তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাঁর অনুজ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :[২] "অগ্রজ, তাঁহাদের এই সাহঙ্কার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, তর্ক-বিতর্ক দ্বারা নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম-পূর্ব্বক, নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করতঃ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ-ক্লাস খুলিলেন। এই কলেজ লইয়া ই. সি. বেলির সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হয়। ই. সি. বেলি বলেন, 'বিদ্যাসাগর! কিরূপে তুমি নিজ কলেজ চালাইবে? ইংরাজ-সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী-কলেজ কিছুতেই চলিতে পারে না।' "

বেলি ও অন্যান্য সাহেবদের কথার উত্তর বিদ্যাসাগর মুখে তো দিয়েছিলেনই, কাজেও দিয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে মেট্রোপলিটন ফার্স্ট-গ্রেড কলেজে পরিণত হয়, ১৮৮১ সালে বি. এ. পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছাত্র পাঠানো হয়। ১৬ জন ছাত্র বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বাঙালীর অধ্যাপনায় ও পরিচালনায় ইংরেজী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি না, এবং ইংরেজ-চালিত কলেজের মতন শিক্ষা বিষয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারে কি না, বিদ্যাসাগর তা ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে মেট্রোপলিটনে 'ল' ক্লাস খোলা হয় এবং তার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ৫১৩ জন বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১৮৮৩, ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালের পরীক্ষায় মেট্রোপলিটনের ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমস্থান অধিকার করে। এফ. এ., বি. এ. পরীক্ষার ফলও ক্রমে ভাল হতে থাকে। কলেজের শিক্ষার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে। বিহারীলাল লিখেছেন :[৩] "বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজী বিদ্যাপ্রসারণের প্রশস্ততর পথ আবিষ্কার করিয়া যে এ যুগে যশস্বী হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া এ দেশীয় শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন, তাহাতে তাঁহার

স্বদেশিপোষকতা-প্রবৃত্তির পরিচয়। এদেশী শিক্ষক লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিগ্বিজয়ী।"

পিতা যেমন পুত্রকে সস্নেহে লালনপালন করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি এই মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনকে শেষজীবনে তাঁর সমস্ত শক্তিসামর্থ্য ও স্নেহ-যত্ন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। তখন তাঁর দেহমন দুইই অবসন্ন হয়ে এসেছিল, এবং কর্মক্ষমতাও বিশেষ ছিল না। তা হলেও, সমাজের ও শিক্ষার কল্যাণ-কর্মে তিনি রোগশয্যাতেও যেন নবজীবনের প্রেরণা লাভ করতেন, এবং তাঁর উৎসাহ ও মানসিক শক্তিও ফিরে পেতেন। মেট্রোপলিটনের কাজে তাই তাঁর উৎসাহ ও শক্তির অভাব হয়নি। কাজকর্মের ব্যাপারে জীবনে কোনদিনই তিনি পরনির্ভর ছিলেন না। স্কুল-পরিদর্শনের কাজ তিনি রুগ্নদেহ নিয়েও নিজে করতেন, এবং অধিকাংশ সময় কাউকে না জানিয়েই করতেন। ক্লাসের শিক্ষক-অধ্যাপকরা যখন পড়াতেন, তখন চুপিসাড়ে প্রায়ই তিনি তাঁদের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁকে দেখে ছাত্র বা শিক্ষক কারও বিচলিত হওয়া নিষেধ ছিল। সসম্ভ্রমে সকলে দাঁড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দিয়ে বলতেন: "পড়াতে-পড়াতে বা পড়তে-পড়তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠা ঠিক নয়, যে যা করছ মন দিয়ে তাই কর।" শিক্ষক, ছাত্র, অন্যান্য কর্মচারী ও ভৃত্যদের পর্যন্ত তিনি সমান সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখতেন। ছাত্রদের প্রতি কটু ব্যবহার করা বা অপমানসূচক শাস্তি দেওয়া শিক্ষকদের নিষেধ ছিল। যত দুষ্টপ্রকৃতির ছেলেই হোক, অন্য সকলের সামনে অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে তাকে অপমান করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। একবার এই কারণে তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর শাখার এক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। যদি সত্যই কোন ছাত্র অমার্জনীয় অপরাধ করত তা হলে তাকে আর বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হত না। সাধারণত ছাত্ররা আদর-আবদার করে তাঁর কাছে যা চাইতেন, তা তিনি মঞ্জুর করতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের দু'একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।[৩]

একবার স্কুলের ছাত্ররা তাঁর কাছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চায়। ছুটি মঞ্জুর করে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাদের হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা তো দেশ-ঘর ছেড়ে বিদেশে আছ; কলকাতা শহরের বাসায় পিঠে পাবে

কোথায় ?" ছেলেরাও হেসে উত্তর দেয়, "আপনার বাড়িতে পাব।" বিদ্যাসাগর বলেন, "তাই নাকি ? বেশ তাই হবে।" ছেলেদের জন্য বাড়িতে তিনি প্রচুর পিঠের আয়োজন করেন। এ ছাড়া স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্র কেউ কোন কাজের জন্য তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি তাকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। এমনকি নিজের হাতে ফলমূল পর্যন্ত কেটে দিতেন। যে-কোন রকমেই হোক, মানুষকে সেবাযত্ন করে তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে মানুষে-মানুষে কোন ভেদ ছিল না। শিক্ষক, ছাত্র, এমনকি স্কুলের চাকর-বাকরদেরও অসুখ-বিসুখ হলে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেনই, অনেক সময় নিজে তাদের সেবা-শুশ্রূষাও করতেন। স্কুলের বেতন ছিল মাসিক ৩৲ টাকা, তাও অধিকাংশ ছাত্রই দিত না, বিনা বেতনে পড়ত। দারিদ্র্যের কথা শুনলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রদের 'ফ্রি' করে দেওয়া ছাড়াও, বইপত্রাদি দিয়ে সাহায্য করতেন। তার উপর, অসহায় ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে খোরপোশাক বাবদও মাসিক সাহায্য পেত। ১৮৭৪ সালের এফ. এ. পরীক্ষায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু নামে মেট্রোপলিটনের একটি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল দেখে, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "The Pundit has done wonders." বিদ্যাসাগর তখন কার্মাটারে ছিলেন হাওয়াবদলের জন্য। পরীক্ষার ফল গেজেটে প্রকাশিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে আসেন, এবং যোগেন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর কথায় যোগেন্দ্র একদিন তাঁর বাড়িতে আসে, এবং বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের পাঠাগার থেকে সুন্দররূপে বাঁধানো স্কটের ওয়েভারলি নভেলের একটি সেট নিজে হাতে লিখে তাকে উপহার দেন :

Awarded

To Jogindra Chandra Bose at the close of his brilliant career as a student in the Metropolitan Institution.

(Sd) Iswar Chandra Sarma

8th. January, 1875

এরকম বইপত্র তিনি ভাল ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই উপহার দিতেন। মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম যখন চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে একখণ্ড শেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দেন, এই কথা লিখে :

SRIMATI
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU,
The first Bengali Lady,
Who has obtained the Degree of Master of Arts,
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY
From her sincere well-wisher
ISWARA CHANDRA SARMA

কেবল উপহার দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হননি, সেই সঙ্গে চন্দ্রমুখীকে একখানি সুন্দর চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠিখানি এই :

বত্সে চন্দ্রমুখি—

সে দিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ত্ক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে কালহরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই সমভিব্যাহারে যত্কিঞ্চিৎ উপহার (Shakespear's Works) প্রেরিত হইতেছে, পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এই রকম ব্যবহার করতেন। লেখাপড়ায় একটু ভাল হলে যে-কোন ছাত্র তাঁর কাছ থেকে যা-খুশি আদায় করে নিতে পারত। শিক্ষার জন্য তাঁর কাছে কেউ কিছু সাহায্য চাইলে তিনি কখনই তা না করতে পারতেন না। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চতুর লোকেরা তাঁকে প্রতারণাও করত। একবার কলকাতা শহরের কোন লক্ষপতি,

দারিদ্র্যের ভান করে, তাঁর শ্যালককে বিনা বেতনে মেট্রোপলিটনে ভর্তি করে দিয়ে যান। কিছুদিন পরে, এই শ্যালকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও টিফিন খাওয়ার বহর দেখে বিদ্যাসাগরের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে ছাত্রটির ভগ্নিপতি একজন লক্ষপতি। তখন একদিন তিনি তাঁকে ডাকিয়ে আনেন এবং প্রতারক বলে মুখের উপর অভিযোগ করে প্রচণ্ড ধমক দেন। তারপর ভগ্নিপতির সঙ্গে তখনই শ্যালকটিকেও স্কুল থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়।

মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলেন গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।* ১৮৭০ সালে নদীয়া-শান্তিপুরে গোপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং শান্তিপুর স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে, ১৮৮৬ সালে ১৬ বছর বয়সে মেট্রোপলিটন কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বচক্ষে দেখেন। তখন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সংস্কৃত পড়াতেন নবীন পণ্ডিত এবং দর্শন পড়াতেন ক্ষুদিরাম বসু। গ্রামের ছাত্রদের বইপত্রের অসুবিধা হলে, কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই দিয়ে তাদের সাহায্য করা হত। বইপত্রের সুবিধা পাবার জন্য গোপালবাবু প্রিন্সিপালের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে লাইব্রেরিয়ানকে দেন। লাইব্রেরিয়ান গোপালবাবুকে সাধারণ গ্রাম্য ছাত্র মনে করে, চিঠি-খানা ভাল করে না দেখেই ছিঁড়ে ফেলে দেন; এবং গোপালবাবুর অনুরোধে কর্ণপাত করেন না। যথাকালে কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে পৌঁছয়। বিদ্যাসাগর একদিন কলেজে এসে ক্লাস থেকে গোপালবাবুকে ডেকে পাঠান। ঘটনাটি যখন গোপালবাবু আমার কাছে বর্ণনা করছিলেন তখন ৮৮ বছরের বৃদ্ধের চোখেমুখে আমি ঠিক ১৬ বছরের গ্রাম্য ছাত্রের অসহায় ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলাম। তিনি বললেন: "আমরা গ্রামের ছেলে, তখন বিদ্যাসাগর মশায়ের নাম শুনলেই ভয়ে আমাদের বুক দুরুদুরু করত। কলকাতায়

* এই বিবরণ আমি নিজে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংগ্রহ করেছি। সম্প্রতি ১৯৫৮ সালে প্রায় ৮৮ বছর বয়সে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে (বিদ্যাসাগর-যুগের) আর কেউ তাঁর মতন দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে জানা নেই। —বি. ঘো.

এসে দূর থেকেই তাঁকে দেখেছি। তিনি পাল্কি করে কলেজে যাতায়াত করতেন, আমরা দূর থেকে তাঁকে দেখতাম, এবং যতক্ষণ তিনি কলেজে থাকতেন, ততক্ষণ ছাত্র বা শিক্ষক কেউ ফিস্‌ফিস্ করেও কথা বলতে সাহস করত না। যেদিন প্রথম তাঁর কাছে আমার ডাক পড়ল, সেদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভেবেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। কিছুতেই আমার পা চলে না, শেষে শিক্ষক ও ছাত্ররা আমায় ঠেলতে ঠেলতে একরকম চ্যাংদোলা করেই তাঁর কাছে নিয়ে হাজির করলেন। এত কাছাকাছি বিদ্যাসাগরকে দেখার সৌভাগ্য জীবনে আর কোনদিন হয়নি। শীর্ণদেহ ছোটখাট একটি মানুষ পিঠ সোজা করে চেয়ারে বসে আছেন দেখলাম। কিন্তু দেখলে কি হবে? চোখের দিকে চাইতেই মুহূর্তের মধ্যে মনে হল যেন বাইরের প্রকৃতির সমস্ত 'তেজ' ঐ হাড় ক'খানার মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে, এবং চোখের দীপ্তিতে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি লাইব্রেরিয়ানকে কোন চিঠি দিয়েছিলে?" আমি জানতাম বিদ্যাসাগর মশায় ভয়ানক কড়া লোক, সত্যি কথা বললে হয়ত লাইব্রেরিয়ানের চাকরি যাবে। তাই বোধ হয় ৪।৫ সেকেণ্ড উত্তর দিতে আম্‌তা-আম্‌তা করেছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মশায় প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বললেন, "মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করছ? একেবারে দূর করে দেব কলেজ থেকে।" এরকম একটা শুকনো হাড়ের খোলের ভিতর থেকে যে এত জোরে গলার আওয়াজ বেরুতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আওয়াজের রেশ কাটতে না কাটতেই আমার মুখ দিয়ে অনর্গল সত্যি কথা বেরিয়ে এল। আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি আমার চিঠি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।" 'হুঁ' বলে শব্দ করে তিনি বললেন 'যাও'। পরদিন শুনলাম লাইব্রেরিয়ান পদচ্যুত হয়েছেন।"

কিছুক্ষণ থেমে গোপালবাবু বললেন: "এত কঠিন মানুষটি ভিতরে ভিতরে কত কোমল ও রসিক ছিলেন, তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। শিক্ষকদের অসুখ করলে তিনি তাঁদের আলাদা অ্যালাউন্স দিতেন, এবং

মাইনে থেকে তা কাটতেন না। তাঁর পরিহাসের একটি ঘটনা আমার মনে আছে। নবীন পণ্ডিত মশায় খুব চমৎকার সংস্কৃত পড়াতেন। একদিন ছেলেরা তাঁর ক্লাসে গণ্ডগোল করছিল। বিদ্যাসাগর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তিনি মন্তব্য করেন, "কেবল ভাল পড়ালেই হয় না, ছেলেদেরও ভাল করে দেখতে হয়।" নবীন পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "তা জানি, কিন্তু শকুন্তলা পড়াবার সময় নয়।" বিদ্যাসাগর মশায় হেসে চলে যান। এরকম অনেক কথা তাঁর সম্বন্ধে জানতাম, এখন সব মনে নেই, আর একদিনে বা একসঙ্গে মনেও পড়ে না। তবে এইটুকু বেশ মনে আছে যে আমরা বিদ্যাসাগর মশায়ের নিজের মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলাম বলে মনে মনে যথেষ্ট গর্ববোধ করতাম এবং তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সামনে মাথা উঁচু করেই চলতাম।"

গোপালবাবু ১৮৯১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছাত্রজীবনের যে স্মৃতি তাঁর মনে জাগরূক ছিল, তা মেট্রোপলিটন কলেজের দিনগুলির স্মৃতি। তার কারণ তিনি বললেন, "যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি বা তোমরা পাচ্ছ, তার ভিত্ত যিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, মেট্রোপলিটন কলেজের সৌধ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁরই কাছাকাছি থেকে, সেই কলেজের ছাত্র হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা?" সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুর কথাও তাঁর মনে ছিল। জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম, তাঁর চোখে জল ছল্‌ছল্‌ করছে। তিনি বললেন, "মনে আছে বৈ কি! খুব মনে আছে। এখনও মনে হয় গতকালের ঘটনা। সেদিন কলকাতার ছাত্ররা সারাদিন উপবাস করেছিল, এবং খালি পায়ে চলেছিল। আর পিতৃবিয়োগ হলে যা হয়, আমাদের ছাত্রদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই। তারপর দীর্ঘকাল আমি বেঁচে থাকলাম, অনেক দেশনেতার ও সমাজনেতার মৃত্যু আমি দেখেছি, বেদনাও বোধ করেছি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে অসহায়ের মতন যে শূন্যতা বোধ করেছিলাম সেদিন, সেরকম আর কখনও করিনি।"

মেট্রোপলিটন কলেজের একজন স্বনামধন্য ছাত্রের এই উক্তির মধ্যেই সেই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, এবং যে-রূপকার সেটি নিজের হাতে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিনিও আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত মূর্তিতে ভেসে উঠেছেন। এই চিত্রাঙ্কনের উপর আর কোন আঁচড় টানা বোধ হয় ঠিক নয়।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্নুইটি ফণ্ড। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কীর্তি 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্নুইটি ফণ্ড'। বাঙালীর হিন্দু-পরিবার সাধারণত একজন উপার্জনক্ষম পুরুষনির্ভর। কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পরিবারের স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলে অসহায় অনাথের মতন বিপন্ন বোধ করেন। এই পারিবারিক জীবনের খানিকটা নিরাপত্তার জন্য বিদ্যাসাগর 'অ্যান্নুইটি ফণ্ড' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। যিনি মাসে মাসে ফণ্ডে কিছু টাকা দেবেন, তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয় সেই টাকার দ্বিগুণের কিছু বেশী যাবজ্জীবন মাসিক সাহায্য পাবেন। যেমন, যদি কেউ মনে করেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী যাবজ্জীবন মাসিক ৫৲ টাকা করে সাহায্য পাবেন, তা হলে তাঁকে প্রতিমাসে ২।০ করে আন্দাজ ফণ্ডে জমা দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে অ্যান্নুইটি ফণ্ডে মাসিক ৩০৲ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২, ১৫ জুন। ১৮৭২, ২৩ ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে একটি সভা করে ফণ্ড প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রথমে ১০ জন 'সাবস্ক্রাইবার' নিয়ে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে ফণ্ডের কাজ আরম্ভ হয়। পাইকপাড়ার রাজারা একত্রে ২৫০০৲ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। প্রথম দু বছর ট্রাষ্টি ছিলেন বিদ্যাসাগর ও জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র। তৃতীয় বছর দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর ট্রাষ্টি হন। প্রতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান ছিলেন শ্যামাচরণ দে, ডেপুটি-চেয়ারম্যান মুরলীধর সেন, এবং ডিরেক্টরবোর্ডের সভ্য ছিলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন (সেক্রেটারি), ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন ও পঞ্চানন রায়চৌধুরী। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সাবস্ক্রাইবারদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষক ছিলেন।

১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র তিন বৎসর, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অ্যান্নুইটি ফণ্ডের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৫, ২৭ ডিসেম্বর তিনি ডিরেক্টরদের কাছে একখানি পত্র লিখে ফণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৭৬, ২ জানুয়ারি হিন্দু স্কুলের একটি সভায় ডিরেক্টররা তাঁর সম্পর্কত্যাগের কারণ জানতে চান। ২১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর ফুলস্কাপ কাগজের প্রায় ২০।২২ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্রে এই 'কারণ' লিখে জানান। যে-কারণে আজও বাঙালীদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বিদ্যাসাগর সেই কারণগুলিই তাঁর পত্রে বিবৃত করেছেন। ফণ্ডের হিসেব-নিকেশের ঠিক নেই, নিয়মকানুনের বালাই নেই, সভার রিপোর্ট ঠিক রাখা হয় না। ডিরেক্টররা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা চিন্তা না করে কর্তৃত্ব ও দলাদলি নিয়েই মত্ত থাকেন—এই ধরনের বহু অভিযোগ করে পত্রের শেষে তিনি দুঃখ করে লেখেন :[৫]

> এই ফণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম; কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফণ্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাহাদের হস্তে আপনারা কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহারা সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে,

এবিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধি হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।…

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি; তথাপি আপনারা আমার উপর এতদূর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফণ্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি; দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, সাধ্যানুসারে ফণ্ডের হিত চেষ্টা করিয়াছি; জ্ঞানপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সে-বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনোযোগ করি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দেন, প্রস্থান করি।

কলিকাতা — ভবদীয়স্য

১০ ফাল্গুন, ১২৮২ সাল — শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ডিরেক্টরেরা অনেক চেষ্টা করেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বদলাতে পারেননি। অ্যানুইটি ফণ্ডের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। কিছুদিন পরে রমেশচন্দ্র মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ডের পক্ষে এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা অগ্নিপরীক্ষার মতন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের কঠোর সমালোচনায় তাঁদের উপকারই হয়েছিল, নিজেদের দোষত্রুটির সমালোচনা ও সংশোধন করে, পরবর্তীকালে তাঁরা আত্মোন্নতির পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দোষ যে শুধু তাঁদেরই ছিল তা নয়, বিদ্যাসাগরেরও ছিল। বিদ্যাসাগরচরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল নিরাপস মনোভাব (uncompromising attitude)। একত্রে মিলেমিশে তিনি বড় একটা কাজকর্ম করতে পারতেন না। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে সায় দিয়ে

চলতে না পারলে তিনি কারও সঙ্গে এক-পাও চলতে পারতেন না। সেইজন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বহুলোকের সম্মিলিত কাজকর্মে তিনি খুব বেশীদিন সহযোগিতা করতে পারেননি। অ্যানুইটি ফণ্ডের ক্ষেত্রেও কতকটা তাই হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ডের' পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছিল, এবং এই ফণ্ড তাঁর জীবনের একটা বড় কীর্তি।

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের কীর্তি নয়। তিনি তার পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা কিছুই করেননি। এটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী পরিকল্পনা। 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের' তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের নাবালক জমিদারদের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা করার জন্য ১৮৫৪, ১১ নবেম্বর একটি 'অ্যাক্ট' পাশ করা হয়। একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর অধীনে, ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সের নাবালক জমিদারদের একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে রেখে ভালভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬, মার্চ মাসে কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়। প্রথমে প্রতিষ্ঠানটি ছিল চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে, পরে ১৮৬৩, অক্টোবর মাসে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে স্থানান্তরিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বা পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়। ১৮৬৩, ১৮ ফেব্রুয়ারি 'বোর্ড অফ রেভিনিউ' বিদ্যাসাগরকে এই ইনস্টিটিউশনের ভিজিটর বা পরিদর্শক হতে অনুরোধ করেন। নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫, মার্চ পর্যন্ত তিনি পরিদর্শকরূপে কাজ করে, বোধ হয় ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করেন। এই দু'বছর পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনি ইনস্টিটিউশনের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করেন, সেইটাই এখানে উল্লেখযোগ্য।[২]

পরিদর্শক নিযুক্ত হবার পর 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর সেক্রেটারি আর. বি. চ্যাপম্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একখানি পত্রে লেখেন (Dated Fort William, the 3rd November 1863) :

১। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন এখন মাণিকতলায় অবস্থিত। আপনি প্রতি বছরে মার্চ, জুলাই ও নবেম্বর মাসে একবার করে অন্তত এই ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করবেন।

২। বছরের অন্যান্য মাসে অন্যান্য পরিদর্শকরা দেখাশুনা করবেন।

৩। আপনার কাছে ইনস্টিটিউশনের নিয়মকানুনের একটি কপি পাঠাচ্ছি। এই নিয়মাবলীর ৪০নং ধারা অনুযায়ী আপনার কর্তব্য হবে, যে-তিনমাসের দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়া হয়েছে, সেই তিনমাস মাসে একদিন করে অন্তত পরিদর্শনের কাজে যাওয়া এবং তত্ত্বাবধানে সাহায্য করা। অন্যান্য মাসেও আপনার ইচ্ছা হলে আপনি ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করতে পারেন।

কয়েকমাস ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করার পর বিদ্যাসাগর তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি (Memorandum) পেশ করেন (৪ এপ্রিল, ১৮৬৪)। স্মারকলিপির মর্ম এই :

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ভিতরের ব্যবস্থা দেখে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু একটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি খুশী হতে পারিনি, এবং তা পরিবর্তন করারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। বর্তমান ব্যবস্থানুসারে নাবালক ছেলেরা এক ঘরে একত্র হয়ে এক টেবিলের চারিদিকে পড়তে বসে। প্রথম দিন থেকেই পড়াশুনা করার এই ব্যবস্থা দেখে আমি প্রীত হতে পারিনি। তারপর যতদিন আমি দেখেছি ততদিন আমার মনে হয়েছে, এ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। স্পেলিং-বুক থেকে এণ্ট্রান্স কোর্স পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে, এবং তার জন্য ভিন্ন পাঠও নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা যদি এক টেবিলে বসে একসঙ্গে পড়াশুনা করে, তা হলে কেবল গণ্ডগোলই হতে পারে, পড়াশুনা হতে পারে না। সকালবেলা ডিরেক্টর এই ঘরে এসে বসেন, এবং আমার ধারণা তাতে ছেলেদের পড়াশুনার আরও ক্ষতি হয়। নানারকমের লোক নানা কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, এবং তাতে যথেষ্ট গণ্ডগোল হয়। ছেলেদের পাঠ্য বুঝিয়ে দেবার

জন্য একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে নানা ক্লাসের ছাত্রদের একসঙ্গে পড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। কোন ছেলেরই তাতে কিছুমাত্র উপকার হয় বলে মনে হয় না। তার ফলে, এরকম একটি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্বেও নাবালক জমিদাররা কিছুই লেখাপড়া শিখতে পারছে না। এই সব দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য আমি ভেবেচিন্তে আপনাদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি। আশা করি আপনারা প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে দেখবেন।

১। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা জায়গা এবং আলাদা টেবিল থাকা উচিত; ২। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা শিক্ষক থাকা উচিত; ৩। নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য যে শিক্ষক নিযুক্ত হবেন তিনি সকালে ও বিকেলে দুবেলাই হাজির থাকবেন। উঁচু ক্লাসের শিক্ষক একবেলা হাজির হলেই চলবে।

নাবালকদের ভাল করে শিক্ষা দেবার জন্য আমি একাধিক শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে স্কুলে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে এইভাবে বিশেষ যত্ন নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া শেখাই সম্ভব নয়। যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তা হলে আপনাদের ইনস্টিটিউশনে নাবালকদের শিক্ষাব্যবস্থার যে-সব দোষত্রুটি আছে তা দূর হয়ে যাবে।

বিদ্যাসাগরের এই স্মারকলিপি পাবার পর রেভিনিউ সেক্রেটারি একখানি চিঠিতে তাঁকে সমস্ত বিষয় তদন্ত করে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে অনুরোধ করেন। চিঠিখানি এই :

To

Pundit Ishur Chandra Vidyasagar

Dated Fort William, the 18th Nov. 1864.

Sir,

The Government of Bengal have requested the Board of Revenue to call upon you for a full report respecting

the working of the Wards' Institution at Calcutta for the year 1863-64, on the following heads :

2nd. Number of Boys ; Progress ; Course of Instruction ; Physical Education ; Health ; Food ; Expenses ; Visitors' Inspection.

3rd. I am directed to beg the favour of your submitting the required report as early as possible and to request that a similar report be submitted for every succeeding year as soon after the end of May as possible.

I have the honour to be,
Sir
Your most obdt. Servt.
(Sd) R. B. Chapman.
Secretary

এই চিঠি অন্যান্য পরিদর্শকদেরও পাঠানো হয়েছিল। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন পরিদর্শকরা সকলে মিলে একটি রিপোর্ট দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অন্য পরিদর্শকদের মতভেদ হয়েছিল বলে তিনি ১১ জানুয়ারি, ১৮৬৫ একটি আলাদা রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁর রিপোর্টের মর্ম এই :

এই রিপোর্ট দেবার আগে আমি জানাতে চাই যে অন্যান্য পরিদর্শকদের রিপোর্টের সঙ্গে আমার এই রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতভেদ হওয়াতে আমি আলাদা রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। সেজন্য মার্জনা করবেন।

ছাত্রসংখ্যা। গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রেজিস্টারে ১২জন ছাত্র ছিল।

শিক্ষা। দু'একটি বিষয় ছাড়া নাবালকদের শিক্ষার উন্নতি বিশেষ হয়নি। পরে সে-বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করব।

ব্যায়ামশিক্ষা। ব্যায়ামশিক্ষার প্রণালী উন্নত ও প্রশংসনীয়।

স্বা স্থ্য। সাধারণত ছেলেদের স্বাস্থ্য ভালই।

খা দ্য। যতদূর আমি নিজে দেখেছি, ছেলেদের খাদ্যদ্রব্য খুবই ভাল ও স্বাস্থ্যকর। নাবালকদের নিজেদের লোকরাই আলাদা রান্নাঘরে খাবার তৈরি করে থাকে।

ব্য য়। বৎসরের মোট ব্যয় ৩১,৫২৪৷৵১০, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক বালকের জন্য ২৬২৭৲ টাকা, মাসে ২১৯৲ টাকা। নাবালকরা ধনিক জমিদারবংশের ছেলে, এবং কলিকাতায় খাওয়া-দাওয়ার খরচও বেশী। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে খরচ অত্যধিক হয়েছে বলা যায় না।

প রি দ র্শ ন। ১৮৬৩, নভেম্বর থেকে গত বছরের শেষ পর্যন্ত আমি ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পাঁচবার পরিদর্শন করেছি। প্রথম থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তেমন ভাল নয়। এই ব্যবস্থার কিভাবে উন্নতি করা যায়, তা আমি আমার ৪ এপ্রিল, ১৮৬৪ তারিখের স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছি। আমার প্রস্তাবের পর একজন মাত্র অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয়নি। গত বছর আমার স্মারকলিপি পাঠাবার পর থেকে এবিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে ওয়ার্ডদের শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংস্কার না করলে তাদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। ইনস্টিটিউশনে তাদের ৪ থেকে ৬ বছর রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে বাইরের স্কুলেও ছেলেরা বিশেষ কিছু লেখাপড়া শেখে না। বর্ণপরিচয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা পেতে প্রায় ৯ বছর সময় লাগে। কিন্তু পরীক্ষা দিলেও ইংরেজীশিক্ষা তাদের বিশেষ কিছু হয় না। অতএব পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা পাবার আগেই যদি কেউ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তা হলে তার কতদূর শিক্ষা হতে পারে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। ওয়ার্ডদের শিক্ষা প্রায় এইরকমই হয়ে থাকে। যতদিন সাধারণ স্কুলে তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন তাদের এই অবস্থার কোন উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। অথচ ইনস্টিটিউশন ছেড়ে যাবার আগে তাদের কতকগুলি

বিষয়ে কার্যোপযোগী শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য, আমার ধারণা, এইভাবে তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় :

১। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউশন কেবল ওয়ার্ডদের বাসস্থান হয়ে আছে। একে বোর্ডিং-স্কুলে পরিণত করা প্রয়োজন।

২। ওয়ার্ডদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা উচিত।

৩। শিক্ষা দেবার জন্য সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত।

সাধারণ স্কুলের মতন ওয়ার্ডের লেখাপড়া শিখিয়ে কোন লাভ নেই। তাদের কাজে লাগতে পারে এরকম শিক্ষাই অল্পকালের মধ্যে তাদের দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাতে ফল ভাল হবে।

ওয়ার্ডদের শাসন করবার জন্য যে নিয়মাবলী আছে, তার একাদশ নিয়মটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নিয়মের তাৎপর্য এই যে কোনরকম গুরুতর অপরাধ না করলে ওয়ার্ডদের দৈহিক দণ্ড দেওয়া হবে না। কিন্তু অর্ডারবুক দেখে মনে হয়, প্রতি মাসে বালকদের ৪ থেকে ১২ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। যে যে অপরাধে তারা এই দণ্ড পেয়েছে তার মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনটাই গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয় না। সেটিরও বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, আমার মতে অপরাধ যে রকমেরই হোক না কেন তার জন্য বালকদের কখনই দৈহিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। আমি এই দণ্ডনীতির ঘোর বিরোধী। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে বালকদের দৈহিক দণ্ড দিলে, তাদের চরিত্রের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়।

এই রিপোর্ট পাঠাবার পরে বিদ্যাসাগর ১৮৬৫, ২৯ আগস্ট ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনে উন্নতির জন্য আর-একটি স্মারকলিপি পাঠান। এই স্মারকলিপিতেও তিনি আগের মতন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন। তাঁর প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

তা ছাড়া শিক্ষা ও শাস্তির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতবিরোধও হয়েছিল। অনেকে বলেন, সেই কারণে তিনি পরিদর্শকের কাজ ছেড়ে দেন। তা দেওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়, কারণ কোন বিষয়ে মতভেদ হলে তিনি কিছুতেই আপস-মীমাংসা করে কাজ করতে পারতেন না। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন থেকে তাঁর পদত্যাগের কারণও তাই।

প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে, অথবা কাজকর্মের দিক থেকে, বিদ্যাসাগর ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের জন্য বিশেষ কিছু করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এটি তাঁর কোন কীর্তির মধ্যেই গণ্য হবার মতন নয়। তবু তিনি এই ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শকরূপে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যেটুকু নতুন করে চিন্তা করেছিলেন তার গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত তিনি যত সুস্পষ্টভাবে এই ইনস্টিটিউশন প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন, সে-রকম আর কোন ক্ষেত্রে করেন নি। এইজন্যই তাঁর কর্মজীবন প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের কথা আলোচনা করা হল। ইনস্টিটিউশনের জন্য নয়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের জন্য।

১৩ | চরিত্র

মানবচরিত্র অনেক সময় দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বলে মনে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরচরিত্রে কোথাও রহস্যময়তা বলে কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার প্রতিমূর্তি। একমাত্র তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বহু জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। কেউ বলেছেন, তিনি সংশয়বাদী ; কেউ বলেছেন, তিনি নাস্তিক ; আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রচলিত অর্থে তিনি ধর্মবিশ্বাসী না হলেও, ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলেছেন যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দুই বন্ধুই নাস্তিক ছিলেন। মদনমোহন প্রকাশ্যেই সেকথা বলতেন, বিদ্যাসাগর বলতেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি, যদিও সন্দেহের অবকাশ আছে। একথা অবশ্য ঠিক যে ঈশ্বরচিন্তার চেয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে মানবচিন্তা ও সমাজচিন্তাই বড় ছিল। কিন্তু তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, এমন কথা বলা যায় না। ধর্ম ও ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের কাছে 'একান্ত ব্যক্তিগত' উপলব্ধির ব্যাপার ছিল। বাইরে, একমাত্র চিঠিপত্রের শীর্ষে ছাড়া, তা কোনদিনই তিনি প্রকাশ করেননি। প্রকাশ করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। সাধারণত বাইরের আচরণে ও কথাবার্তায় মনে হত বটে যে তিনি ধর্ম বা ঈশ্বর কিছুতেই বিশ্বাস করেন না।

তাঁর চরিত্রের কেবল এই একটি দিকই আপাতদৃষ্টিতে সত্যই দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় বলে মনে হত। তাঁর চরিত্রের এই নির্জন কোণটি কতকটা দেবালয়ের ছায়াবৃত গর্ভগৃহের মতন। সেখানে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং কোন্ দেবতা, তা কেউ জানত না। বিদ্যাসাগরের অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুও জানবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। সূর্যের একটি কোণ শুধু ঢাকা ছিল, এবং সেই অন্ধকারও ছিল দুর্ভেদ্য।

বিদ্যাসাগরচরিত্রের বাকি সবটুকুই ছিল আলোর সমুদ্রের মতন। আলোর প্রাচুর্য ও আলোর তরঙ্গের সম্মুখীন হয়েছি মনে হত তাঁর সান্নিধ্যে এলে। আলোর দীপ্তিতে ধাঁধিয়ে যেত মানুষ। এত পর্যাপ্ত আলো, এবং সে-আলোর এত তেজ, বোধ হয় সাধারণ মানুষের সমাজে ভাল নয়। সমাজে ও সংসারে আলো-ছায়ার খেলাই ভাল। চরিত্রের এই আলোছায়ার খেলায় যাঁরা সুদক্ষ খেলোয়াড়, সাংসারিক বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের চোখে তাঁরাই সাধারণত কৃতী ও চরিত্রবান বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু সূর্যালোকের মতন স্পষ্ট যাঁরা, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত চরিত্রের উন্মুক্ততার জন্য প্রচণ্ড ক্ষতিস্বীকার করেন। বিদ্যাসাগরকেও তাই করতে হয়েছিল। তাঁর অনাবৃত চরিত্রের জন্য তিনি পদে-পদে সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে দণ্ডিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর চরিত্রে অন্ধকারের ছায়া আসেনি। ভুলভ্রান্তির খেসারত দিতে দিতে তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, তবু চরিত্র তাঁর বদলায়নি। জীবনের আদর্শ, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস যাঁর বদলায়নি কোনদিন, তাঁর চরিত্র বদলাতে পারে না। চরিত্রের এই উপাদানগুলিই পরিবর্তনশীল, সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বদলাতে পারে। বিদ্যাসাগরের জীবনে সামাজিক আবর্তের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও তা এতটুকু বদলায়নি। বাকি থাকে চরিত্রের কতকগুলি মৌলিক উপাদান—স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, দয়া, করুণা, বেদনা ইত্যাদি। এগুলি যে একেবারে অপরিবর্তনীয় তা নয়, জীবনের প্রচণ্ড আঘাতে ও দুর্বিপাকে এই সব মৌলিক অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়। সরলবিশ্বাসী মানুষ ঘোর অবিশ্বাসী হয়ে যায়, কোমলহৃদয় মানুষ হয়ে যায় নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। সমাজে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিদ্যাসাগর পরোপকার করে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছেন, বিশ্বাস করে কৃতঘ্নতা পেয়েছেন, দয়াদাক্ষিণ্য করে দুর্নামের ভাগী হয়েছেন, প্রীতির বদলে পেয়েছেন বিদ্বেষ ও বৈরিতা। সমস্ত দানের বদলে এত বিপরীত 'প্রতিদান' পেয়েছেন তিনি, তবু তাঁর মৌলিক হৃদয়বৃত্তিগুলির কোন পরিবর্তন হয়নি। শেষ জীবনে তাঁর কথাবার্তার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ-পরিহাসের মধ্যে স্ফুলিঙ্গের মতন 'নৈরাশ্য' প্রকাশ পেত বটে, কিন্তু সামাজিক আচরণে তা কখনও প্রকাশ পায়নি। দয়াদাক্ষিণ্য, মানবপ্রীতি, করুণা এগুলি আজীবন তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল। বঞ্চিত হতে পারেন জেনেও তিনি দয়ার পাত্রকে দয়া করেছেন, অকৃপণ হাতে দান করেছেন, করুণাও করেছেন। জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার জন্য মানবিক হৃদয়বৃত্তি কোনদিন বিসর্জন দিতে পারেননি।

মানবিক গুণ ছিল বিদ্যাসাগরচরিত্রের মৌলিক উপাদান। তাঁর মতন উদার হৃদয়বান মানুষ উনিশ শতকের বাংলাদেশে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। দেশের সাধারণ লোক তাঁকে 'দয়ার সাগর' ও মানবতার অবতার-রূপে জানতেন ও ভালবাসতেন। তাই জানাই স্বাভাবিক। দরিদ্র দেশের অসহায় মানুষের কাছে দয়াই মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে মনে হয়, কারণ অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশে তাই বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন :

> বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালিহৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না।...

পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

•

নিজের সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করে, কিভাবে তিনি পরোপকার করতেন, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত তারানাথকে কালনা গিয়ে চাকরির সংবাদ দেবার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। জাতি ও ব্যাধি নির্বিশেষে বিদ্যাসাগর রোগীর পরিচর্যা করতেন, আর্ত ও পীড়িতের সেবা করতেন, এবং দীনদুঃখীকে অকাতরে সাহায্য করতেন। একবার গ্রামে দুর্ভিক্ষের সময় যখন তিনি অন্নসত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন, তখনও তাঁর ব্যবহারের মধ্যে এই বলিষ্ঠ পুরুষোচিত কারুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন অগ্রজের জীবনচরিতে লিখেছেন যে অন্নসত্রে যেসব স্ত্রীলোক ভোজন করত, তৈলাভাবে তাদের মাথার চুল রুক্ষ দেখাত। তাই দেখে বিদ্যাসাগর খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যেকের জন্য দু'পলা করে তেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতির অনেক স্ত্রীলোক অন্নসত্রে খেত। যারা তেল বিতরণ করত তারা এদের ছোঁয়া যাবে এই ভয়ে দূর থেকে তেল বিতরণ করত। তাই দেখে বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর নিজেই সকলকে তেল বিতরণ করতেন, এবং মধ্যে মধ্যে মাথায় মাখিয়েও দিতেন। এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য *হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে,* তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না।

'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের সুকোমল হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে পৌরুষ বলিষ্ঠতা ও নিঃসঙ্কোচ অকৃত্রিমতা ছিল, তা সাধারণ দয়ালু ও দানশীল ব্যক্তির চরিত্রে থাকে না। এই পৌরুষই বিদ্যাসাগরচরিত্রের আসল উপাদান। তাঁর চরিত্রের অন্যান্য সমস্ত গুণকে এই পৌরুষ শতগুণ মহত্ত্ব দান করেছে। মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন : "I look upon him in many respects as the first man among us"—"আমি তাঁকে অনেক দিক থেকে আমাদের মধ্যে প্রথম (প্রধান) মানুষ বলে মনে করি।" কবি হেমচন্দ্র বলেছিলেন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে,—"উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি," এবং "স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।" রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : "আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।"

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশের তিনজন কবি একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর চরিত্রবিশ্লেষণ করেছেন। কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরচরিত্রের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে 'আমাদের মধ্যে প্রথম (প্রধান) মানুষ' বলে পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদনের এই উক্তিকে একটু সংশোধন করে আমরা বলতে পারি, বিদ্যাসাগর কেবল আমাদের মধ্যে প্রথম বা প্রধান মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন এদেশের 'প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক

মানুষ”। ‘মানুষ’ ও ‘আধুনিক মানুষ’, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কবিচিত্তের উচ্ছ্বাসে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে ‘প্রধান মানুষ’ বলেননি। মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ সমাজে এত দুর্লভ যে হঠাৎ তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতন একজন সত্যকার আদর্শ মানুষ দেখলে তাঁকে ভাবাবেশে ‘first man’ বলে অভিনন্দন জানানোই স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচার করলে বিদ্যাসাগরকে নবযুগের বাংলার, প্রথম না হলেও, একজন ‘শ্রেষ্ঠ আধুনিক মানুষ’ বলতে হয়। আধুনিকতার সমস্ত উপকরণ দিয়ে বিদ্যাসাগরচরিত্র গঠিত ছিল। তার মধ্যে প্রধান হল, কবি হেমচন্দ্র যাকে বলেছেন, ‘স্বাতন্ত্র্যের শেঁকুল-কাঁটা’। শেঁকুলকাঁটার মতন সুতীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য এ যুগের আধুনিক মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এক হয়ে মিশে ছিল আর একটি গুণ, রবীন্দ্রনাথ যাকে ‘অখণ্ড পৌরুষ’ বলেছেন। আধুনিকতা মানবিকতা স্বাতন্ত্র্য ও পৌরুষ, এই কয়েকটি দুর্লভ গুণের বিচিত্র সমন্বয় ছিলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্তে এরকম অনেক ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি, যার মধ্যে তাঁর চরিত্রের এই বিশিষ্ট গুণগুলি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা আরও দু’চারটি ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাগুলি একেবারে নির্ভেজাল সত্য ঘটনা নাও হতে পারে। কোনটির মধ্যে হয়ত কাহিনী-কিংবদন্তীর অতিরঞ্জনও থাকতে পারে। তা থাকলেও তার মূল্য আছে, কারণ লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীর অন্তরালেও সত্যের যে শাঁস থাকে তা লোকচরিত্রবিচারে একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর নিত্যসঙ্গী ‘তালতলার চটির’ কথা মনে হয়। এই চটি প্রসঙ্গে আগে বলেছি* “বিদ্যাসাগরের চটি তাঁর তীব্র individualityরই প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।” একথাও বলেছি যে “Renaissance-এর individualityর সত্যকার প্রতীক ছিল বিদ্যাসাগরের ‘তালতলার চটি’।” এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে বিদ্যাসাগরের চটি পায়ে দিয়ে প্রবেশের সমস্যা নিয়ে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে ‘সাধারণী’ পত্রিকা ‘তালতলার চটি’ নাম দিয়ে লিখেছিলেন :[১]

* বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম খণ্ড, ১৫-১৭ পৃষ্ঠা

রে তালতলার চটি ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না! ইংরাজ, বটবিটপীর সহিত সাফোটক সমান করিয়া তুলিয়াছেন, কেবল বুট-চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না। ইংরাজ, মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের সহিত মধু মুচীকে এক কাণ ফোঁড়া কাগজে গাঁথিলেন, কেবল, রে চটি! তোর দুরদৃষ্টক্রমে বুট-চটি, একভাবে দেখিতে পারিলেন না। ইংরাজ, বিচারকার্য্যের সাহায্য জন্য সাক্ষী ডাকিয়া আনেন, আনিয়া, তিনু ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্ব্বভৌমকে দাঁড় করান, আবার সার্ব্বভৌমের স্থানে গুলজার মণ্ডলকে উঠাইয়া দেন, ইংরাজের চক্ষে উচ্চ নীচ নাই, কেবল রে চর্ম্মচটি! তোরই প্রতি তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরাজ বাহাদুর বস্ত্র-পরিষ্কারককে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়াছেন, মলজীবীর পুত্রকে মসীজীবী করিয়াছেন, ধীবর মৎসজীবীকে ধীমান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পীরবক্স খাঁকে রায় বাহাদুর করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগ্য তালতলার চটি, এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র উন্নতি হইল না।

চটি তুই আপন কর্মদোষে আপনি মারা গেলি! এমন সামাজিক জোয়ারে তাই তুই ঠেলিয়া উঠিতে পারিলি না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইংরেজরা চটিকেও বুটের মতন 'ইনডিভিড্যুয়াল' বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে তালতলার চটিই হোক, আর বিলেতের বুটই হোক, কারও কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই, এবং তা না থাকলেও তারা যাঁর পদলগ্ন হয়ে থাকে তাঁরই আত্মমর্যাদা তাদের নির্জীব চর্মদেহে সঞ্চারিত হয়। বিদ্যাসাগরের চটি বিদ্যাসাগরেরই প্রতিনিধি। একথা ব্রিটিশ শাসকরা বুঝেছিলেন, এবং তার কাছে তাঁদের উদ্ধত মাথাও হেঁট করতে হয়েছিল।

আনুমানিক ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। রামগোপাল ঘোষ ও ভূকৈলাসের (খিদিরপুর) রাজা

To

W. Morgan Esqre

Clerk to the Legislative Council of India

Fort William

Sir.

I, on behalf of the individuals that have signed the accompanying petition, beg leave to request the favor of your submitting it before the Council at their next weekly meeting.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obedt. servant

Rajnarain Bose

Midnapore, 29th March 1856.

রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রেরিত আবেদন পত্র। সপক্ষে
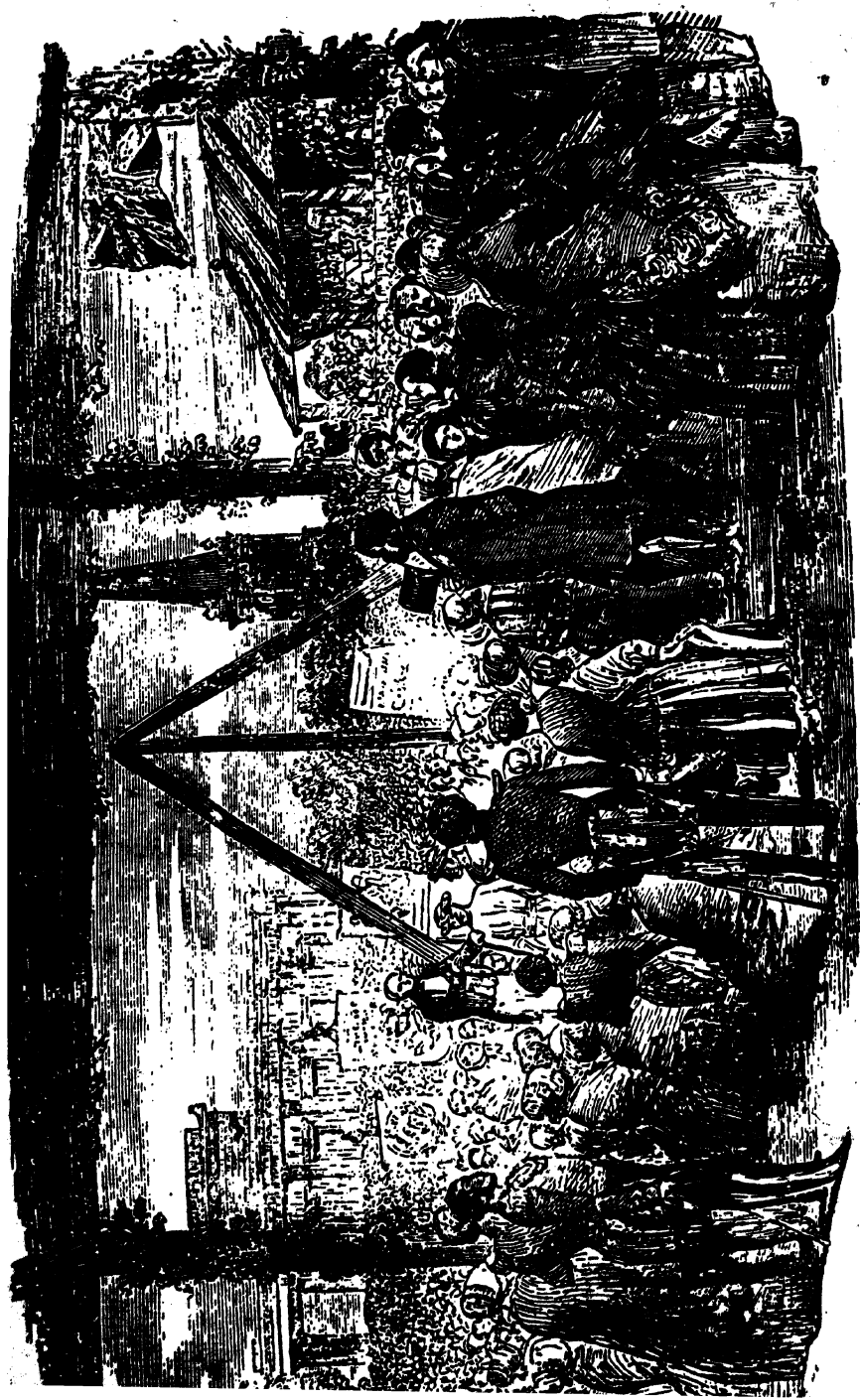
বেথুন স্কুলের ভিত প্রতিষ্ঠা উৎসব

সত্যশরণ ঘোষালের সঙ্গে তিনি বর্ধমান বেড়াতে যান। বিদ্যাসাগর রাজবাড়ীর সিদে গ্রহণ না করে এক বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া করতেন। মহারাজা খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে যেতে রাজী হন না, পরে অনেক অনুনয়বিনয়ের পর একদিন রাজবাড়ীতে যান। মহারাজা প্রথানুযায়ী পণ্ডিত-বিদায় হিসেবে তাঁকে নগদ ৫০০৲ টাকা ও একজোড়া শাল উপহার দেন। উপহার প্রত্যাখ্যান করে বিদ্যাসাগর বলেন, "আমি কারও দান গ্রহণ করি না। আমি কলেজে চাকরি করি, এবং যে বেতন পাই তাতেই আমার চলে যায়। টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের দান করলে তাঁরা উপকৃত হবেন।" উত্তর শুনে বর্ধমানের মহারাজা স্বভাবতই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং বুঝেছিলেন যে কেবল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরূপে নয়, মানুষ হিসেবেও যে-কোন মানুষের মতন বিদ্যাসাগরকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। এই ঘটনার পর থেকে মহারাজা বিদ্যাসাগরকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। একবার মহারাজা বীরসিংহ গ্রাম ও তার সংলগ্ন অঞ্চল বিদ্যাসাগরকে 'তালুক' হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "আমার যখন এমন অবস্থা হবে যে, সমস্ত প্রজার খাজনা আমি নিজে দিতে পারব, তখন আপনার 'তালুক' গ্রহণ করব।"[২]

রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের খুবই হৃদ্যতা ছিল। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে রমাপ্রসাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য হয়। শোনা যায়, আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন রমাপ্রসাদ বিদ্যাসাগরকে উৎসাহ দেন এবং নানাভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দেন। কার্যকালে প্রথম বিধবাবিবাহের দিন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সম্মত হন না। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ঘটনাটি এইভাবে প্রকাশিত হয়: "শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বিধবাবিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড়লোক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এ বিবাহের পূর্ব্বে তিনি (বিদ্যাসাগর) স্বাক্ষরকারিগণের

মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম।' এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।' এরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।" রামমোহনের পুত্র এবং তার বন্ধু হলেও তিনি রমাপ্রসাদের এই দ্বিধা ও দুর্বলতা মার্জনা করেননি।[৩]

রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করার জন্য তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ ছিলেন অকৃত্রিম সারল্যের প্রতিমূর্তি, বিদ্যাসাগরও তাই ছিলেন। সাক্ষাতের পর তাঁদের পরস্পরকে চিনতে ও বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি। উভয়েই ভাল কথা বলতে পারতেন, এবং পরিহাসপটুতায় কেউ কারও চেয়ে কম পারদর্শী ছিলেন না। সাক্ষাতের পর রামকৃষ্ণ বলেন, "আমি সাগরে এসেছি, ইচ্ছে আছে কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।" কথার তাৎপর্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। মৃদু হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয়না, কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।" রামকৃষ্ণ পরিহাস উপভোগ করেন এবং হাসিমুখে বলেন, "এমন না হলে আর সাগরকে দেখতে আসব কেন?" সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে উভয়েই পরম তৃপ্তিলাভ করেন। আলাপান্তে বিদ্যাসাগর তাঁকে কিছু জলযোগ করতে অনুরোধ করেন। রামকৃষ্ণ সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ রক্ষা করেন।[৪]

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ 'লীলামৃত' পুস্তকে এইভাবে দেওয়া হয়েছে:[৫] "ইহার পর ঠাকুর বদান্য ও বিদ্যাদাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহাকে বলেন, 'এতদিন গেড়ে ডোবায় ছিলাম, আজ সাগরে এসে মিশলাম।' 'যখন সাগরে এসেছেন, তখন নোনাজল খেয়ে যান', এই কথা বিদ্যাসাগর বলিলেন। ঠাকুর কহেন,

'না গো তুমি তো অবিদ্যাসাগর নও যে তোমাতে লোনাজল থাকবে। দেখছি, তুমি বিদ্যার সাগর। লোক দেখাবার জন্য হাতীর বাহিরে একরকম দাঁত। লোকহিতকর কাজে বাহিরে তোমার উৎসাহ, কিন্তু অন্তরে তুমি বেদান্তজ্ঞানী। তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "কিরূপ?" ঠাকুর সহাস্যে কহেন, "আলু পটোল সিদ্ধ হলে নরম হয়। তা তুমি খুব নরম দেখছি।" পরে রামকৃষ্ণ লীলামৃতের লেখককে বলেন, "বিদ্যাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ, আমার মতো কর্মনাশার সঙ্গে মিশলে পাছে তাঁর বিদ্যাদান কর্ম উচ্ছেদ হয় তাই আপন কল্যাণমুক্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করলেন।" বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে বিদ্যাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ, এবং সমাজকল্যাণই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, তার বদলে আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যক্তিগত কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর কাম্য নয়। একজন নমস্য পুরুষ আর-একজন নমস্য পুরুষকে সহজেই চিনতে পারেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিদ্যাসাগর তাই পরস্পরকে প্রথম সাক্ষাতেই ঠিকভাবে চিনতে পেরেছিলেন। উভয়েই বুঝেছিলেন, তাঁদের মানবকল্যাণের আদর্শ মূলত এক হলেও, দুজনের পথ ভিন্ন। অনর্থক তর্ক করে তাই তাঁরা পথের মীমাংসা করেননি, এবং কেউ কাউকে নিজের পথে আনতেও চাননি। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে দুজনেই বিদায় নিয়েছিলেন, এবং পরস্পরের প্রতি সেই শ্রদ্ধার গভীরতাও তাঁদের কমেনি কোনদিন।

রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক মধুর ছিল। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় রাজনারায়ণ কেবল মুখে নয়, প্রত্যক্ষ কাজেও যে বিদ্যাসাগরকে কতখানি সাহায্য করেছিলেন, পুর্বে তার বিবরণ দিয়েছি। কেবল আদর্শের ক্ষেত্রে নয়, কর্মক্ষেত্রেও রাজনারায়ণ ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু নানাবিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। একবার তাঁর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তিনি বিদ্যাসাগরের উপদেশ চান। বিবাহের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নিয়ে বোধ হয় তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এবং তারই সমাধান ও উত্তরের আশায়

তিনি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন :[৩]

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

কয়েক দিবস হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি; কিন্তু নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি নাই, ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

আপনার কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি; কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে এ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনি দেবেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ-প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্ব্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্ব্বাংশে ভাল হয়।

আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি তাং ৬ আশ্বিন।

ভবদীয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

এই চিঠিখানির মধ্যে বিদ্যাসাগরের চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বিবাহের অনুষ্ঠানরীতি সম্পর্কে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করেননি, এবং তা রাজনারায়ণ বসুর উপর আরোপও করতে চাননি। বরং তিনি বলেছেন যে প্রাচীন প্রণালী অনুযায়ী রাজনারায়ণবাবু যদি কন্যার বিবাহ দেন তা হলে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটবে। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে সেইভাবে কাজ করাই এক্ষেত্রে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি যাঁর অচল নিষ্ঠা, তিনি যে অন্যের আদর্শকেও কতখানি শ্রদ্ধা করেন, তা বিদ্যাসাগরের এই চিঠি থেকে বোঝা যায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিদ্যাসাগর পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষা নেবার পর বিদ্যাসাগর খুবই দুঃখিত হন, কিন্তু কোনদিন তিনি তা প্রকাশ করেননি। তিনি নিজে ব্রাহ্ম না হলেও, ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর কোন অশ্রদ্ধা ছিল না। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সেক্রেটারি ছিলেন, এবং 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'র গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর কোন জাতবিদ্বেষ ছিল না। শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই বলেছেন, "his sympathies were with those who acted from their convictions"—যে-কোন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। এই মনোভাব তাঁর রাজনারায়ণ বসুর চিঠিতেও প্রকাশ পেয়েছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার পর তাঁর পিতা কাশীবাসী হন। এই সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগর খুব দুঃখিত হন। শাস্ত্রী মহাশয় এমন কিছু অন্যায়

করেননি যার জন্য মনের দুঃখে তাঁকে কাশীবাসী হতে হবে। কাশী থেকে একবার কলকাতায় এসে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে রীতিমত কথা শুনিয়ে দেন। দেখা হবার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,"কি হারান, শুনলাম তুমি নাকি কাশীবাসী হয়েছে ? গাঁজা খেতে শিখেছ কি ?" হারানবাবু উত্তর দেন, "কাশীবাসী হওয়ার সঙ্গে গাঁজা-খাওয়ার কি সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না।" বিদ্যাসাগর বলেন, "এত সহজ ও সোজা সম্পর্কটা বুঝতে পারলে না ? জান তো, লোকের বিশ্বাস কাশীতে যাঁর মৃত্যু হয় তিনি সাক্ষাৎ শিব হন। শিব হলেন পাঁড় গাঁজাখোর। কাশীতে মৃত্যুর পর যখন শিব হবে তখন তোমাকেও তো গাঁজা খেতে হবে ? তাই বলছিলাম, মৃত্যুর আগেই যদি একটু প্র্যাকৃটিস করে রাখতে, তা হলে শিব হওয়ার সুবিধে হত।"

পিতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই কথাবার্তা শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতিও যে বিদ্যাসাগরের আদৌ কোন আস্থা ছিল না, তা তাঁর এই মনোভাব থেকেই বোঝা যায়। মনে হয়, কোন ধর্মেরই লোকাচরণে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ধর্ম যিনি সংস্থাপন করেন, এবং যাঁরা আচরণ করেন, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ক্রমে সংস্থাপিত ধর্মের সঙ্গে আচরিত ধর্মের দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়। ধর্ম ধীরে ধীরে অধর্মের ও ব্যভিচারের আশ্রয় হয়ে ওঠে। নিজের জীবনে বিদ্যাসাগর অতি অল্পকালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মেরই এই শোচনীয় পরিণতি দেখেছিলেন। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম কেশবচন্দ্র সেনের আমলে ও তাঁর পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে মিশে যায়। অবতারবাদ ভক্তিবাদ ও হিন্দুত্বের নানারকম উপসর্গ ব্রাহ্মধর্মানুরাগীদের মধ্যে এমন উৎকটরূপে দেখা দেয় যে গোঁড়া হিন্দুরাও তাতে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে সব ধর্মের এই পরিণতি দেখে সে-পথে অগ্রসর হননি। তাই বলে কোন ধর্মবিশ্বাসকেই তিনি কটাক্ষ করতেন না। মানুষের আন্তরিক বিশ্বাসকে তিনি সবসময় শ্রদ্ধা করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, তাঁর পিতামাতার কথা ভেবে। দীক্ষা নেবার পর তাঁকে স্ত্রী-পুত্রসহ পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। কলকাতায় এসে শাস্ত্রী মহাশয় আলাদা বাসা করেছিলেন। তখন তাঁকে নিদারুণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। সেই সময়

বিদ্যাসাগরই ছিলেন তাঁর পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। কেবল আর্থিক সাহায্য করে নয়, নানারকম উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে বিদ্যাসাগর তখন শিবনাথকে মানসিক বল ও স্থৈর্য দান করেছিলেন।'

কেশবচন্দ্র সেনকেও বিদ্যাসাগর বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন। কেশবের বিধবাবিবাহ নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, তিনি কখনও কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁকে সুপরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। কেশবও তাঁর কাছে পরামর্শ নেবার জন্য প্রায়ই আসতেন, মতবিরোধের কথা তাঁর একবারও মনে পড়ত না। তিনি জানতেন, বিদ্যাসাগর কারও ধর্মবিশ্বাস অথবা বিশ্বাসপ্রসূত মতামত সম্বন্ধে কখনও কোন বিরূপ মন্তব্য করেন না। বরং নিজের বিশ্বাস থেকে কেউ কোন কাজ করছে দেখলে তিনি নিজে আনন্দিত হতেন এবং তাঁকেও উৎসাহ দিতেন। কেশবের জীবনের বহু উত্থানপতনের মধ্যেও তাই তাঁর সঙ্গে কেশবের প্রীতির সম্পর্ক কখনও ম্লান হয়নি।

•

বিদেশী পাদ্রিদের প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা কোনদিনই বিশেষ ছিল না। এদেশী লোক যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে পাদ্রি হতেন, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক সময় তিনি প্রকাশ্যেই রূঢ় মন্তব্য করতেন। একবার তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সমবয়স্ক কয়েকজন ছেলের সঙ্গে এক বন্ধুর বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে খেতে গল্প করছিলেন। এটা তাঁর স্বভাব ছিল। অল্পবয়স্ক ছেলেদের পেলেই তিনি তাদের জড়ো করে নিয়ে একজায়গায় বসে মজাদার গল্পের আসর জমাতেন। অন্তরে যিনি শিশু ছিলেন, শিশুদের সান্নিধ্যে তাঁর কাঠিন্যের ছদ্মবেশ খুলে যেত। ছেলেদের সঙ্গে বসে গল্প করছেন, এমন সময় রাস্তা দিয়ে একজন বাঙালী পাদ্রি যাচ্ছিলেন। বারান্দায় একসঙ্গে কয়েকজন লোক বসে রয়েছে দেখে কালা-পাদ্রি ধর্মপ্রচারের প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। দলের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন একমাত্র বৃদ্ধ। তাঁকে একরকম উপেক্ষা করেই কালা-পাদ্রি হাতপা নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি

কি চান বলুন ?' পাদ্রি বললেন, 'আপনাদের Salvation (মুক্তি) চাই।' বিদ্যাসাগর করজোড়ে বলেন, 'রক্ষা করুন, এরা নিতান্তই বালক, সারাটা জীবন এদের পড়ে রয়েছে, এখনই এদের Salvationএর কথা শোনাবেন না। আমি বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাকে শোনান, কাজ হবে।' বাঙালী পাদ্রিসাহেব এই বিচিত্র বুড়োটিকে বিদ্যাসাগর বলে চিনতে পারেননি। বৃদ্ধের কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি চলে যান।[৮]

কিন্তু বিদেশী হোক, এদেশী হোক, পাদ্রি মাত্রেই যে তাঁর বিরাগভাজন ছিলেন তা নয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান-সমাজের মুখপাত্র পাদ্রি ডল সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল, এবং তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। এদেশে এসে ডল সাহেব Useful Arts School নামে কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজীর সঙ্গে এদেশী লোককে শিল্প, সঙ্গীত, ব্যায়াম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া। দীনদরিদ্রের সেবা করাও তাঁর জীবনের একটি বড় কাজ ছিল। দরিদ্রদের জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডল সাহেব ছিলেন স্বার্থত্যাগী আদর্শনিষ্ঠ কর্মী। ধর্মকে তিনি কর্মের ভিতর দিয়ে জীবনে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে বিদ্যাসাগরের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিহারীলাল লিখেছেন :[৯] "তিনি (ডল সাহেব) সদানন্দ, সরল, সাহসী ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। এই সব গুণ চিরকাল বিদ্যাসাগরের চিত্তাকর্ষক। ডল সাহেবের মুখে প্রায় বিদ্যাসাগরের গুণব্যাখ্যা শুনিতাম। এক সময় তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। স্কুলের শিক্ষক বা অন্য কোন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইলে, ডল সাহেব তৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেন। এতদ্ভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক বিষয়েই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া থাকিতে পারিতেন না। দুইজনেই দাতা ও দয়ালু। গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের ন্যায় দুই দাতা ও দয়ালু হৃদয়ে আকর্ষণ-সংঘটন হইয়াছিল।" ডল সাহেব বিদেশী পাদ্রি হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কেন

তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তা ডলের ছাত্র বিহারীলাল সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন।

বিদ্যাসাগরের ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করার জন্য এখানে আর-একটি কাহিনীর উল্লেখ করব। কাহিনীটি শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' থেকে সংগৃহীত। বিদ্যাসাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :[১০] "এক দিবস দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধর্ম্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হুলস্থূল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ের কিছুই ঠিকনা নাই; আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মিমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।' এই কথায় দাদা বলিলেন, 'ধর্ম্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।' ইহা শুনিয়া তাঁহারা আরও পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব না।' এই বলিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।"

বিদ্যাসাগরের উত্তরটি লক্ষ্য করার মতন। ধর্ম কি, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মানুষের বর্তমান অবস্থায় 'ধর্ম কি' তা জানার উপায় নেই, এবং জানার প্রয়োজনও নেই। 'প্রয়োজন নেই' কথাটির বেশ ওজন আছে। বেশী পীড়াপীড়ি করতে তিনি বলেছিলেন, পরের জন্য বেত খেতে পারব না। বেত খাওয়ার গল্পটি অতি উপভোগ্য। বিদ্যাসাগরের নিজের গল্পটি হল এই :

একদিন যমরাজ তাঁর কাছারীতে বসে আছেন, এমন সময় প্রহরীরা এক ব্যক্তিকে তাঁর সামনে ধরে আনল। যমরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি অমুকের উপাসনা না করে কি জন্য অন্যের উপাসনা করেছিলেন।" উপাসক বললেন, "হুজুর, আমার কোন দোষ নেই। অমুক ধর্মপ্রচারক আমাকে যা উপদেশ দিয়েছেন, আমি তাই করেছি। এই কথায় যমরাজ তাঁকে পাঁচ-ঘা বেতের আদেশ দিয়ে এক গাছতলায় বেঁধে রাখতে বললেন। তারপর আরও তিন-চারজন উপাসককে তাঁর সামনে আনা হল, এবং তিনি

তাঁদের একই দণ্ডের আদেশ দিলেন। এর পর একজন ধর্মপ্রচারককে আনা হল। তিনি বললেন, "আমি বিদ্যাসাগরের উপদেশ শুনে অমুকের উপাসনা করেছি, এবং আমার অনুগামীদেরও তাই করতে বলেছি।" যমরাজ তাঁকে তাঁর হিসেবে পাঁচ-ঘা, এবং তাঁর উপাসকদের প্রত্যেকের দরুন পাঁচ-পাঁচ-ঘা করে বেত্রাঘাতের হুকুম দিলেন। আরও দু-তিনজন প্রচারকের ডাক পড়ল, তাঁদেরও তাই দণ্ড হল। অবশেষে ডাক পড়ল পালের গুরু বিদ্যাসাগরের। নিজের পাঁচ-ঘা, প্রত্যেক প্রচারকের দরুন পাঁচ-ঘা করে, এবং প্রত্যেক উপাসকের দরুন পাঁচ-ঘা করে বেতের হুকুম হল বিদ্যাসাগরের উপর। কয়েকশত বেতের ঘা খাওয়ার পর শরীরে আর তিলার্ধ স্থান রইল না। অবশিষ্ট বেত প্রতিদিন গিয়ে খেয়ে আসতে হত। এই কথা বলার পর বিদ্যাসাগর বললেন, "পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানুষ ধর্ম নিয়ে এইভাবে তর্ক করে আসছে, অনন্তকাল তাই করবে, কোনদিন তার মীমাংসা হবে না। অতএব ধর্মবিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি অনর্থক বেত খেতে পারব না।"

গল্পটি বিদ্যাসাগর পরিহাস করে বললেও, তার অন্তর্নিহিত মর্ম তিনি নিজেই উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে এইটাই মনে হয় তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল। এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, কেন তিনি জীবনে ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি, এবং কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি কেন তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল না। সকল ধর্মকেই তিনি সমান চক্ষে দেখতেন, এবং তাকে প্রচারের বস্তু মনে না করে, অন্তরের উপলব্ধির বিষয় বলে মনে করতেন। ধর্মসংস্কারের, এবং নতুন কোন ধর্মপ্রচারের চেষ্টা কেন তিনি করেননি, এবং কেন তিনি এবিষয়ে সারাজীবন নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন, তা তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায়।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্পর্কের কথা ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। তার কারণ, এই সমাজের লাভক্ষতি-টানাটানি ও কলহ-সংশয়ের সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে কতখানি মানবিক, উদার ও স্বার্থগন্ধশূন্য হতে পারে,

বিদ্যাসাগর-মাইকেলের সম্পর্ক তার একটি দৃষ্টান্ত। এই সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যাসাগরচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মাইকেল ও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নতুন পর্বের সূচনা হয় 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হবার পর। তিলোত্তমা প্রকাশিত হয় ১৮৬০, মে মাসে। ১ জুলাই মাইকেল রাজনারায়ণকে লেখেন: "The Tilottama is out. I have ordered Messrs I. C. Bose & Co, to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially when that criticism is from an honest friend who wishes me well."[১১] প্রথমে বিদ্যাসাগর মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। মনে হয় তিনি তার বিরূপ সমালোচনাও করেছিলেন, কারণ রাজনারায়ণকে পরবর্তী একখানি পত্রে মধুসূদন লেখেন: "The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me... some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—'হাঁ উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।' But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song!"[১২] তিলোত্তমার সমালোচনার জন্য মাইকেল যে বিদ্যাসাগরের উপর খুব প্রীত ছিলেন না, তা এ চিঠির ভাষা থেকেই বোঝা যায়। দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূচনা হয় তিক্ততার ভিতর দিয়ে। এই সম্পর্কই পরে মানবিকতার মাধুর্যে 'ঐতিহাসিক' হয়ে উঠে। উদ্‌যোগপর্বের তিক্ততা আবার শেষ পর্বেও দেখা দেয়, কিন্তু তার জন্য ভিতরের মাধুর্যটুকু ম্লান হয়ে যায়নি। বাইরের তিক্ততার চেয়ে উভয়ের অন্তরের মাধুর্য ও মহত্ত্ব অনেক বড় সত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

কয়েকদিন পরেই মাইকেল রাজনারায়ণকে লেখেন : "You will be pleased to hear that the Pandits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see 'Great merit' in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular."[১৩] এর পরেই ১৮৬০, ৩ আগস্ট তারিখে তিনি রাজনারায়ণকে লেখেন : "I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of Widow Remarriage."[১৪] মাত্র তিনমাসের মধ্যেই মধুসূদনের অভিমান দূর হয়ে গেল, এবং তিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণের জন্য তাঁর বেতনের অর্ধেক টাকা দান করার প্রস্তাব করলেন। অল্পদিনের মধ্যে মাইকেলের কাব্যপ্রতিভার স্বকীয়তাও বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত মনের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। জীবনের সমস্ত দুর্যোগের ভিতর দিয়ে এই প্রতিভাকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর সুমহান মানবীয় মূর্তিতে মাইকেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

মাইকেলের প্রতিভা বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ ও বেহিসেবী মানবিকতার আশ্রয়ে পুষ্টিলাভের সুযোগ পেল। দুবছরের মধ্যেই মাইকেল ও বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠল। ১৮৬২, ১০ জানুয়ারি, 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হবার পর মাইকেল রাজনারায়ণকে লেখেন :* "I have dedicated the work to our great friend the Vidyasagar. He is a *splendid fellow !* I assure you, I look upon him in many respects as *the first man among us.* You will be pleased to hear that his views regarding the new poetry are very flattering...His admiration is honest, for he is *above flattering any man.*"[১৫] কেবল বন্ধু বলে নয়, মাইকেল বিদ্যাসাগরকে 'first man among us' বলেও আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। এই সময় আর-একখানি চিঠিতে রাজনারায়ণকে তিনি লেখেন :

* চিঠিপত্রের *italics* লেখক-কৃত।

"I am making arrangements to go to England to study for the Bar...He (Vidyasagar) has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject." তাঁর ইয়োরোপযাত্রা পরিকল্পনার সবচেয়ে সক্রিয় সমর্থক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

১৮৬২, ৯ জুন মধুসূদন ইয়োরোপ যাত্রা করেন, জুলাই মাসের শেষে ইংলণ্ডে পৌঁছন। তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ ১৮৬৩, মে মাসে ইংলণ্ডে চলে যান। যাবার আগে তিনি তাঁর সম্পত্তি ইত্যাদির বিনিময়ে যে টাকাপয়সা পাওয়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, কিছুদিন পরে তা আর পাননি। তার ফলে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ তিনি বিদেশে ভীষণ আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। এই সঙ্কটের সময় স্বভাবতঃই তাঁর বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে। ১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি তিনি লণ্ডন থেকে প্যারিস চলে যান, এবং পরে ভার্সাইয়ে অবস্থান করেন। ভার্সাই থেকে ১৮৬৪, ২ জুন তিনি বিদ্যাসাগরকে প্রথম চিঠিতে লেখেন :[১৬]

> If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of our distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends......
>
> You are the only friend who can rescue me from the painful position in which I have been brought, and in this you must go to work with that *grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart.*

৯ জুন তারিখে দ্বিতীয় পত্রে মাইকেল লেখেন :[১৭]

> Just two years ago I left Calcutta. How little did I think that I should be subjected to so much degradation and suffering...

> This is my second letter to you. I hope to write you twice more on the subject this month and then I shall stop with the pleasing hope of being in the hands of a *real friend and righteous man.*

এই পত্রেই তিনি লেখেন, "People in Calcutta will, no doubt, tell you *lies* about us ; do not believe them and have faith in me, I pray you." বোঝা যায়, মাইকেলের তথাকথিত বন্ধুবান্ধবরা তাঁর বিদেশ-জীবন সম্বন্ধে কলকাতায় পরম উৎসাহে নানারকম কুৎসা রটাতে আরম্ভ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত বাঙালীর, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের, জীবনের অন্যতম ব্রত হল পরচর্চা ও পরনিন্দা। বিশেষ করে বাঙালী সাহিত্যজীবীদের মধ্যে এই কুৎসা-প্রবৃত্তি সবচেয়ে বেশী প্রবল। মাইকেল-বিদ্যাসাগরযুগের একশ বছর পরেও এই প্রবৃত্তির প্রাবল্য কমেনি। বেদনার সঙ্গে একথা মাইকেল বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন, "কুৎসাবাদীদের অপপ্রচারে বিশ্বাস করবেন না, আমার উপর আস্থা রাখবেন।" বিদ্যাসাগর সেই আস্থাই তাঁর উপর রেখেছিলেন, কারণ বিদ্যাসাগর বাঙালী হলেও তাঁর চরিত্রের এই 'অবাঙালীত্বের' জন্য তিনি অক্ষয় মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।
১৮৬৪, ১৮ জুন মাইকেল তৃতীয় চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লেখেন :[১৮]

> I hope I shall not have to cry out with Rama in my poem of Meghanada, 'বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে'।
>
> My heart is full of bitterness, rage and despair ; so you must excuse mistakes and the dull tone of this letter...
>
> P. S. I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are *not only Vidyasagara, but Karunasagara* (করুণা-সাগর) *also.*

মধুসূদনের পত্র পাওয়া মাত্রই বিদ্যাসাগর মাইকেলকে ১৫০০৲ টাকা পাঠিয়ে দেন। টাকা পেয়ে মাইকেল ১৮৬৪, ২ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে বিদ্যাসাগরকে লেখেন: "গত রবিবার ২৮ জুলাই আমি আমার পড়ার ঘরে বসে আছি, এমন সময় আমার স্ত্রী কাঁদ-কাঁদ হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চায়, কিন্তু আমার কাছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক আছে। ওদেশের লোকেরা আমাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন কেন?' আমি তার উত্তরে বললাম—'The mail will be in today and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed has the *genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman,* and the *heart of a Bengali mother.* I was right; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend? You have saved me.'

কিন্তু, মাইকেলকে বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেননি, বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। ১৮৬৪, ১৮ ডিসেম্বর মাইকেল বিদ্যাসাগরকে লেখেন:[১৯]

> 'Your kind letter, with a draft for 2490 Francs,...I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little; as one would say in our mother-tongue, আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া, আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটী বন্ধু নাই যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরবদলে প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ

শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এ কথাটি যেন সর্ব্বদা স্মরণপথে থাকে!

এই চিঠির শেষে তিনি লেখেন, "Alas! this sending of money by dribs and drabs does more harm than good. এ কথাটিও যেন স্মরণপথে থাকে।" টাকার প্রয়োজন ও অভাব তাঁর যে সহজে মিটছিল না, তা মাইকেলের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্য তাঁর কাছে বারিবিন্দুর মতন মনে হচ্ছিল। তবু বিদ্যাসাগর সহজে হাল ছাড়েননি। তিনি জানতেন, হাল ছেড়ে দিলে মাইকেলের জীবনতরী নোঙরহীন হয়ে বানচাল হয়ে যাবে। কারণ এই চিঠিতেই আবার মাইকেল শিশুর মতন সরলচিত্তে লিখেছিলেন :"...it affords me the greatest pleasure to have it in my power to show how ready I am to place my fortune, my prospects in life, the interests of those most dear to me in this world, nay, my life itself, in your hands..." যে হাতের উপর মাইকেল তাঁর জীবনতরীর হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য হাত বাংলাদেশে আর যে ছিল না, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন।

বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে জাস্টিস অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৩০০০৲, এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কাছ থেকে ৫০০০৲ টাকা কর্জ করে মধুসূদনকে পাঠান। পরে ১৮৬৫, ১৮ মে তাঁকে এজেন্ট নিযুক্ত করে মধুসূদন যখন ওকালতনামা পাঠান, তখন বিদ্যাসাগর মধুসূদনের বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে অনুকূলচন্দ্রের কাছ থেকে আরও ১২০০০৲ টাকা নিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। ১৮৬৬, ১৭ নবেম্বর মধুসূদন গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭, ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে এসে মধুসূদন ব্যারিস্টারি করতে আরম্ভ করেন। স্পেন্সেস হোটেলে তিনি তিনখানি ঘর ভাড়া করে থাকতেন। পানভোজনে ও বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়নে প্রচুর অর্থ তিনি ব্যয় করতেন। স্ত্রীপুত্রদেরও টাকা পাঠাতে হত মাসে মাসে ইয়োরোপে। দেনার কথা তাঁর মনে থাকলেও, দেনা

পরিশোধ করার আর কোন উপায় রইল না। উপরন্তু কলকাতায় ফিরে ক্রমে তিনি আরও বেশী দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। খরচের মাত্রাও তাঁর বাড়তে লাগল। বিদ্যাসাগরকে আবার তিনি চিঠি লিখে তাঁর অভাবের কথা জানালেন :[২০]

> If you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially as old Sirish is assuming war-like attitudes....But as you are, *one of Nature's noblemen.* tho'a Beng, you will (unless I am greatly mistaken) feel for me, and sympathise for me...You are the *greatest Bengali* that ever lived and people speak of you with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a bad fellow! Behold and help again one who loves you and has no friend who seems to care for him except yourself.

এই সময় উত্তমর্ণদের তাগিদে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলচন্দ্র উভয়েই তাঁদের টাকা পরিশোধ করে দেবার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। মধুসূদনের বেহিসেবী বিলাসিতায় ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় বিদ্যাসাগর খানিকটা বিরক্তও হয়েছিলেন। মধুসূদনকে একখানি পত্রে তিনি লেখেন :

> অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোনক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ঘটিয়াছে।

> যৎকালে আমি অনুকূলবাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিই। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলবাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।
>
> এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনা সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয়-বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন।...এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না।

পত্রখানির ছত্রে ছত্রে, প্রতিটি শব্দের মধ্যে পর্যন্ত, বিদ্যাসাগরের ধৈর্য ও আত্মসংযম সুপরিস্ফুট। মধুসূদনকে আঘাত দিয়ে একটি কথাও তিনি বলেননি। এমনকি, তাঁর প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও রূঢ়তার কোন চিহ্ন নেই। তবু এই পত্র পেয়ে মধুসূদন দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে দুঃখিত হওয়াই স্বাভাবিক। চিঠি পেয়ে তিনি বিদ্যাসাগরকে লেখেন:[২১] "Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you...I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday."

এই সময় ছোট আদালতের জজ ফেগ্যান সাহেব কাজ ছেড়ে যাবেন শুনে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের জন্য ছোটলাটকে অনুরোধ করতে পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি বলেন, "আমি জানি আপনি ব্রাহ্মণ হলেও, দুর্বাসার বংশধর নন। অতএব আমি যত অন্যায়ই করি না কেন, আপনার হৃদয়ের স্পর্শলাভে আমি বঞ্চিত হব না—"I can't believe that any folly of mine could turn away that noble heart from... "জজসাহেব বিদায় নেননি, মধুসূদনের চাকরিও হয়নি। পীড়িত বিদ্যাসাগরকে দেখতে যাওয়া মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ তিনিও তখন অসুস্থ ছিলেন। এই সময় তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি কবিতা লিখে পাঠান :

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি, তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি স্থরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন! এহেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা বারম্বার।

পূর্বের পত্রের শেষে মধুসূদন লিখেছিলেন : "There is n't another man in Calcutta (Black or White) from whom I would ask such

a favour. If you have ceased to be my friend, the sooner I hear of the calamity the better."

১৮৬৮, ১৮ মার্চ বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে একখানি চিঠিতে লেখেন: "I am really very sorry to know that you are again in pecuniary difficulty."[২২] চিঠিতে এই লাইনটি অবশ্য কাটা ছিল। মনের বিরক্তি প্রকাশ করেও তিনি, বোধ হয়, মধুসূদন ব্যথিত হবেন মনে করে ঐ লাইনটি লিখেও কেটে দিয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূলচন্দ্রের সমস্ত ঋণ, বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে, শেষ পর্যন্ত মধুসূদন পরিশোধ করেছিলেন, এবং বিদ্যাসাগরও দায়মুক্ত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরকে একখানি চিঠিতে মধুসূদন একবার লিখেছিলেন, "even my worst enemies dare not say that I am a bad fellow!" —"আমার পরম শত্রুরাও আমাকে কোনদিন মন্দ লোক বলতে পারবে না।" কথাটা ঠিক। মধুসূদন অমিতব্যয়ী ছিলেন, বিলাসী ছিলেন, হয়ত কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল ও বেহিসেবীও ছিলেন। একবার একখানি চিঠিতে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন: "There are men whom Nature has given the hearts of bill-collecting Sircars. They would keep their wives and daughters naked (if they could) to save money. Such men might tell you anything against me; but I tell you, I have not been so successful as 'জনরব' is pleased to give out"—"এমন লোক অনেক আছে, প্রকৃতি যাদের বিল-সরকারের অন্তঃকরণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের, সম্ভব হলে, উলঙ্গও রাখতে পারে, টাকা বাঁচাবার জন্য। এই ধরনের লোকজন আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু রটনা করতে পারে। কিন্তু জেনে রাখুন, আমার সম্বন্ধে যা জনরব শোনেন আমি তা নই।"

জনরবই মধুসূদনকে সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছিল। আসল কথা হল, একটা স্কন্ধকাটা অর্ধসত্য সমাজে প্রেতনৃত্য করে বেড়িয়েছিল, এবং মধুসূদনকে লোকচক্ষে হেয় ও অপমানিত করতে চেয়েছিল। মধুসূদনের কোমল কবিচিত্ত, এই স্কন্ধকাটা জনরবের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। দশচক্রে

ভগবানও যদি ভূত হন, তা হলে মানুষ মধুসূদন যে 'বামুণ্ডুলে' ও 'চরিত্রহীন' বলে কথিত হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জনরবকেও হয়ত তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর দু'চারজন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুও যখন সেই জনরবের আবর্তে পড়ে তাঁকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করলেন, তখনই তাঁর জীবনের করুণতম ট্র্যাজিডির শেষপর্ব শুরু হল। সেই ট্র্যাজিডি সবচেয়ে মর্মান্তিক হল যখন বিদ্যাসাগরও তাঁকে কিছুটা ভুল বুঝলেন। তবু মধুসূদনের প্রতি বিদ্যাসাগরের মানবিক মমতাবোধ যে কত গভীর ছিল, তা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মধুসূদনের কাছে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ না করার ইচ্ছা থেকে বোঝা যায়।

মধুসূদনের কবিমানসচক্ষে বিদ্যাসাগরচরিত্রের অন্তর্নিহিত গুণগুলি আকাশের তারার মতন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাঁর সমস্ত চিঠিপত্রের মধ্যে একটি-একটি করে তিনি সেই সব-গুণের কথা বলেছেন। সেগুলি এই :

'Splendid fellow'
'the first man among us'
'above flattering any man'
'grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart'
'real friend and righteous man'
'not only Vidyasagara, but Karunasagara also'
'the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart a Bengalee mother'
'one of Nature's noble men'
'greatest Bengali'

'চমৎকার মানুষ'—'আমাদের মধ্যে প্রধান মানুষ'—'কারও স্তাবক নন'—'যাঁর

বিরাট প্রতিভা ও পৌরুষের নিত্যসঙ্গী হল অফুরন্ত কর্মশক্তি'—'সত্যকার বন্ধু ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ'—'কেবল বিদ্যাসাগর নন, করুণাসাগরও'—'সেকালের ঋষিদের মতন যিনি সত্যদর্শী, একালের ইংরেজদের মতন যাঁর কর্মশক্তি, এবং বাংলাদেশের মায়েদের মতন যাঁর অন্তঃকরণ'—'প্রকৃতির একজন মহৎ সন্তান' —'সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী'। বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্বন্ধে এ ছাড়া আর একটিও নতুন কথা বলবার নেই।

নবযুগের বাংলার আদিকবি মধুসূদন 'আমাদের মধ্যে 'প্রধান মানুষ' ও 'সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী' পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ অনুরাগীরাও তাঁর চরিত্র-বিশ্লেষণে আংশিক ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশের দু'জন শ্রেষ্ঠ কবিই কেবল বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন, এটা আপাত-দৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু চিন্তা করলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কবির দৃষ্টিপথেই মানুষের সত্তার 'সমগ্রতা' ফুলের মতন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। একজন সাধারণ মানুষের চরিত্র বুঝতে হলেই কিছুটা কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়। কেবল বাস্তববুদ্ধির দাঁড়িপাল্লায় একটা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে মাপা যায় না। যাঁরা অনন্যসাধারণ, তাঁদের চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে হলে কল্পনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে হয়। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে তাই বিদ্যাসাগরচরিত্রের দিগন্ত পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙালীকবির সামনে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও অদ্বিতীয় মানুষ যেন সম্পূর্ণ নিরাভরণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

১৪ | সীমা ও স্ববিরোধ

সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে দেবার পর, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল "দীন দরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্ম-নির্ভরপর উন্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।"

১৮৯১, ২৯ জুলাই পূর্ণ ৭০ বছর বয়সে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। যথারীতি শোকসভাও হয় অনেক, এবং বিদ্যাসাগরের একটি প্রস্তরমূর্তিও সংস্কৃত কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা এইভাবে মেগালিথিক যুগের মতন পাথুরে স্মৃতির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর বছরে-বছরে কোনরকমে দু'একটি স্মৃতিসভা করে আমরা বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের দায়টুকু সেরে নিই। নাচগান-হল্লার, অথবা কোন উন্মত্ততার ও উৎকেন্দ্রিকতার সুযোগ নেই বলে,

বিদ্যাসাগরের মতন আরও অনেক আদর্শপুরুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উৎসটি প্রায় শুকিয়ে গেছে। কারণ কি? বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ও জাতীয় সংস্কৃতির ভাবালুতার বৈশিষ্ট্যই তার কারণ। বাংলার লোকসংস্কৃতির আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছিলেন :[১]

> বাংলার গ্রাম্য ছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতা-রাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। একথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে,—কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ—তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রাম-সীতার দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণ-কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভু-ভক্তি, প্রজা-বাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদ্বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।

যে-কারণে রামায়ণকথা ও রামের আদর্শ বাংলাদেশে মাথা তুলতে পারেনি, কতকটা সেই কারণেই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আদর্শ বাঙালী-চিত্তে তেমন উৎসাহের সঞ্চার করেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, এটা 'আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য'।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়ে বিশেষ আলোচনা করিনি, কারণ আমরা তাঁর 'সামাজিক জীবনচরিত' রচনা করার চেষ্টা করেছি। পরিবার তাঁর সামাজিক জীবনের পরিবেশের উপর যতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, ঠিক ততটুকুই আমরা তা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। 'ব্যক্তি' হিসেবেও বিদ্যাসাগরকে আমরা বিচার করেছি 'social personality' বা সামাজিক ব্যক্তিরূপে। এই সামাজিক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কি?

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন: "The social personality may be regarded as something which is learned and which is acquired over and above the *core personality*."[২] ব্যক্তিত্ব সাধারণত তিনরকমের উপাদান দিয়ে গঠিত হয়: (১) ব্যক্তির জৈবিক বিশেষত্ব; (২) ব্যক্তিগত-সামাজিক অভিজ্ঞতা; এবং (৩) সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা। জৈবিক বিশেষত্ব হল জন্মগত দোষগুণ, যার উপর মানুষের কোন হাত নেই। খুব মারাত্মক না হলে, জন্মগত সামান্য দোষত্রুটি জীবনসংগ্রামে জয় করা যায়। মানুষের জীবনে এমন অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটতে পারে, যার আঘাতে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণা সারা জীবনের মতন বদলে যেতে পারে। জীবনের এই ধরনের আকস্মিক অভিজ্ঞতাকে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং (Kimball Young) 'personal-social experience' বলেছেন।[৩] যেমন বিদ্যাসাগর যদি হঠাৎ একদিন কোন বালবিধবার বৈধব্যযন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্‌যোগী হতেন, তা হলে তাঁর সমাজসংস্কারক-ব্যক্তিত্বের বিকাশে 'personal-social' অভিজ্ঞতাই বেশী কার্যকর হয়েছিল বলে প্রমাণিত হত। কিন্তু বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের সামাজিক চরিত্র এই ধরনের কোন হঠাৎ-অভিজ্ঞতার আঘাতে

গড়ে ওঠেনি। ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা ও নবযুগের শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁর সামাজিক সত্তা গড়ে উঠেছিল। জৈবিক ও ব্যক্তিগত-সামাজিক অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই মৌল-ব্যক্তিত্ব (core personality) গঠিত হয়। তার সঙ্গে শিক্ষাসংস্কৃতিগত অভিজ্ঞতার সংযোজন ও মিশ্রণ হলে সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়। অতএব কোন সামাজিক ব্যক্তির জীবন-বিশ্লেষণে আমরা তার মৌলসত্তার অনেক উপাদান বাদ দিতে পারি। কেবল দু'একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশ্লেষণে সাহায্য করতে পারে। এইদিক দিয়ে আমরা দেখেছি, বিদ্যাসাগর ছিলেন 'aggressive, masterful, masculine type of personality.' তাঁর মৌলসত্তার এই প্রধান গুণটি তাঁর সমাজসত্তাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। একথা মনে রাখা দরকার।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবর্তনকালে 'ব্যক্তির' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সকলশ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন, মার্ক্সবাদীরাও অস্বীকার করেননি। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন নানাকারণে ঘটতে পারে। কখন বাস্তব উপাদানের আঘাতে (অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল), কখনও বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদর্শসংঘাতে সমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়। বাস্তব উপাদান, না আদর্শগত উপাদান, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনটি বেশী শক্তিশালী তা সবসময় সঠিক বলা যায় না। বিজ্ঞানের খাতিরে অবশ্য বাস্তব উপাদানকেই বেশী শক্তিশালী বলতে হয়, এবং বাস্তব-ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক ও টেকনোলজিকাল পরিবর্তনের ফলে সামাজিক আদর্শেরও ধীরে-ধীরে পরিবর্তন হতে দেখা যায়। কিন্তু আদর্শসংঘাতের ফলে উপরের সঙ্কীর্ণ সামাজিক স্তরে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তা যতই প্রবল হোক না কেন, তার বাস্তব ভিত্তি রচিত না হলে কোন স্থায়ী পরিণতির দিকে তা এগিয়ে যায় না। বাংলার নবজাগরণ প্রধানত বাইরের আদর্শসংঘাতে শুরু হয়েছিল বলে, এবং বৈদেশিক শাসনাধীনে তার বাস্তব ভিত্তি অনেকটাই রচিত হয়নি বলে, তার মধ্যে এত উত্থান-পতন, এত দ্বন্দ্ব ও এত স্ববিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনও এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের আঘাত থেকে মুক্তি পায়নি। এমনকি, বিদ্যাসাগরের

নিজের সংস্কারচিন্তার মধ্যেও সর্বক্ষেত্রে সঙ্গতি ছিল বলে মনে হয় না। সেকথা পরে আলোচনা করব।

সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা তখনই হয় যখন সামাজিক ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ডগুলি (social norms) বদলাতে থাকে। এই মানদণ্ডের পরিবর্তন হলে সামাজিক সুনীতিগুলিরও (social values) পরিবর্তন হতে থাকে। Thomas ও Znaniecki সামাজিক সুনীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এই-ভাবে: "(A value is) any datum for an empirical content accessible to the members of some social group and a meaning with regard to which it is or may be an object of activity."[৪] সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে, পূর্বের (অতীতের) সামাজিক নীতিবোধের উপর ব্যক্তির নতুন মনোভাবের প্রতিক্রিয়া, এবং পূর্বের ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর নতুন সামাজিক নীতিবোধের প্রতিক্রিয়া,—এই দুইয়ের সম্মিলিত ফলাফলেই সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়:[৫]

> There can be for Social Science no change in social reality which is not the common effect of pre-existing social values and individual attitudes acting upon them, no change of individual consciousness which is not the common effect of pre-existing individual attitudes and social values acting upon them.

সামাজিক পরিবর্তনের ধারা ও স্বরূপ বিচার করতে হলে, নতুন সামাজিক সুনীতি ও নতুন ব্যক্তিগত মনোভাবের সঙ্গে পুরাতন নীতি ও মনোভাবের সংঘর্ষের ফলে কি ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, এবং তার গতি কোন দিকে, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। সামাজিক পরিবর্তনধারার বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা নানারকমের তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী সরোকিন (P. Sorokin) এই সব

তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে "a definite, steady, and eternal trend in historical and social changes" বলে কিছু নেই। তবে পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়, এবং তার একটা "cyclical-rhythmical" আবর্তনছন্দ আছে, যা বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা প্রয়োজন।[৬] পরিবর্তনের এই 'cyclical' নীতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে যথেষ্ট। এ নীতি মেনে নিলে, সমাজের অগ্রগতি (আঁকাবাঁকা হলেও) প্রায় অস্বীকারই করতে হয়। কিন্তু এই তর্কসাপেক্ষ বিষয় আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়।

সামাজিক পরিবর্তনও ঐতিহাসিক সত্য, একথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, একযুগের সামাজিক সত্য অন্যযুগে সত্য নাও হতে পারে, এবং বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সেই সামাজিক সত্যকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হতে পারে। কেবল যুক্তি (reason) ও বিচার-বুদ্ধির জোরে কোন সত্যকে 'চিরন্তন বাস্তব সত্য' বলে আঁকড়ে ধরে থাকা যায় না। কারণ মানুষের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিও স্বয়ম্ভূ নয়, তাও "product of history"। প্লেখানভ বলেছেন যে, "once that product has appeared, it *must* not—and in its nature it *cannot*—be obedient to the reality handed down as a heritage by previous history ; of neccessity it strives to transform that reality after its own likeness and image, *to make it reasonable*"[৭] সমাজের বাস্তব সত্যকে, ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের সময়, রূপান্তরিত করার কাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। সমাজ-জীবনে এই ব্যক্তি-ভূমিকার (role of individual in history) কথা, বাস্তববাদী হয়েও, প্লেখানভ অস্বীকার করেননি। ব্যক্তির ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "As human reason can triumph over blind necessity only by becoming aware of the latter's inner loss, only by beating it with its own strength, the development of knowledge, the development of human consciousness, is the greatest and most noble task of the thinking personality।"[৮] চিন্তাশীল ব্যক্তির এই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম কর্তব্যই বিদ্যাসাগর সারাজীবন পালন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের নবযুগের নবজাগ্রত যুক্তিবুদ্ধি সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যগত সত্যকে 'একমাত্র সত্য' বা 'চিরন্তন সত্য' বলে মেনে নেয়নি। তিনি তাকে নতুন সত্যে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, এবং তার জন্য নিজের বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তবচেতনা যতদুর সম্ভব বৃদ্ধি করেছেন। সেইজন্যই তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেবল নির্জন ও নিরবয়ব চিন্তার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সামাজিক সত্যের কালোপযোগী রূপান্তর সম্ভব হবে না। চিন্তা (thought) ও ক্রিয়ার (action) মধ্যে সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলতে হবে। বিদ্যাসাগর তাই গ্যেটের (Goethe) ফাউস্টের মতন বিশ্বাস করতেন যে, "In the Beginning was the Deed"। তাঁর সমগ্র কর্মজীবন দিয়ে বিদ্যাসাগর যদি কোন জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, তা হলে তাকে "Philosophy of Action" ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কার্ল মার্ক্স বলেছেন : "Social life is essentially practical. All mysteries which mislead theory to mysticism find their rational solution in human practice and in the comprehension of this pratice।"[৯] সামাজিক জীবন যে "essentially practical," একথা উনিশ শতকে বাংলাদেশে একজন মাত্র সর্বান্তঃকরণে উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কেবল সামাজিক সংস্কার-কর্মের ক্ষেত্রে নয়, ধর্মবিষয়ে ও ব্যক্তিগত জীবনে এই 'প্র্যাকৃটিসের' নীতি বিদ্যাসাগর আজীবন আচরণ করেছিলেন। চিন্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে তাঁর জীবনে কোনদিন কোন ব্যবধান রচিত হয়নি।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক ব্যক্তিত্ব সবল ও সমুন্নত হলেও, তার মধ্যে অন্তর্বিরোধ যে একেবারে ছিল না, তা নয়। তার প্রসারও সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠামুখী পুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব তাঁকে ধীরস্থিরভাবে কোন সামাজিক 'ইনস্টিটিউশন' গড়ে তুলতে দেয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা তিনি করেছেন, ভিতও স্থাপন করেছেন, কিন্তু ধৈর্য ধরে তাকে ছোট থেকে একটি বড় প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে পারেননি। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, এই দুটি প্রতিষ্ঠানই কেবল আগাগোড়া তাঁর হাতে-গড়া বড় প্রতিষ্ঠান। এই দুটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী

কার্য-পরিচালনার সুযোগ ছিল বলে সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ হয়নি। বিরোধ যে একেবারেই হয়নি তা নয়, কিন্তু অন্য কারণে হয়েছে, এবং তিনি তার সমাধানও করেছেন। তাঁর ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে যখন যেখানে বিরোধ হয়েছে, তখন সেখানে তিনি কোন আপস-রফা করে এক-পাও চলেননি। তাঁর প্রতিষ্ঠাপ্রবণ ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সভাসমিতির প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও সান্নিধ্য থেকেও সারাজীবন তাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। যেখানে তাঁর আদর্শের সঙ্গে কোন সংঘাত হয়নি, সেখানেও দেখা যায় তিনি সেই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেননি। তার একটি বড় দৃষ্টান্ত হল 'ভারত-সভা' (Indian Association)। ভারত-সভাই আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে গড়ে উঠুক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তা সর্বান্তঃকরণে কামনা করতেন। ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা স্থাপিত হয়। সভার উদ্‌যোগী কর্মীরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে যখন তাঁকে প্রথম সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন একটা অজুহাত দিয়ে তিনি তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন :[১০]

> যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম; কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্‌যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে··· দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, 'ষা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?'
>
> আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে,

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবেন; যাকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। ...প্রতি বোধ হয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর ওদের নামও সহিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্দর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি ও আনন্দমোহন অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তা রক্ষা করেননি, অথচ ভারত-সভার মতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেছিলেন, এবং তার উদ্দেশ্যও সমর্থন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সভাপতি হতে চাননি কেন? কারণ তিনি জানতেন, একটা দল তৈরী করে কাজকর্ম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তার প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হল, তাঁর চরিত্রের প্রাধান্যপ্রবণতা; এবং দ্বিতীয় কারণ হল, তাঁর তীব্র ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দবোধ। শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে বিদ্যাসাগরের কাছে স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি কোন স্থান ছিল না। যাঁরা 'aggressive-masculine type' ব্যক্তি, তাঁদের মতামত সাধারণত চরমই (extreme) হয়ে থাকে। সর্বব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের মতামত 'চরম' ছিল। কারও প্রতি একবার বিরূপ হলে, সহজে তাঁর বিরূপতা দূর হত না। এরকম আত্মপ্রাধান্যমুখী চরিত্র, জিদ্ ও একগুঁয়েমি, এবং ভালমন্দ সম্বন্ধে চরম ধারণা নিয়ে কোন যৌথ-প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউশন, বা সভাসমিতি পরিচালনা করা যায় না। সেখানে সকলের মেজাজের সুরের সঙ্গে নিজের মেজাজের উচ্চসুরটাকেও কিছুটা নামিয়ে মেলাতে-মেশাতে হয়। তা করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

কেবল রাজনৈতিক সভা নয়, সমসাময়িক বিদ্বৎসভাগুলির সঙ্গেও 'বিদ্যাসাগর তেমন ঘনিষ্ঠভাবে কোনদিন যুক্ত ছিলেন না। তাঁর সময়ে নানারকমের বিদ্বৎসভার বিকাশ হয়েছিল। তার মধ্যে 'বেথুন সোসাইটি' ও

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে তাঁর কিছুটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ সভার সঙ্গে তা ছিল না। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন, কিছুদিন তার সম্পাদকও ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সভার কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ কতখানি প্রবল ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'তত্ত্ববোধিনীর' অক্ষয়কুমার দত্ত ও 'বিদ্যোৎসাহিনীর' কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তার জন্যই এই সভাগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সভাসমিতির প্রগতিশীল আদর্শ তাঁকে সবসময় আকর্ষণ করতে পারত না। তা যদি পারত, তা হলে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'সুহৃদ সমিতি' এবং ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য আরও অনেক সমাজসংস্কারব্রতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। কিন্তু তাঁর আপসহীন প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অধিকাংশ সভাসমিতির সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর এই সমষ্টিজীবনের অন্তরায় যদি এত দুর্লঙ্ঘ্য না হত, তা হলে বিদ্যাসাগর তাঁর সমসাময়িক সমাজ-জীবনে হয়ত আরও বেশী প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। সমাজের অগ্রগতির পথের অনেক ছোটবড় অন্তরায় তাঁর মতন শক্তিমান তেজস্বী ব্যক্তির সংঘনেতৃত্বের প্রভাবে অপসারিত হয়ে যেত। বিজ্ঞানীরা বলেন, সমাজের 'প্রাথমিক গোষ্ঠী' (Primary Association) হল পরিবার (Family), এবং 'মাধ্যমিক গোষ্ঠী' (Secondary Association) হল বাইরের সভাসমিতি-প্রতিষ্ঠান। সমাজ-জীবনে পরিবারের প্রভাব প্রাথমিক ও স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজ যত বৃহৎ ও জটিল রূপ ধারণ করতে থাকে, তত বাইরের মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির প্রভাব তার উপর বাড়তে থাকে। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ পারিবারিক প্রভাবের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে ক্রমেই বাইরের গোষ্ঠী-সভা-সমিতির প্রভাবাধীন হয়ে উঠছিল। সমাজের গণতান্ত্রিক রূপের বিকাশ হচ্ছিল যেমন ধীরে-ধীরে, তেমনি এইসব সংঘ-গোষ্ঠীর প্রভাবও বাড়ছিল ব্যক্তির জীবনে। উনিশ শতকের ষাট-সত্তর থেকে সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘ-গোষ্ঠীর দ্রুত বিকাশের মধ্যে বাংলার সমাজে এই গণতান্ত্রিক রূপায়ণের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক

প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। অতএব তিনি যদি তখন বাইরের প্রগতিশীল গোষ্ঠী-সংঘগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, এবং সেগুলির পরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতেন, তা হলে সমাজের অগ্রগতির পথ হয়ত আরও অনেকটা নিষ্কণ্টক করতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা তিনি পারেননি, তাঁর আকাশস্পর্শী স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য।

•

বিদ্যাসাগরের সংস্কারচিন্তার মধ্যেও যে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গতি ছিল, তা মনে হয় না। তাঁর চিন্তাধারা গভীরভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে গোড়া থেকেই তার মধ্যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধের বীজ ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। বিদ্যাসাগর আমাদের হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গতভাবে প্রবর্তন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু কেবল একটি রাষ্ট্রীয় আইনের সামাজিক সার্থকতা যে কতখানি তা তিনি তলিয়ে ভেবে দেখেননি। শুধু তাই নয়, সামাজিক ইনস্টিটিউশনরূপে হিন্দুবিবাহের যে-সমস্ত গলদ ছিল, এবং যেগুলি সংশোধন ও অপসারণ না করলে বিধবাবিবাহ-আইনও কার্যকর করা সম্ভব ছিল না, বিদ্যাসাগর সেগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ চিন্তা করেননি। চিন্তা যে তিনি আদৌ করেননি তা অবশ্য নয়। চিন্তা তাঁকে নিশ্চয় করতে হয়েছিল। একটি চিন্তার আনুষঙ্গিক চিন্তা অন্যটি। বিধবাবিবাহ বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে হিন্দুবিবাহের প্রচলিত সংস্কারটির কথাও চিন্তা করতে হয়। যিনি বিধবাবিবাহের সংস্কারক ও প্রবর্তক, তিনি যে হিন্দুবিবাহের সংস্কারটির কথা চিন্তা করেননি, তা মনে হয় না। তার কারণ হিন্দুসংস্কারে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রথা, এবং আইনের দিক থেকেও বহুবিবাহে কোন বাধা নেই। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলে বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হলেও তার কার্যকারিতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দাম্পত্যবন্ধনের মধ্যে যেখানে পারস্পরিক দায়িত্ববোধের কোন বাধ্যতা নেই, এবং যতরকমের বাধ্যতা সব একপক্ষের (বিবাহিতা স্ত্রীর), সেখানে বিধবাবিবাহ 'বে-আইনী' না হলেই বা তার পরিণাম কি? পুরুষের দিক থেকে বিধবাবিবাহ যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন বহুবিবাহের অঙ্গ হয়, তা হলে নারীর বৈধব্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া আর

না-পাওয়া সমান হয়ে ওঠে না কি? তা যে শেষ পর্যন্ত সমানই হয়ে ওঠে, তা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই কার্যক্ষেত্রে তাঁর বিধবাবিবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন।

বিধবাবিবাহের এই শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, আইন-প্রবর্তনের সময় বিদ্যাসাগর কেন হিন্দুবিবাহের মূল সংস্কারটিকে সংশোধন করতে চাননি? তিনি যে তা চাননি, একথা আরও বেশী করে মনে হয় এইজন্য যে তাঁর সমসাময়িক ইয়ংবেঙ্গল দলই এ-বিষয়ে চিন্তা করে হিন্দু-বিবাহের প্রথানুগত্যকে রাষ্ট্রীয় আইনের বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বিবাহ-রেজিস্ট্রেশনের আইন পাশ করিয়ে একবিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বন্ধন দৃঢ় করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল দল ছাড়াও 'সুহৃদ সমিতি'র সভ্যেরা এবং অন্যান্য আরও অনেকে এই রেজিস্ট্রেশনের সমর্থক ছিলেন। বিধবাবিবাহ আইনটিকেই তাঁরা এইভাবে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তা জানতেন, কিন্তু জেনেশুনেও তিনি তার পক্ষে কোন মত প্রকাশ করেননি। অবশ্য তার বিপক্ষেও তিনি কোন কথা বলেননি, এবং স্বতন্ত্রভাবে তিনি বহুবিবাহ-নিবর্তক আইন পাশ করবার জন্য দীর্ঘকাল প্রবল আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দুবিবাহের সমস্যাটিকে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে বুঝেছিলেন, তা তাঁর এই বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের একাগ্রতা থেকে বোঝা যায়। তা ছাড়া শেষকালে তিনি চুক্তিপত্রে পাত্রপাত্রীর স্বাক্ষর করিয়ে বিধবাবিবাহ দেবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেছিলেন। কিন্তু তবু, এত করা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত কেন তিনি হিন্দুবিবাহের রেজিস্ট্রেশন-আইনের পক্ষে কোন মতামত ব্যক্ত করেননি, সে-প্রশ্ন থেকেই যায়।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। যিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নিবর্তনের জন্য প্রবল আন্দোলন করেছেন, বিধবাবিবাহের কার্যকারিতার জন্য নিজেই চুক্তিপত্র রচনা করেছেন, এবং দেশাচারের প্রতি যিনি কখনও যুক্তিহীন দুর্বলতা প্রকাশ করেননি, তিনি কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে, অথবা কেবল প্রথানুগত্যের জন্য হিন্দুবিবাহের রেজিস্ট্রেশন সমর্থন করেননি, একথা ভাবা যায় না। সামাজিক সুসংস্কারের ভিত্তির উপর দেশের সংস্কৃতিসৌধ গড়ে ওঠে। সমাজসংস্কারকরা যদি সুসংস্কার ও

কুসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য বিচার না করেন, যাবতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে অন্ধের মতন বিদ্রোহ করেন, তা হলে বিদ্রোহী সংস্কারকর্ম 'বিজাতীয়' বেশ ধারণ করে। হিন্দুবিবাহের সংস্কার একটি সুপ্রাচীন সংস্কার, এবং যথাযথরূপে আচরিত হলে তার মধ্যে বহুবিবাহের কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু সুসংস্কার ব্যবহারিক জীবনের কদাচরণের ফলে অনেক সময় বিকৃত হয়ে কুসংস্কারে পরিণত হয়। হিন্দুবিবাহও তাই হয়েছিল। তার জন্য বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন আইনের দ্বারা তাকে একেবারে উৎখাত করতে হবেই এমন কোন কথা নেই। বহুবিবাহ বন্ধ হলে, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে, তার ভিতরের সঞ্চিত ক্লেদ ও কদর্যতা দূর হয়ে যাবে, এরকম কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিদ্যাসাগর মূল বিবাহসংস্কারটিতে হয়ত অনর্থক হস্তক্ষেপ করতে চাননি। কিন্তু তা না চাইলেও, স্বতন্ত্র আইনরূপে তিনি হিন্দুবিবাহের রেজিস্ট্রেশনের দাবী প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। এই অক্ষমতা ও অনিচ্ছার মধ্যেই তাঁর সংস্কারচিন্তার সীমারেখা কিছুটা ফুটে উঠেছিল। তিনি অন্তত হিন্দুবিধবার পুন-র্বিবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন দাবী করতে পারতেন। তাও তিনি করেননি। সামান্য হলেও, তাঁর সংস্কারচিন্তার মধ্যে এই যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধটুকু ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

শেষজীবনে সহবাস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যেও এই স্ববিরোধের আভাস পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে তিনি সরকারকে লিখেছিলেন :

> ...I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives, without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses...such a law would not only serve the interests of humanity...but would, so far from interfer-

ing with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras.

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১, বিদ্যাসাগর এই পত্রখানি সরকারকে লিখেছিলেন। তার কয়েক মাস পরে ২৯ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। বোঝা যায় না, কেন এই পত্রের মধ্যে তিনি 'religious usage' কথাটির উপর এত জোর দিয়েছিলেন। বোঝা যায় না, শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে বলে কেন তিনি এত চিন্তিত হয়েছিলেন। যিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক এবং বহু-বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি কেন 'বাল্যবিবাহপ্রথা' আইনের দ্বারা নির্মূল করতে চাইলেন না? এ কি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বলতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব? অথবা কার্যক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারকর্মের অন্তর্বিরোধের পরোক্ষ স্বীকৃতি? তাঁর চরিতকার বিহারীলাল লিখেছেন:[১১]

> বিধবাবিবাহ-বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মতি আইনের বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, সমগ্র হিন্দুসমাজ সুখী হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে আবার সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে মত দিতে দেখিয়া অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

এ ধারণা একেবারে ভুল। তিনি ভুল করেছেন, একথা কোনদিন তিনি ভাবেননি। তা যদি ভাবতেন, তা হলে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তিনি তা স্বীকার করতেন। মনে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য এবং নতুন সামাজিক কর্তব্য, এই দুয়ের সমন্বয়-স্থাপনের দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, সব-সময় তিনি সমতা বজায় রাখতে পারেননি। মধ্যে মধ্যে ঐতিহ্যের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকেছেন, আবার কখন নতুন সামাজিক সত্যকে বেশী জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বোঝা যায়, এ-বিষয়ে তাঁর একটা মানসিক দ্বন্দ্ব

বরাবরই ছিল, এবং সে-দ্বন্দ্বের অবসান তিনি একেবারে ঘটাতে পারেননি। তাঁর মতন বলিষ্ঠ ও মুক্তচিত্ত পুরুষের জীবনে এই দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান সর্বতোভাবে কাম্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বশ্রেণীগত স্ববিরোধের জালে খানিকটা জড়িয়ে পড়ে সেই প্রত্যাশাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে পারেননি।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও কিছু কিছু স্ববিরোধের আভাস পাওয়া যায়। মিস্ কার্পেণ্টার যখন স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, তখন বিদ্যাসাগর তা সমর্থন করেননি। তিনি তদানীন্তন ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে-কে একখানি চিঠিতে লেখেন যে এদেশে, কার্পেণ্টারের প্রস্তাব অনুযায়ী, শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর মতে, সমাজের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরকম কোন শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। বোঝা যায় না, এ-যুক্তি বিদ্যাসাগরের পক্ষে দেওয়া কি করে সম্ভব হয়েছিল! সমাজের অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব, তিনি নিজে যখন আন্দোলন করেছিলেন তখন, বিধবাবিবাহের পক্ষে, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে, এমনকি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষেও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে-যুক্তির জোরে তখন আন্দোলন করেছিলেন, সে-যুক্তির কথা স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভুলে গেলেন কেন? চিঠির মধ্যে তিনি লিখেছিলেন যে যতই তিনি এ-সম্বন্ধে ভাবছেন, ততই তাঁর ধারণা দৃঢ়তর হচ্ছে। ধারণাটা কি? সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং দেশবাসীর মনোভাব অনুকূল না হলে, সমাজ-কল্যাণের জন্য কোন কাজ করলেও তা সফল হবে না।

১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ বিদ্যাসাগর এই চিঠিখানি গ্রে-সাহেবকে লিখেছিলেন। অর্থাৎ প্রায় দশ বছর তাঁর সমাজসংস্কারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর তিনি, খানিকটা হতাশ হয়েই বোঝা যায়, দেশবাসীর 'মনোভাবের' কাছে কিঞ্চিৎ নতিস্বীকার করেছিলেন। তা না হলে স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি এই ধরনের অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন করতেন না। সময়োপযোগিতা যদি কোন সংস্কারকর্মের মানদণ্ড হয়, যদি কোন সামাজিক কল্যাণকর্ম তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পর, এবং বালিকা-

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর, স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রসঙ্গে ১৮৬৭ সালে সেকথা উত্থাপন করা কোনমতেই সঙ্গত বোধ হয় না। 'সোমপ্রকাশ', 'বামাবোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকা এই কালোপযোগিতার যুক্তি খণ্ডন করে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁরাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের মতন নির্ভীক প্রগতিপন্থী সমাজনায়ককে এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে দেখে। আশ্চর্য হবারই কথা। যিনি তথাকথিত বাস্তব সত্যকে ঐতিহ্য, অবস্থা ও মনোভাবের দিক থেকে একমাত্র সত্য বলে মেনে না নিয়ে, তাকে নতুন সামাজিক সত্যে রূপান্তরিত করার জন্য সারাজীবন সর্বস্বপণ করে সংগ্রাম করেছেন, তাঁর মুখে সত্যই এ-যুক্তি মানায় না। সমাজসংগ্রামে তিনি নিজেই দেখেছেন, তাঁর পূর্বের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে যে, 'human reason can triumph over blind necessity' (Plekhanov), কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 'সহবাস-সম্মতি আইন' ও 'স্ত্রীনর্মাল বিদ্যালয়ের' ব্যাপারে সেই 'blind necessity'র কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার কিছুটা অসঙ্গতি ও স্ববিরোধই প্রকাশ পেয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ শিক্ষাচিন্তাও জনসমাজের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারেনি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অল্প খরচে কিভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, সে-সম্বন্ধে যখন ভারত-সরকার বাংলার ছোটলাট গ্র্যাণ্ট সাহেবের মতামত জানতে চান, তখন ছোটলাট গ্রাম্য-বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করেন। এ-বিষয়ে পরামর্শ দেবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তখন বিদ্যাসাগর। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে এ-বিষয়ে যা লেখেন তার মর্ম এই :[১২]

> সরকার ভেবেছেন যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসে ৫।৭৲ টাকা খরচ করে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। আমার মনে হয় না তাতে কোন কাজ হবে। যাঁরা সামান্য লেখাপড়া জানেন, তাঁরা নিজেদের গ্রামের বিদ্যালয়েও এত অল্প বেতনে কাজ করবেন না।··· শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা এতই খারাপ যে তাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য

তারা কোনরকম ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম। একটু বড় হলেই ছেলেরা যখন উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে, তখন তারা ছেলেদের আর পাঠশালায় রাখতে চায় না। তাদের ধারণা—এবং ধারণাটা বোধ হয় ঠিকই—যে ছেলেরা লেখাপড়া শিখলেই তাদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হবে না। তা ছাড়া দেশের সম্রান্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরাই যখন শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে (জ্ঞানার্জন) তেমন সচেতন নয়, তখন শ্রমিকশ্রেণীর সে-বোধ থাকতে পারে না। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষাবিষয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। সরকারের যদি সত্যই তাদের শিক্ষা দেবার সাধু উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে যেন তাঁরা অবৈতনিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত বলছি, এরকম ব্যবস্থা বেসরকারী-ভাবে যেটুকু করা হয়েছে, তাতে কোন ফল হয়নি।

ইংলণ্ডে ও আমাদের দেশেও অনেকের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কিছু করা দরকার।…কিন্তু এবিষয়ে অনুসন্ধান করলে একথা সত্য বলে মনে হয় না।

আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা করলে, সরকারের উদ্দেশ্য অনেক বেশী সফল হবে। শিক্ষাবিস্তারের এইটাই যে একমাত্র পন্থা, তা অবশ্য আমি বলছি না। তবু আমার ধারণা, একশ' ছেলেকে সামান্য লেখাপড়া শেখানোর চেয়ে, একজনকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলতে পারলে সরকার শিক্ষাবিস্তারে অনেক বেশী সাহায্য করবেন। দেশের সমস্ত লোককে শিক্ষিত করে তোলা খুবই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোন দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বর্তমানে তা করা সম্ভব কি না, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমনকি ইংলণ্ডের সরকার অত্যন্ত সচেতন হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, সেখানকার জনসাধারণের শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় এমন কিছু উন্নত নয়।

বিদ্যাসাগরের এই যুক্তির মধ্যে ফাঁক নেই কোথাও। ১৮৫৯ সালে তিনি শ্রমিকশ্রেণী ও দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে

সত্য। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তিনি মধ্যবিত্তশ্রেণীকেও ধরেছেন, এবং তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য যুক্তি দেখিয়ে কিছুমাত্র অন্যায় করেননি। আজও যখন আমাদের দেশে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখন একশ' বছর আগে বিদেশী সরকারের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর বা সাধারণের শিক্ষার সদিচ্ছা প্রকাশ করা যে 'বুজরুকি' ছাড়া কিছু নয়, বিদ্যাসাগর তা বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্যই তিনি অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তাঁর বিবৃতির মধ্যে একটিও যুক্তিহীন কথা নেই। সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে তিনি যা বলেছেন তাও ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু যুক্তি ও সত্যের উপরেও, অন্তত তাঁর মতন উদারচিত্ত পুরুষের কাছ থেকে, দেশের জনসাধারণ বড়ছোট নির্বিশেষে গভীর মানবতাবোধ দাবী করতে পারে। সেই মানবতা-বোধ এই উক্তির মধ্যে একটু বেসুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বললে নিশ্চয় রূঢ় শোনাবে। তা হয়ত হয়নি, কিন্তু কিছুটা উদাসীনতা যে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর, অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে, নিজের চিন্তাকে যে স্বশ্রেণীর সীমানার বাইরে বেশী দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেননি, তা তাঁর এই শিক্ষানীতিব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায়।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচরিত্রের ও কর্মাদর্শের যে-সব সীমা-স্ববিরোধের কথা আলোচনা করেছি, তার কোনটির জন্যই তাঁর মহত্ত্ব ম্লান হয়নি। এই সব সীমারেখার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের জীবন ও চরিত্র আমাদের দেশে সত্যই এক বিরাট বিস্ময় বলে মনে হয়। যে-যুগে বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন, সে-যুগের সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁর মতন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশই সম্ভব ছিল। ব্যক্তিচরিত্রের 'socialisation' তখনকার সমাজে সম্ভব ছিল না। সমাজ তখন 'বনজঙ্গলের' মতন ছিল। তার মধ্যে, অর্থাৎ সেই অনুন্নত ও অর্ধোন্নত জনসমাজে শক্তিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরা 'বনস্পতির' মতন মাথা তুলে দাঁড়াতেন। তখন ধনতন্ত্রের উষাকাল, সুস্থ স্বাধীন প্রতিযোগিতার

স্বর্ণযুগ, প্রতিভার বিকাশের পথ দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ও অসাম্য অনেক। মানুষ তখন সবেমাত্র আত্মসচেতন হচ্ছে, এবং সেই নতুন আত্মচেতনার ভিতর দিয়ে তার পুরাতন সমাজচেতনা রূপান্তরলাভ করছে। আমাদের বাংলাদেশে, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণেই, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতন বনস্পতিতুল্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছিল। আজ গণতন্ত্রের মধ্যাহ্নকালে, সচেতন জনসমাজে, 'ব্যক্তি-বনস্পতির' বিকাশ আর বোধ হয় সম্ভব নয়, কারণ—"In our democracies we are in the process of moving from a high degree of individualism toward development of democratic personality."[১৩]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে 'একক' ছিলেন এবং "বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্যে আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন।" কিন্তু সেই শব্দহীন সুদূর নির্জনতার মধ্যে তিনি একদিনের জন্যও সমাজচিন্তার পরিবর্তে আত্মচিন্তা করেননি। নিদারুণ অসুস্থতার মধ্যে তিনি শিক্ষা ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে সকলকে তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ ও মতামত দিয়েছেন। কখন তাতে আলস্য ও ঔদাস্য প্রকাশ করেননি। তাঁর এই 'philosophy of action'-এর জন্য তিনি আগামীকালের গণতান্ত্রিক সমাজে 'রূপান্তরিত ব্যক্তিদের' মধ্যেও সর্বজন-নমস্য ব্যক্তিরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তখন অবশ্য সমাজের 'ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন' আর থাকবে না, এবং তাঁর মতন 'বনস্পতিও' আর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে না। কিন্তু তখনও তাঁর মহৎ কীর্তির কথা, তাঁর দম্ভ ও দুঃসাহসের কথা, তাঁর দৌর্বল্য ও পৌরুষের কথা, আমরা ভুলতে পারব না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার

অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব, এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

বিদ্যাসাগরের কোন 'সমাধিমন্দির' নেই। না থাকাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। কারণ ভবিষ্যতের মানবসমাজে কোন মানুষের কীর্তিকলাপ সমাধিমন্দিরের নিশ্চল স্থাপত্যে মূর্ত হয়ে উঠবে না। সমাজবিজ্ঞানী মামফোর্ড বলেছেন: "All living beliefs, all living desires and ideas, must be perpetually renewed, from generation to generation: re-thought, re-considered, re-willed, re-built, if they are to endure."[১৪] একযুগের মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, যুগে যুগে উত্তরপুরুষেরা নতুন করে বিচার-বিবেচনা করবে, চিন্তা করবে এবং আবার নতুন করে গড়ে তুলবে। তা যদি না করে তা হলে তাদের পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হবে। তা যদি হয়, তা হলে মৃত মানুষের মহৎ কীর্তিরক্ষার কথাও ভবিষ্যতের মানুষ নতুন করে চিন্তা করবে। অন্তত বড় বড় ইটপাথরের সমাধিমন্দির নির্মাণ করে কোন কীর্তিকেই অমরত্ব দান করা তখন সম্ভব হবে না। কীর্তিমান ও শক্তিমান মানুষের সংখ্যা তখন অনেক বাড়বে, এবং সকলের সব কীর্তিকে সমাধিমন্দিরে মজুত করে রাখতে হলে জীবন্ত জনসমাজ মেগালিথিক যুগের সমাধিবহুল গোরস্থানে পরিণত হবে। কিন্তু মৃতের গোরস্থান থেকে জীবন্তের বাসস্থানের দিকে তখন অনেকদূর এগিয়ে যাবে সমাজ, এবং পুরাতন সব সমাধিমন্দিরের দিকে চেয়ে মানুষ ভাববে—"They are all the hollow echoes of an expiring breath, rattling ironically in the busy streets of our cities, heaps of stone, which either curb and confine the work of the living... or are completely irrelevant to our beliefs and demands." (Lewis Mumford)[১৫]

সেইজন্ত মামফোর্ড বলেছেন, 'মডার্ন মন্নুমেণ্ট' স্ববিরোধী কথা। 'মন্নুমেণ্ট' হলে তা 'মডার্ন' হতে পারে না, এবং যা 'মডার্ন' তা কখনও 'মন্নুমেণ্ট' হতে পারে না। বিদ্যাসাগর ছিলেন আমাদের দেশের কয়েকজন 'আধুনিক মানুষের' মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সমাধিমন্দিরের পরিবর্তে যদি আধুনিক অগ্রগামী মানুষের চিন্তাধারায় তিনি জীবিত থাকেন, তা হলে তাঁর জীবন ও কীর্তি দুই-ই অনেক বেশী সার্থক হবে।

নির্দেশিকা

(বাংলা সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যা)

১ | পদক্ষেপ

১ । ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা

২ । হরিশচন্দ্র কবিরত্ন : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (কলিকাতা ১৯০১)

৩ । শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত (৩য় সং, ১৩২১), ৬৪

৪ । ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস

৫ । General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidencey, for 1846-47, ৩৮

২ | প্রথম সংঘাত

এই অধ্যায়ের তথ্য সংস্কৃত কলেজের M. S. Records থেকে সংগৃহীত। 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

৩ | বিদ্যা ও বাণিজ্য

১ । Alfred Von Martin : Sociology of the Renaissance. (London, 1945), ৩৯-৪০

২ । Op. Cit, ৪১

৩ । Loke Nath Ghose : The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc. (Calcutta 1881.), Part II, ৭৮-৮০

৪ । শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (২য় সং, ১৯০৯), ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৫ । শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত (কলিকাতা, ১৩০০ সন), ১৪-১৭

৬ । ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস

৭ । শম্ভুচন্দ্র : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, ৮২-৮৩

৮ । কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (১৩২০), ১৩৬-৩৭

৯ । ঐ, ১৩৫

১০ । A. Griffin : Sketches of Calcutta etc, (Glasgow 1843), ৯৮-১০৯

১১ । বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর (৩য় সং, ১৩১৭), ৪৩৪

১২ । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলিকাতা, ১৩৩৮), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'ভূমিকা'।

১৩ । হরিশচন্দ্র : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত, ৩৬-৩৮

৪ | শিক্ষাচিন্তা

এই অধ্যায়ের তথ্য সংস্কৃত কলেজের M. S. Records থেকে সংগৃহীত।

ব্যালান্টাইন, বিদ্যাসাগর ও শিক্ষাসংসদের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিষয়ে মতের আদান-প্রদান ও অন্যান্য বিবরণ Proceedings of the Council of Education, 1853 (M. S. Records) থেকে সংগৃহীত।

৫ | বাংলা শিক্ষা

১। Charles Grant-এর Observations etc. পার্লিয়ামেণ্টারি পেপারে মুদ্রিত। Parliamentary Papers Relating to the Affairs of India, General, Appendix I, Public 1832, ৫৯-৬২

২। C. E. Trevelyan : On the Education of the People of India (London 1838), ৮৩-৮৬

৩। Wilson : History of British India, Vol. III (1848), ৩০৫-৭

৪। সংবাদ প্রভাকর, ৭ ভাদ্র ১২৫৭

৫। Bengal Spectator, Vol. II, No. 25, August 1, 1843

৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২য় ভাগ, ১৫৩ সংখ্যা, বৈশাখ ১৭৭৮ শক।

৭। Trevelyan : Op. Cit, ২০-২৪

৮। Sixth Report of the Select Committee of the House of Commons (1853), App. F, ৪১৫

৯। A. Howell : Education in British India, prior to 1854 (1872), ৪৪-৫৩

H. A. Stark : Vernacular Education in Bengal, from 1813 to 1912 (1916) ৬৬-৭০

১০। William Adam : Reports on the State of Education in Bengal (1835, 1838): University of Calcutta Edition.

১১। J. Thomason : Despatches ; Selections from the Records of the Government of the North-Western Provinces, 2 Vols. (1856-8)—প্রথম খণ্ডে টোমাসনের গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

১২। Selections from the Records of the Bengal Government, No. XXII. Correspondence relating to Vernacular Education (1855)

১৩। সংবাদ প্রভাকর : সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'জাতীয় ভাষা শিক্ষা', ৩১ ভাদ্র ১২৬১

১৪। Consultations of the Education Dept. (পরে Edn. Con. বলে উল্লিখিত), 19 October 1854, No. 118

১৫। Report of the Indian Education Commission, 1882, ১২২-২৩

১৬। Public Consultations, 26 January 1855, Nos. 153, 154
Public Proceedings, 12 December 1856

১৭। Parliamentary Papers, First Report of the Select Committee of the House of Commons. (1853), App. No. 7, ৫১০-১১

১৮। বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ, ভূমিকা

১৯। Sixth Report of the Select Committee of the House of Commons (1853), ৫৩

২০। Edn. Con., 10 May 1855, No. 71.

২১। Edn. Con., 10 May 1855, No. 73

২২। Edn. Con., 10 May 1855, No. 74

২৩। Bengal Spectator, Vol II, No. 24, July 24, 1843

২৪। Edn. Con., 12 July 1855, No. 89

২৫। Edn. Con., 12 July 1855, Nos. 88, 90

২৬। Edn. Con., 27 Nov. 1856, No. 92
Edn. Con., 16 Oct. 1856, Nos. 65, 66

২৭। General Report on Public Instruction, 1857-58, App. 'A', ১৭৮-৮০

৬। স্ত্রীশিক্ষা

১। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী (১৭৯৫ শক), ২০৫-৬

২। The Calcutta Journal, 11 March 1822, ১০৫-৬

৩। Priscilla Chapman : Hindoo Female Education (London 1839), ৭৫-৮০

৪। The Reformer, 19 December 1831

৫। বিদ্যাদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শক

৬। J. A. Richey : Selections from Educational Records, Part II (1840-59), ৪৮-৪৯

৭। Report on Public Instruction etc, 1849-50, ৪-৫

৮। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার (জীবনবৃত্ত), ৬৩-৬৪
৯। Richey, Op. Cit., ৫২-৫৬
১০। Richey, Ibid.
১১। সম্বাদ ভাস্কর, ২৬ মে ১৮৪৯
১২। সম্বাদ ভাস্কর, ১২ জুন ১৮৪৯
১৩। সর্বশুভকরী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৭২ শক
১৪। সুলভ পত্রিকা, ২য় খণ্ড, ১-২ সংখ্যা, ১২৬১ সাল
*১৭। The Calcutta Gazette, 20 September 1856
১৮। Edn. Con., 5 August 1858, No. 16
১৯। Edn. Con., 5 August, 1858 No. 15
২০। Edn. Con., 5 August, 1858 No. 14
২১। Edn. Con., 2 December 1858, No. 4
২২। Edn. Con., 2 December, 1858, No. 6
২৩। Edn. Con., 20 January, 1859, No. 9
২৪। Edn. Con., December 1862, Nos. A, 59-62
২৫। P. C. Mozoomdar : The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen (Calcutta 1931), ৯০-৯২
২৬। সোমপ্রকাশ, ২৯ মে ১৮৬৫
২৭। সোমপ্রকাশ, ১৩ এপ্রিল ১৮৬৮
২৮। বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৪
২৯। বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১২৭৪
৩০। বামাবোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১২৭৪
৩১। সোমপ্রকাশ, ৩ পৌষ ১২৭৩
৩২। Journal of Asiatic Society of Bengal (N. S.), Vol XXIII, 1927. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত Article No. 31 দ্রষ্টব্য।
৩৩। সোমপ্রকাশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯
৩৪। Edn. Con., March 1868, No. A 9
৩৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১২৭৬
৩৬। বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭
৩৭। Edn. Con., April 1872, Nos. A 54-58

* ১৫ ও ১৬ নম্বর ভুলক্রমে দেওয়া হয়নি

৩৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮০২ শক

৩৯। সোমপ্রকাশ, পৌষ ১২৮৭

৭ | সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ (১)

১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, ২১৮-১৯

২। Karl Mannheim : Essays on The Sociology of Culture (London 1956.) ৮৪-৮৫

৩। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত (কলিকাতা, সংবৎ ১৯৩২), ১৫৪-৫৬
Bengal Spectator, Vol I, No. 5, July 1842

৪। Calcutta Journal, Vol. 3, May 18, 1819

৫। Rev. L. B. Day : Recollections of Alexandar Duff (London 1879) Ch. 3

৬। Widow Remarriage Papers, M. S. Records, National Archives of India (W. R. Papers, Records N. A. I. বলে পরে উল্লিখিত)—Letter, Dated Fort William, the 24th July 1837

৭। W. R. Papers, Records N. A. I.—Letter, Dated Allahabad, the 11th August 1837

৮। W. R. Papers, Records N. A. I.—Letter, Dated Fort St. George, the 31st July 1837

৯। Bengal Spectator, Vol. I, No. 1, April 1842

১০। শম্ভুচন্দ্র : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, 'বিধবাবিবাহ' অধ্যায়

১১। ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত, ২৪ অধ্যায়, ২০৩

১২। সংবাদ প্রভাকর, ১০ চৈত্র ১২৫৮

১৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭৬ শক

১৪। শম্ভুচন্দ্র : ১২০

১৫। সমাচার সুধাবর্ষণ, ১২ নভেম্বর ১৮৫৫, ৪৪৮ সংখ্যা

১৬। সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

১৭। A. V. Martin. Op. Cit, ২৭

১৮। W. R. Papers, Records, N. A. I.

১৯। W. R. Papers, Records, N. A. I.

২০। W. R. Papers, Records, N. A. I.

২১। W. R, Papers, Records, N. A. I.

২২। The Hindu Intelligencer, 16 Feb. 1857

সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ (২)

১। বিহারীলাল : ২৮৪-৮৭
২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৭৮ শক, ১৬ সংখ্যা
৩। হিতবাদী, ২০ ভাদ্র ১২৯৮
৪। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (কলিকাতা ১৩১৫) ১০০-১
৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত (কলিকাতা ১৩২৫), ১১৪-১৫
৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ২৭৮
৭। Major-General H. T. Tucker's Letter to *The Times*, London, 19 July 1857
৮। S. A. Khan : An Essay on the Causes of the Indian Revolt, ১৫-১৮
৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৭৯ শক
১০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ, সম্বৎ ১৯১৪
১১। চণ্ডীচরণ, ২৮৭
১২। চণ্ডীচরণ, ৩০১। একথা বিদ্যাসাগর চণ্ডীচরণকে বলেছিলেন।

৯ | সমাজসংস্কার : বহুবিবাহ

১। J. L Gillin and J. P. Gillin : Cultural Sociology (N. Y. 1954), ১৫৩-৫৪
২। মন্মথনাথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র (কলিকাতা ১৩৩৩), ১০০-৮
৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকপত্র (১৩৪৬), ১৩৬-৩৭
৪। বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৬৪ শক
৫। বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৭৬৪ শক
৬। Legislative Department Proceedings (পরে Lg. Dept. Proc. বলে উল্লিখিত), August 16, 1866, No. 10
৭। Lg. Dept. Proc., December 1863. No. 7
৮। Lg. Dept. Proc., August 1866, No. 11
৯। Lg. Dept. Proc., August 1866, Nos. 10-14
১০। Lg. Dept. Proc., August 1866, No. 14
১১। Lg. Dept. Proc., March 1867, No. 25
১২। Lg. Dept. Proc., March 1867, No. 26
১৩। History of Bengal (Dacca University), Vol I, Appendix I
১৪। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা (২য় সং, ১৮৭১)

১৫। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ১২৭৮ সনের আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় 'বহুবিবাহ' সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

১৬। সোমপ্রকাশ, ৩০ শ্রাবণ ১২৭৮

১৭। সোমপ্রকাশ, ১৩ ভাদ্র ১২৭৮

১৮। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, (কলিকাতা ১৮৮১)

১৯। অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২৮৩ সাল, ২০ সংখ্যা

২০। ভারতসংস্কারক, ১২৮৩ সাল, ১২ সংখ্যা

২১। ঢাকাপ্রকাশ, ১২৮১ সাল, ৪ সংখ্যা

১০ | সমাজ-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত : ১৮৫০-৯০

১। Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. X, ৪০৭-১৫। Alfred Meusel লিখিত 'Middle Class' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

২। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩)

৩। ভবানীচরণ : নববাবুবিলাস (১৮২৫)

৪। বঙ্গদূত, ১৩ জুন ১৮২৯

৫। Martin : Op. Cit., ১৫

৬। W. W. Hunter : Dalhousie (Rulers of India Series), ১৯১-৯২

৭। Edwin Arnold : Marquis of Dalhousie's Administration (London 1865), Vol. II, ২৮৪

J. and R. Strachey : The Finances and Public Works of India (1882), ৮৬

৮। G. M. Trevelyan : British History in the 19th Century and After, Ch. 22, ৩৪০-৪৩

৯। Mozoomdar : Op. Cit., ৭৫-৭৬

১০। Max Beer : A History of British Socialism (London 1953), Part II, Chs. 11, 12

১১। শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী, ১২ পরিচ্ছেদ, ৩০১

১২। সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড, ৪০ সংখ্যা, ৩১ শ্রাবণ ১২৭৮

১৩। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৭ এপ্রিল ১৮৬৯

১৪। B. C. Pal : Memories of My Life and Times (Calcutta 1932), Ch. 15, ২৯৮

১৫। Sivanath Sastri: History of the Brahmo Samaj, Vol. I (Calcutta 1919). ২৭২
১৬। B. C. Pal: Op. Cit, ৩০৯
১৭। বিপিনচন্দ্র পাল: নবযুগের বাংলা (কলিকাতা ১৩৬২), ১১৯
১৮। শাস্ত্রী: আত্মচরিত (১৩২৫), ২১৭-১৮
১৯। B. C. Pal: Memories, ৪২৪-২৫
২০। B. C. Pal, Op. Cit, ৪২৫
২১। Report of the Education Commission 1881-82; Report of the D. P. I. of Bengal, 1871-72
২২। Syed Mahmood: A History of English Education in India, 1781-1893 (Aligarh 1894) Ch, XIX, ১৭৬
২৩। Mahmood: Op. Cit, ১০০
২৪। Mahmood: Op. Cit, ১০২
২৫। ভূদেব মুখোপাধ্যায়: সামাজিক প্রবন্ধ, ২৮৫
২৬। Karl Mannheim; Man and Society (London 1954), ১০২
২৭। রাজনারায়ণ বসু: আত্মচরিত (১৩১৫), ৮৩
২৮। B. C. Pal: Memories—, ৪৩৮-৩৯

১৯। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিদ্যাসাগরচরিত, ৮-৯
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জীবনস্মৃতি, ৩
৩। Eustace Carey; Memoir of William Carey, ৪৫৩-৫৪
৪। সবুজপত্র, ফাল্গুন ১৩২১
৫। রামগতি ন্যায়রত্ন: বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (৩য় সং), ১৮৩
৬। বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, ১৪৪
৭। বিহারীলাল, ঐ, ১৪৬
৮। রামগতি ন্যায়রত্ন, ঐ, ২২০-২১
৯। রামগতি, ঐ
১০। বর্ণমালা, ১ম ভাগ। ১৮৫৩
বর্ণমালা ২য় ভাগ। ১৮৫৪
*বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'বিদ্যাসাগর সংগ্রহে' বই দুখানি আছে।

১১। শিশুসেবধি বর্ণমালা, ১ম ভাগ। ১৮৫৪, নবম সংস্করণ।
শিশুসেবধি বর্ণমালা, ৩য় ভাগ। ১৮৫০, পঞ্চম সংস্করণ। এই বই দুখানিও 'বিদ্যাসাগর সংগ্রহে' আছে।

১২। রামগতি ন্যায়রত্ন : ঐ, ১৯৫-৯৬

১৩। রামগতি : ঐ

১৪। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়, ৫৩-৫৫

১৫। Jacob Burckhardt: The Civilization of the Renaissance in Italy (Phaidon Press, 1955), ৯৪

১৬। বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ উৎসব। রবীন্দ্রনাথের বাণী। মেদিনীপুর ১৩৪৬

১৭। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১), অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত 'পিতা-পুত্র', ৪৯২-৯৩

১৮। সর্বশুভকরী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৭৭২ শক

১৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু—১৯৯-২০০

২০। বঙ্গভাষার লেখক, ৪৯০-৯১

২১। The Hindoo Patriot, 9 January 1865

২২। শাস্ত্রী : রামতনু—২৮৭

২৩। রামগোপাল সান্যাল : কৃষ্ণদাস পালের জীবনী (কলিকাতা ১৮৯০), ৪র্থ অঃ

১২ কর্মবৈচিত্র্য

১। Statement of Facts Relating to the Metropolitan Institution (ইংরেজী পুস্তিকা)। সুবলচন্দ্র মিত্রের ইংরেজী 'বিদ্যাসাগর-জীবনী' ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। শম্ভুচন্দ্র, ১৪৪

৩। বিহারীলাল, ৩৬৪

৪। কাহিনীগুলি বিহারীলাল, চণ্ডীচরণ, সুবলচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর-জীবনী' থেকে সংকলিত।

৫। বিহারীলাল কর্তৃক উদ্ধৃত, ৪৫৪-৫৫

৬। Proceedings of the Board of Revenue, 1863-1865

১৩ চরিত্র

১। সাধারণী, ১২ জুলাই ১৮৭৪

২। বিহারীলাল, ৩২৪

৩। বিহারীলাল, ৩৩৪-৩৫
৪। বিহারীলাল, ৪৪২-৪৩
৫। বৈকুণ্ঠ সান্যাল : লীলামৃত (২য় সং), ১০
৬। অনুশীলন (মাসিকপত্র) : মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০১
৭। S. Sastri : Men I have Seen (1919), ১-৩২
৮। Sastri : Op. Cit.

১৪ | সীমা ও স্ববিরোধ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোকসাহিত্য, ৮৬-৮৭
২। Gillin and Gillin : Cultural Sociology, ৬৭৪
৩। Kimball Young : Personality and Problems of Adjustment (N. Y. 1940), Ch I
৪। W. I. Thomas and Florian Znaniecki : The Polish Peasant in Europe and America (N. Y. 1927), ২১
৫। Thomas and Znaniecki : Op. Cit., ১৮৩১
Muzafer Sherif : The Psychology of Social Norns (N. Y. 1936) Ch. 7
G. H. Mead : Mind, Self and Society (Chicago 1934) Introduction by C. W. Morris
৬। P. Sorokin : Contemporary Social Theories (N. Y. 1928), ৭৩৯-৪০। সরোকিন তাঁর Social and Cultural Dynamics (4 Vols.) গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।
৭। G. Plekhanov : The Development of the Monist View of History (Moscow 1956), ২৭৬
৮। Plekhanov ; Op. Cit., ২৭৭
৯। Marx and Engels : Selected Works, Vol II (Moscow 1955), ৪০৪
১০। শাস্ত্রী : আত্মচরিত, ২১৮-১৯
১১। বিহারীলাল, ৫২৪
১২। Education Department Proceedings, October 1860, No. 53
১৩। K. Mannheim : Freedom, Power and Democratic Planning (London 1951), ২৩৩
১৪। Lewis, Mumford : The Culture of Cities (London 1944) ৪৩৫
১৫। Mumford ; Op. Cit., ৪৩৮

১। পদত্যাগের (সহকারী সম্পাদকের) কারণ ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তার 'কপি'।

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র।

২। বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের পর সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও পণ্ডিত যে আবেদনপত্র দাখিল করেছিলেন, তার 'কপি'।

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র।

৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকালে বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কারের যে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা হ্যালিডে মারফৎ শিক্ষাসংসদের কাছে দাখিল করেছিলেন, তার 'কপি'।

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র।

৪। বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন ও কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংসদের কাছে শিক্ষাবিষয়ে যে বিবৃতি পেশ করেছিলেন, তার 'কপি', সংসদের মন্তব্য, এবং বিদ্যাসাগরের শেষ পত্র।

আকর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের অপ্রকাশিত নথিপত্র।

৫। ১৮৬৬ সালে বহুবিবাহ-নিবারণ আইনপ্রণয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি আইনপ্রণয়নের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন। কমিটির রিপোর্টের সর্বশেষ 'প্যারা', অন্যান্য সদস্যদের এবং বিদ্যাসাগরের মতামত-সম্বলিত দুটি 'নোটের' 'কপি'।

আকর : লেজিসলেটিব ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিংস, মার্চ ১৮৬৭, নং ২৬।

No. 1. Source: *Unpublished Manuscript Records*
Sanskrit College, Calcutta.

To

Baboo Russomoy Dutt,
Secretary to the Sanscrit College.

Sir,

Agreeably to your instructions dated 21 April. I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.

I studied the Sanscrit Language and Literature in the Government Sanscrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive, I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods, but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step.

I was well aware of the causes which had conduced (?) to render the scholarship examination of 1845 so unsatisfactory and on my appointment in April 1846, I found all these causes existing in full vigor. There was no rule or method for securing the course of reading necessary for the Junior Scholarships. One of the subjects is Grammar but the students of the Kavya and Alankar classes (in the Junior Department) were almost, without exception, utterly unfit to stand the most superficial Examination on that subject. Again, Arithmetic is another of the subjects: but the scheme then existing did not admit any of the Junior Department to the Jyotish class, of course they failed in Arithmetic. The student of the Senior Department only were directed to study Jyotish; this branch formed no part of their examination. Consequently with very

few exceptions they paid no attention to this study. The badness of such an arrangement is self-evident. Again for Junior scholarship, it is necessary to make translations from Sanscrit into Vernacular and vice versa. But there were no proper arrangements for that constant and regular practice in these branches which is so absolutely... and Books fitted for the purpose were also entirely wanting. Again Kavya is another subject, but the late Professor, about for two years previously to his death which occured in May 1846, was quite unable from bodily infirmity to do justice to his class. He used to instruct three or four of his senior scholars and leave to them the duty of instructing the rest and the person whom he occasionally gave as a substitute sometimes for long periods was very deficient in the necessary qualifications. When I joined, the class was divided into 10 sections reading different lessons and such had been the state of things for a considerable period. These irregularities were no doubt the cause why the scholarship examination of the Junior class for 1845 was so unsatisfactory.

The students of the senior class have always been through the efforts of the Professors well trained in the two branches which ... the subjects of their immediate study viz, *Smriti* and *Nyaya*; but in the other subjects for a senior scholarship, viz, General Literature, Essays, and Translations, they were generally with a few exceptions found deficient owing to the want of an arrangement for regular practice in these points. In short, from the above and other similar reasons the instruction given fell far short of the objects proposed. Therefore the necessity of a complete revision of the system struck me forcibly on my first joining my appointment, but as it only wanted five months to the annual examination I determined then to confine my efforts to those points alone which were most immediately concerned. I consequently commenced daily to give to the Senior Department Bengali Papers to be translated into Sanscrit. In the *Cavya* and *Alankara* classes of

the Junior Department I . . . to revise daily a fixed portion of grammar and by threatening to degrade in to the grammar class those who were found deficient at examinations taken by me every fortnight, I induced them to pay so much attention to this subject as in a great degree to remove the deficiency in this subject as was apparent at the next examination. And as regards Jyotish I represented to you the state of thing and with your sanction directed the students of the *Cavya* and *Alankara* classes to attend at fixed times the instruction of the Jyotish Pundits, thereby providing in some degree against the deficiency in this respect. The 10 sections of the *Cavya* class were also with your sanction rearranged and reduced to three sections. The appointment of well qualified and deligent professor to this class about that time finally removed all the impediments to effecting study which had previously existed. In addition to all these, two months previous to the examination I put a stop by authority to all new lessons and caused all the students of the Institution to employ themselves solely in revising their former studies. In these two months the *Cavya* and *Alankara* classes went entirely through the two text books of general Literature in the Junior Scholarship examination viz, "Roughu Vansha and Kummar sambhava" and at the same time labored . . . at Translations, Arithmetic and Grammar. The Bengalee Books necessary for practising translation, I borrowed to the amount of about 50 copies from the College of Fort William and other sources and lent to the students. In all my efforts I was warmly supported by the able and zealous professors of these two classes and I felt confident that the next examination would show a marked improvement in the Junior Department. In the Senior Department the chief efforts were directed to remedy the deficiency of the students in the higher books of Poetry. A number of works were revised and to meet the want of Books I was again obliged to apply for copies of Magha and Bharavy to the College of Fort William and other sources before referred to. The deficiency on this

point was thus in a great degree provided for. But for want of leisure so much attention could not be spent to composition and translation. Thus from the day of my appointment I devoted all my energies to the object producing a marked improvement by the next examination and I had hoped that if such should prove to be the result that I should be thought deserving of approbation by my superiors. The Examination proved satisfactory and the Examiner reported favorably and I naturally looked for the praise, I thought I had deserved; but from your letter no 239 dated 4th January 1847 to the address of the Secretary of the Council of Education forwarding the Draft of your General Report, it is clear that you were not satisfied with the degree of commendation bestowed by the Examiner and in fact you considered his laudatory remarks on the progress of the students as altogether unfounded. My just hopes of commendation were thus atonce quashed; but I can boldly affirm and I appeal to all the professors and students that the means and efforts which I employed in the four or five months which preceded the Examination of 1846 and the zeal and diligence with which these were seconded by the other parties concerned have never been equalled since the scholarships were first instituted and this I will also venture to assert that if the former system had not undergone such serious alterations the Examination of 1846 would certainly have proved worse than that of 1845.

I cannot expect ... your approval of my conduct from your personal observation as your other heavy duties seldom allow of your visiting the college. I can therefore look only to the report of the Examiner, but this resource has been also cut off by the bad spirit in which you have received the favorable sentiments of that officer. It cannot however be denied that the method of instruction has in the course of the last year greatly changed for the better and that I have spared no exertions on my part in effecting this object. Every Pundit and student can bear testimony to these points. It must be inferred

that the state of the college as to instruction before my arrival and the changes introduced by me must both have been hidden from your knowledge. I would submit if a person receiving such a return for his disinterested exertions had not just cause to be dissatisfied and if he can be expected again to take so much trouble upon himself.

I now advert to a second subject in which my well meant endeavours have been similarly rewarded with disappointment. On my joining the college when I made provision for meeting the most pressing necessity of preparing the students for appearing with credit at the approaching examination, I cherished designs of a more..... I knew that a thorough and constant rearrangement of the whole system of study was necessary to develop and keep in permanent activity the resources of the Institution. Accordingly during the months of April, May and June, I watched and revolved in my mind the working of the whole system and when I was obliged by sickness to go home on leave for 3 weeks in July I took advantage of that leisure to commit my ideas and conclusions to writing. On my return I consulted.... five of the Pundits on the subject and obtained their entire approval of my Plan. It was also approved of by Major Marshall who recommended me to transmit it to you for submission to the Council of Education. Thus encouraged I put the plan in an official form into your hands requesting you to bring the matter atonce before the authorities, so that during the 3 weeks vacation then commencing from Durga Poojah the matter might be taken into consideration and the new scheme if approved of by the Council might be adopted when the College re-opened. You read the whole and observed there was no necessity to submit it to the Council as you could yourself adopt the new arrangements. After the vacation when I had often urged you to put in force the provisions of my new Plan you one day remarked that you felt at liberty to adopt the changes recommended on the subject of the Grammar classes but you are not empowered

to carry into effect the other proposals without the permission of the Council. On a subsequent day you came to the College with my plan in your hand and observed to me it would not be advisable to make any change without consulting the Council and that you would apply for their sanction to the new scheme as far as it regarded the Grammar classes. I suggested that as an application was to be made to the Council it might as well embrace the whole Plan, to which you replied that it was no use sending up so many subjects for consideration as they would not be attended to, not even read,—the members would take fright at such a voluminous document and it would therefore be better to bring it forward in separate portions. After all this the only report made by you on the subject was one dated 16th October 1846 embracing only the Grammar classes and even as regards them you omitted mention of 3 class. Books recommended by me which formed a prominent feature of the scheme and in fact without which one of the classes must be crippled and almost useless. Thus out of all my suggestions one only was submitted by you to the Council and that even in a mutilated form. All my other proposals have been treated as totally unworthy of consideration, but I nevertheless feel confident that each of them is calculated in no way to injure the college but on the contrary to promote its efficiency. Nay, I am enabled to say on the coinciding Judgement of others highly qualified to give an opinion that if my scheme or someother very similar be not substituted for the present defective system, the Institution will not fully answer its two purpose, namely of imparting Sanscrit Literature primarily and of teaching English secondarily. At any rate it is highly unsatisfactory to find my endeavours and labors frustrated without any due consideration of their merits.

There is another circumstance connected with this Report of mine justly calculated I think to cause me much dissatisfaction.

Major Marshall at the close of his report on the Scholarship examinations recommended to the Council to adopt the suggestions made by me which have so often been alluded to. On this in the Annual Report of the Sanscrit College for 1846-47 ... you remark: "The report referred to by Major Marshall was prepared by direction of and mostly from data furnished by the Secretary to the College by whom the chief recommendations contained in it which accorded with his expressed views have already been submitted to and approved of by the Council of Education and are contained in the introductory protion of this Report." 'Now I respectfully deny even having received from you any data for the Preparation of that report and the only thing in the shape of direction I can remember was your instruction to devise a plan for reducing the number of sections in each class and introducing ..... into the Grammar Classes. As to my chief recommendations,' having been submitted to and approved of by the Council' that is briefly answered by refering to what has been shown before, namely that out of the numerous subjects referred to in my long report only part of one has been thought by you worthy to be laid before superior authority.

From the length to which this paper extended I must bring it to a close, but I shall always be ready to meet any proper enquiry into the subjects mentioned. I think I have brought forward sufficient to show that my labors have not met and are not likely to meet with due appreciation and this is the ground of my resignation.

I studied 12 years and 5 months in the Sanscrit College with some distinction. I was the next 5 years Head Pundit of the College of Fort William, during which period my time was also wholly devoted to Sanscrit studies, and my assistance was every year required by Major Marshall for preparing questions for the Sanscrit College Scholarship Examinations as for Examining the Replies given in. In giving up that appointment for my present one. I was elevated by the hope

that I was entering on a sphere where my acquirements in Sanscrit Literature added to my long experience in the affairs of the Sanscrit College would prove of great benefit but as I have already stated I consider my expectation to have been frustrated.

One point affecting the credit and comfort of the College I had almost omitted. I allude to the privilege assumed by the Principal of the Hindu College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his own students at particular Examination for 3 or 4 days together. Some of our students are obliged to sit on the ground and it must be remmebered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interference, yet you do not appear to have taken any such steps either because you approve of such conduct or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sit on stools. Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful.

I have thus stated some of the principal reasons for tendering my resignation. The assigning of such reason in detail did not appear to me to be at all necessary; but in compliance with your especial requests I have frankly submitted them.

I must therefore . . . that allowances will kindly be made for any expressions which may carry an appearance of undue freedom.

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant
Ishwar chandra Sharma.
Assistant Secretary, Sanscrit College.

Sanscrit College.
3rd May, 1847.

No. 2. Source: *Unpublished Manuscript Records*
Sanskrit College, Calcutta.

To

Babu Russomoy Dutt,
Secretary to the Sanskrit College.

The Memorial of the Pundits and Teachers of the Sanskrit College.

Respectfully Sheweth

That your memorialists beg to express their sincere regret at learning that Essur Chandra Biddasagore, Assistant Secretary to the Sanscrit College, has for reasons unknown to them resigned his situation as they are really afraid that his resignation at a time when the college is, as it were being altogether remodelled, will prove very much prejudicial to its true interests.

The Assistant Secretary by his personal abilities, and industrious habits, and zeal in the welfare of the College, has as is already known to you, introduced several beneficial changes and proposed such salutary innovations in the system of Education hitherto pursued there, as your memorialists expect, will soon place that Institution on a very solid efficient footing. Your memorialists are of opinion that the appointment of the said Bidya Sagore does great credit to your judgement, who determined on the last occasion of filling up the vacant ... of your assistant upon nominating one, intimately acquainted with the sanskrit and tolerably versed in the English language as they believe that the Assistant Secretary has been in a great measure enabled by the above qualifications to plan the revised system already noticed. Under these circumstances your memorialists cannot but be sorry that he has tendered his resignation and they sincerely trust as his loss cannot easily be supplied that you will be pleased to adopt such measure as will induce Essur Chunder to continue his

services at the college which will no doubt be greatly conducive to the prosperity of our Institution.

In conclusion your memorialists beg to state for your information that the resignation referred to, being tendered to the Secretary to the Council of Education your memorialists have with a view to prevent delay, presented a similar memorial to Dr. Mouat in the hope that he may not take hasty steps to accept the resignation of an office, who might otherwise be induced to continue his services to the college if not for his own, atleast for the interest of the institution which he was appointed to look over.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray:

Sanskrit College,
10th April 1847.

শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য
„ জয়নারায়ণ শর্ম্মনং
„ ভারতচন্দ্র „
„ দ্বারকানাথ „
„ রামগোবিন্দ „
„ প্রাণকৃষ্ণ „
„ তারানাথ „
„ মদনমোহন „
„ প্রেমচন্দ্র „
„ গিরীশচন্দ্র „
„ যোগধ্যান্ „
Russick lull Sen
Shama churun Sircar

No. 3. SOURCE: *Unpublished Manuscript Records*
Sanskrit College, Calcutta.

'NOTES' ON THE SANSCRIT COLLEGE.

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.
2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.
3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English language and literature.
4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make sanscrit their afterstudy, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.
5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.
6. Our next question is what sort of Instruction in the Sanscrit College is necessary for the purpose?
7. The students of the Sanscrit College should be thoroughly instructed in Grammar and Literature—the latter including poems, dramas and prose works.
8. In Rhetoric, they should be instructed in two or three capital works, such as Kavya Prakasha....and two or three chapters of Sahitya Darpana.
9. The study of these, that is Grammar, Literature and Rhe-

toric will enable the student to acquire a complete mastery of the Sanscrit Language.

10. In Law they should study the following works: The Institutes of Manu, Metakshara Sec. II Vivada.....Dayabhaga Duttakamimunsa and Duttakachundrika. The study of these is sufficient to make one conversant with the Hindu Laws current in almost every part of India.

11. In mathematics, Lilavati and Vijaganita are the text books. Lilavati treats of arithmetic and mensuration and Vijaganita of Algebra. These two works are very meagre and from a curious perversion of Ingenuity and obsessed of a right sense of real value and object of such studies, the author has made them so difficult by putting the rules and questions all in verse that the students cannot go through them in less than three or four years. The examples are very few. The fact is, the study of Sanscrit-mathematics is not only nearly useless in itself, but it interferes largely with other studies and engrosses a great deal of time and labor which might be employed in far more useful pursuits.

12. Hence the study of mathematics in Sanscrit should be discontinued.

13. It is not to be understood from this that I undervalue a knowledge of Mathematics as an essential element of a complete education. Far from it. I wish to substitute the pursuit of it in English, whence in less than half the time now given to it an intelligent student will acquire more than double the amount of sound information that he could obtain by the most perfect acquaintance of all that exists in the Sanscrit language in the subject.

14. There are six prominent schools in Hindu Philosophy namely Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Patanjala, Vedanta and Mimansa. The Nyaya system of Philosophy principally treats of Logic and Metaphysics and occasionally touches upon subjects of Chemistry, Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less to the other systems respecting

Mimansa and Patanjala which treat, the former of religious ceremonies and the latter of abstract contemplation of the Deity.

15. As to the utility of the study of these in a college course I should quote the words of my report dated the 16th., December 1850.

16. 'True it is that the most part of the Hindu system of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. By the time that the students come to the Darshana or Philosophy class their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have ampler opportunity of comparing the System of Philosophy of their own, with the new Philosophy of Western World. Youngmen thus educated will be letter able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of philosophy in India is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other and have pointed out each others errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

17. Another advantage is, that students so prepared, wishing to transfer the philosophy of the West into a native dress will possess a stock of technical word, already in some degree familiar to intelligent natives.

18. A profound knowledge of these is not required. It will suffice if the students go through these works. In Nyaya, Aphorisms of Gotama and Kussumanjali; in Vaisheshika, Aphorisms of Kanada; in Sankhya, Aphorisms of Kapila and Tutta Koumudi; in Patanjala, Aphorisms of Patanjala; in

Vedanta the Vedantasara and the I & II Books of the Aphorisms of Vyasa; in Mimansa, Aphorism of Jaimini. In addition to this the students should read the Sarbadarshana Sangraha being review of all the Systems of Philosophy presented in India. The study of these works will make one familiar with Hindu Philosophy without much loss of time.

19. The students of the Sanscrit College while they are in the Grammar and Literature classes should direct their attention principally to Sanscrit studies devoting two thirds of the time to the Sanscrit and one third to the English. When they are in the Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two thirds of the time to this important branch of Education.

20. At present the following are the subjects for the Senior Scholarship Examination in the Sanscrit College; Literature, Rhetoric, Mathematics, Law and Philosophy, Sanscrit Prose, Essays. These should be modified, Literature and Rhetoric should form our subject. Mathematics in Sanscrit and Sanscrit Essays should be dispensed with and in their stead three branches in English namely, History, Mathematics and Natural Philosophy should form each a subject of Senior Scholarship Examination in the Sanscrit College. Moral and Mental Philosophy, Logic and Political Economy should form also subjects of the same examination being in turn selected every succeeding year.

21. The English Department consisting of two teachers is quite inadequate to fulfil the object in contemplation. Moreover the present teachers are not sufficiently familiar with Mathematics and Natural Philosophy. I am fully convinced that they are not the class of teachers which the necessities of the Sanscrit College absolutely requires. They would do well if transferred to other Institutions where they will not be required to teach more than the elementary portions of an educational course.

22. This Department should therefore be remodelled and

made to consist of four effecient teachers with salaries of Rupees 100, 90, 60, and 50 respectively. With these remunerations the services of good teachers may be secured. This arrangement requires 300 Rupees per mensem for the English Department.

23. By the discontinuance of the Sanscrit Mathematics class and the transfer of the two present teachers there will be a saving of 250 Rupees per month, the remaining 50 Rupees should be supplied from the funds appropriated to the Institution which are Rupees 24,000 per annum and out of which only 19,000 and some odd hundreds are at present expended.

24. But if the state of the Education funds would not at present in anyway admit of this additional expense, the demand may be supplied in other ways. There are at present two writers who copy manuscripts, one in Bengali and one in Nagree, each receiving 16 Rs. per mensem. The manuscripts which they copy are quite useless. Manuscripts are generally very incorrect, and every time they are copied the mistakes and omissions get at least doubled. Thus manuscripts copied by mere copyists become almost unintelligible. Besides, the two writers employed in the Sanscrit College can copy in one month little more than 5 or 6 Rupees work while they draw 32 Rupees per mensem. Their services therefore should be dispensed with and the 32 Rupees will be saved. There is a Junior Scholarship of 8 Rupees per month alloted to the English Department. If History and other branches alluded to before be added to the Senior Scholarship Examination, there will be no use of allotting a separate scholarship for the English Department and the 8 Rs. thus saved together with the 32 Rs. saved by dispensing with the services of the two writers raises the amount to Rs. 40 per month. So only 10 Rs. will be required to be paid from the appropriated funds.

25. When I joined the Institution at the end of 1850 the views which I entertained respecting the course of studies to

be adopted in the Sanscrit College I submitted to the Council of Education in report on the Institution. Since that time experience has made me modify my views on some few points. This will explain why these notes disagree in a few particulars with my report.

26. It appears to me that unless the Sanscrit College be re-modelled according to the principles now stated, there exists no prospect of material improvement or of fully carrying out the objects of the Institution.

|Sd| Eshwar Chunder Sarma.
12th. April, 1852.

The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanscrit College at my request.

It is the result of several consultations I have held with the Principal and I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration.

|Sd| Halliday.
30th June, 1852.

No. 4. SOURCE: *Council of Education:* Copies of Correspondence between the Council of Education and the Principal of the Sanskrit College, Benares, 1853. (Education Dept. Records, Govt. of West Bengal).

(A)

From

James R. Ballantyne,
Principal of the Benares College.

To

The Secretary of the Council of Education,
Calcutta.

Sir,

I have the honor to forward for submission to the Council of Education, the following observations suggested by

the visit which I have paid to the Calcutta Sanscrit College, by invitation of the Council, and under the sanction of the Government of the North West Provinces.

2. From my personal intercourse with the accomplished Principal, Pundit Eswar Chender Vidyasagur, I have derived the gratification which I was led to anticipate both by his reputation and by his report on the College, on which the Council some time ago, did me the honor to request my opinion.

3. With the arrangement of the classes in the Sanscrit College, and with the apparent zeal both of teachers and pupils, I have been much pleased. The course of studies (if the appliances of the institution suffice for its being completely carried out) is very full, especially in the English division of the course. On some points of detail in regard to the selection of class books I may have occasion to offer remarks in the sequel. Leaving out of consideration here various topics on which I shall hope to have opportunities of consulting with Pundit Iswar Chender by letter, I address myself to the question which I conceive the Council to have proposed to me, Vizt. is there anything in the working of the Calcutta Sanscrit College, or of the Benares Sanscrit College, which might be advantageously adopted by the one from the other? To reply briefly, I think there is, in both although in consequence of the difference of local circumstances, the two institutions may still judiciously be left to differ in several respects. The bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom, and uniformity is dearly purchased when purchased by the sacrifice of more serious interests.

4. A noticeable source of distinction between the two Institutions is the fact that the Benares Sanscrit College contains no Bengalis, while the Calcutta College contains nothing else. To prevent misconception here|a misconception which has been sometimes turned to mischievous account|it may be observed that it is the Sanscrit College of Benares, that is spoken of not the English School associated with it under the same

roof. The English school is indeed mainly recruited by Bengalis, but the application of a Bengali for admission into the Sanscrit College of Benares is a thing scarcely known. The Bengalis who are students of Sanscrit College, participating in the general desire for the acquisition of English, which they see in those around them may advantageously be introduced to the study of English at that point, in the course which Pundit Eswar Chunder has fixed upon. It does not follow that the same arrangement would work well at Benares. To supply instruction to him who craves it and to force instruction on him who does not seek it, are very different things. At the same time I quite approve of its being compulsory, as it is now is in the Calcutta Sanscrit College, to begin English at the stated date, whether the pupil feel inclined to it or not, this arrangement being rendered indispensible by the system of class teaching, the introduction of which, into the Calcutta Sanscrit College has been effected by its present Principal. On the advantage of the class system, in enabling the same teacher to take charge of a very much greater number of pupils, it is unnecessary to dwell. Of the difficulties in the way of adopting the system, to the same extent, at Benares, this is not the occasion to speak. It may suffice here to remark that the Bengali boys are in general more plaint (?) than those of the Upper Provinces, and that Calcutta is so far inoculated with Anglican feeling, consciously or unconsciously, that an argument from Calcutta to the Upper Provinces is very apt to mislead. This holds also conversely and therefore I would offer any suggestion, for the imitation of either College by the other, under this express proviso, that regard be had to the different circumstances of the two places.—

5. Holding, then generally, that the Sanscrit course, in the Calcutta Sanscrit College, is a good one and also|with a competent staff of teachers|the English course, I yet desiderate sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that "truth is

double". This danger is no chimerical one. To take an example, I am acquainted with Brahmins who, being well versed in Sanscrit Literature and also familiar with English, are aware that the European theory of Logic is correct, and also the Hindoo theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other.. If this be the case with the very best of those who have studied both Sanscrit and English independently, it is not likely that the case will be different with the general run of pupils similarly trained. One reason why this is to be regretted, is that men so educated cannot satisfactorily communicate to their educated fellow countrymen who are unacquainted with English much of that valuable knowledge which they themselves have gained through the English. They cannot show that our English sciences are really developments and expansions of truths the germs of which the Sanscrit systems contain, and therefore, to the mind of their hearers those valued germs appear to be ignored by or opposed to, English Science, when they might easily be shown to be involved in it. It is unnecessary to dwell longer upon this consideration, because the very constitution of the present Sanscrit College, with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe, and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance & conciliating acceptance, for the advancing science of Europe by showing that European Science recognises all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation.

6. With the view of determining what points in the Hindu system corresponded with points in European science, some years ago I took up the system called the *Nyaya*, and (in a work now partly printed in Sanscrit and English, under the title of "Synopsis of Sciences"|I showed the points, in that

comprehensive system, from which our various sciences branch out—some portions of this work I have read and discussed with Pundit Iswar Chunder, in company with one of my coadjutors, Pundit Vethala Sastri of the Benares College. Pundit Iswar Chunder promises to introduce it to the Notice of his classes, and to communicate to me by letter any doubts or difficulties that may arise in the course of the study, so that the crudenesses incidental to a first attempt of such a kind may be gradually eliminated in due time. The next Volume will commence with the theory of Inductive Investigation. In dealing with this important branch I hope to enjoy the advantage of Iswar Chunder's co-operation. I observe that he places in his list Mill's great work on the subject.—As introductory to the perusal of that work I have prepared an abstract of it, in which I have traced, to some extent, the correspondence between its technical terminology and that of the Nyaya system in its treatment of the same topics. This abstract (printed by order of Govt. N.W.P.) being from its price &ca. more suitable for a class-book than the entire work, I propose its adoption into the course. At the annual examinations, I should be glad to supply questions, on this and other works here suggested, the replies to which might not only furnish evidence as to the progress of the pupils, but might be so contrived as to lead to a still more complete determination of the way in which the mind of the native literate might be best conciliated to Baconian speculations.—
7. Besides the Nyaya system, there are two other systems taught in the college, Vizt. the *Sankhya* and the *Vedanta*, a text book of each of the three has been printed, with English Version and Notes, for the use of the Benares College—This might with equal advantage be read in the Sanscrit College here, and the criticism both of the pupils and of the teachers might here also lead to a more complete determination of the precise relation between the philosophical nomenclature of India and of Europe. As there is much in the two systems

last named that finds its counterpart in the speculations of Bishop Berkeley, I have reprinted Berkeley's "Inquiry", with a commentary indicative of these correspondences; I should like that the acuteness of the Calcutta Sanscrit College should be brought to bear upon this exposition also. Where speculation, in countries so widely separated as India and Europe, has arrived at similar or indentical conclusions, the conviction of the fact should naturally tend to beget mutual respect; and mutual respect must naturally tend to facilitate the reception, by the less advanced nation, of the science and philosophy of the more advanced one.—

8. In offering these remarks and suggestions, I have had in view almost exclusively the desirableness of bridging the chasm between the Sanscrit and the English—between the learning of India and the Science of England; because the endeavour to bridge the chasm is what peculiarizes the measures introduced, within the last few years, into the Benares College, and it was this peculiarity (if I mistake not) that attracted the attention of the Council—Pundit Iswar Chunder is perfectly competent to work the same system, and to aid me in improving it. As the Sanscrit College at present stands, there is a good Sanscrit course, and a good English course, but the pupil is left to determine for himself whether the Principles inculcated in these correspond to one another, or altogether conflict, or correspond partly and if so how far. The pupil, left to determine this for himself does not, as we have seen, determine it satisfactorily at all and therefore|not in the way of substitution for any part of the established course, but as an additional feature necessary to the completion of the design|. I have suggested the employment of the treatises abovementioned.—

9. If the general principles of this report obtain the approval of the Council as I have reason to believe they have the concurrence of the intelligent Iswar Chunder. I shall co-operate with him most gladly in the endeavour to complete the

arrangements for such a course of Anglo-Sanscrit Education as shall raise up successive bands of men qualified thoroughly to interpret the mind of Europe to that of India; for this is indeed the great end of such an institution as we may hope for in the Sanscrit College.—

I have &ca.
|Sd.| James R. Ballantyne
Principal of the Govt. College Benares.

|True Copy.|
Sd|- F. Mouat
Secry. Council of Edut.

(B)

From
The Principal of the Sanscrit College,
To
F. I. Mouat Esqr., M.D.,
Secry. to the Council of Educn.
Dated Fort William 7 Sepr. 1853.

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter No. 1494 dated 29th Ultimo enclosing Report on this Institution from Dr. Ballantyne, Principal of the Government College, Benares and requesting me to report upon the same.—

2. In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately introduced into this Institution have met with the entire approbation of a man of Dr. Ballantyne's talents and abilities.—

3. With regard to the adoption of class Books recommended by Dr. Ballantyne I regret to say I cannot agree with him on all points. He appears to recommend the adoption of his Abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Under the present state of things the study of Mill's work in the

Sanscrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyn's principal reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit of purchasing standard works at high prices, so we need not to be deterred from the adoption of this great work; on that consideration Dr. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, "as introductory to the perusal of that work". But the great author himself, in his preface, strongly recommends Arch-Bishop Whatley's treatise on Logic as the best introduction to his work. I therefore leave the matter to the decision of the Council. Dr. Ballantyne also recommends to adopt as class Books three text books of each of the three systems of Philosophy,—Vedanta, Nyaya, and Sankhya, printed with the English Versions and notes. Of these the "Vedantasara", text book on Vedanta, is already a class book here and its version in English might be read with advantage. The two other text books recommended by him, the "Tarkasangraha", the text book on Nyaya, and the "Sattwasamasa", that on the Sankhya, are very poor treatises in their own departments. We have better treatises in our Curriculum. With regard to Bishop Berkeley's Inquiry I beg leave to remark that the introduction of it as a class book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankya in the Sanscrit College. That the Vedanta (*sic!*) the Vedanta and Sankya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute. These systems false as they are, command unbounded reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanscrit course, we should oppose them by sound Philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's Inquiry, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of Philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the

perusal of that book, the Hindu Students of Sanscrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta system are corroborated by a Philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase instead of being diminished. Under these circumstances I regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley's work as a class-book.—

4. I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanscrit & English Courses in the Calcutta Sanscrit College are good and yet desiderates sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that "truth is double". "This danger," says Dr. Ballantyne "is no chimerical one", "To take an example" he continues "I am acquainted with Brahmins who being well versed in Sanscrit Literature and also familiar with English, are aware that the European theory of Logic is correct, and also the Hindu Theory, while at the same time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the others" I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanscrit sciences and literatures. Truth is truth if properly perceived. To believe that "truth is double" is but the effect of an imperfect perception of truth itself, the effect which I am sure to see removed by the improved courses of studies we have adopted at this Institution. It must be considered as a singular circumstance if an intelligent student cannot perceive identity of truths where there is real identity. Suppose students read Logic or any other department of Science or Philosophy both in Sanscrit and English. If they be found to assert, "that the European Theory of Logic is correct and also the Hindu Theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the

language of the other", the hearer is naturally led to conclude that either they could not comprehend the subject with sufficient clearness or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed however that there are many passages in Hindu Philosophy which can not be rendered into English with ease and sufficient intelligibility only because there is nothing substantial in them.

5. I further beg leave to state that I regret I cannot but differ a little from Dr. Ballantyne when he observes "that the very constitution of the present Sanscrit College with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance, and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by shewing that European Science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation." It is not possible in all cases I fear that we shall be able to shew real agreement between European Science and Hindu Shastras—Even if we take it for granted that we shall be able to point out agreement between the two, it appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe. They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakeable. Any idea when brought to their notice either in the form of a new truth or in the form of the expansion of truths the germs of which their Shastras contain they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to their old prejudices. To characterize them as a class I can do no better than quote the words of Omar. When Amru, the Arab General, the Conquerer of Alexandria wrote to Omar about the disposal of the Alexandrian Library, the Caliph replied, "The contents of those books are in con-

formity with the Koran or they are not. If they are, the Koran is sufficient without them; if they are not, they are pernicious. Let them therefore be destroyed." The bigotry of the learned of India, I am ashamed to state is not in the least inferior to that of the Arab. They believe that their Shastras have all emanated from Omniscient Rishis and therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversation any new truth advanced by European Science is presented before them, they laugh and redicule.— Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, sepecially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a Scientific truth, the germs of which may be traced out in their Shastras, instead of shewing any regard for that truth, they triumph and the superstitious regard for their own Shastras is redoubled. From these considerations, I regret to say that I cannot persuade myself to believe that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths. Dr. Ballantyne's views may be successfully carried out in the North West Provinces where his experience has made him arrive at his conclusions with regard to the learned of India.—

6. But in Bengal the case is very different. His remarks that "regard be had to the different circumstances of the two places" and that "the bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom" are very judicious. The local circumstances of this part of India compel us to pursue a different course for the dissemination of sound knowledge. I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at all interfere with the learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining

their former ascedancy. To whatever part of Bengal is the influence of education extending, there the learned of the country are losing their ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of Colleges and Schools in different parts of the country has taught us what we can do, without attempting to reconcile the learned of the Country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of *our* Sanscrit College should be directed. That the students of our Sanscrit College, when they shall have finished their College course will prove themselves men of this stamp we have every reason to hope. Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanscrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt. If the contemplated new organization of the English department be sanctioned there is every probability of their being able to attain considerable proficiency in the English language and Literature and thereby acquire a considerable amount of useful information. It is very gratifying to observe that they have lately began to think in such a way as to promise that hereafter every qualified student will be found free from all the prejudices of his countrymen. As a specimen of what may be expected from the Sanscrit College here, I beg leave to enclose herein an English translation of a Bengali Essay of the past Session by a senior student of this

Institution who has still about three years to finish his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature.—

7th. In conclusion I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the Council with great confidence that the Sanscrit College will become a seat of pure and profound Sanscrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.

8th. The Report of Dr. Ballantyne in original which accompanied your communication is returned herewith.—

|Signed| Eshwar Chunder Sharma
Principal Sanscrit College.

(C)

Extract from the *Proceedings of the Council of Education* dated 14th September 1853.

No. XXI.

Read letter from Dr. Ballantyne submitting observations on the Sanscrit College of Calcutta suggested by his visit to the institution at the invitation of the Council and under the sanction of the Government, North West Provinces.—

Read letter from Pundit Iswar Chunder Vidyasagar Principal of the Sanscrit College, No. 901 dated 7th September submitting his report on the above.—

Ordered. That the Council are gratified to find that Dr. Ballantyne reports generally so favorably on the present course of instruction and state of progress in the Sanscrit College, and that the Principal of the College be informed that he will be expected by the Council to continue that course, the success of which must however obviously depend on the com-

petency of the Teachers employed to give instruction in the most advanced works of Mental philosophy by English as well as by Sanscrit authors; that for the attainment of such success, the Council relies mainly on the great zeal and ability of the Principal himself and that they would at the same time desire the Principal freely to avail himself of the Abstracts and Treatises compiled by Dr. Ballantyne the use of which must be in the highest degree valuable in explanation and illustration of the subjects of his own Lectures and those of the Instructors under him; all students of these subjects would indeed in the opinion of the Council derive essential and form a familiarity with Dr. Ballantyne's works. The Principal will, also, be in frequent communication with Dr. Ballantyne on the progress of his classes, and the Council would wish to see a free interchange of suggestions between the Heads of the two important Institutions at Benares and in Calcutta with a view to the continuing improvement of their several courses of instruction and to the establishment as far as possible of a common terminology in the rendering from English into Sanscrit or vice versa of the original expressions, in use in each language respectively, in the exposition or discussion of Philosophical subjects.—

No. 1437

Copy forwarded to the Principal, Sanscrit College for information.—

By order

The 22nd Sep. 1853. Sd|- F. Mouat
Secry. Co. of Ed.

(D)

My dear Sir,

After the most attentive consideration of the orders of the Council in reference to Dr. Ballantyne's report on the Sanscrit College I feel compelled to inform you that those

orders if carried out in their integrity will involve a degree of interference with the scheme of study lately adopted by me with the sanction of the Council that will not only make my position in the College somewhat unpleasant but will tend I am convinced to impair the usefulness of the Institution itself.—

In the hurry and bustle of closing the College and of preparing to go home, I am unable to write officially on the subject. But before I leave Calcutta I am anxious to state to you briefly some of the more important objections to the carrying out of Dr. Ballantyne's plan which have occurred to me.

For the present at least I am unwillingly (sic) to mix up with the discussion of an important matter any question of a personal character in being forced to adopt a plan of study which I cannot approve of or in being obliged to communicate to a fellow Principal in the same position in the service with myself on the progress of my classes, conditions which I suspect few educated Englishmen will be found to submit to. Waiving such personal considerations I will come at once to the real question at issue.—

Dr. Ballantyne's suggestions seem to me to be based upon the assertion that without their adoption the danger of the Anglo-Sanscrit scholar being a follower of "double truth" cannot be avoided. I will not pretend to question the Doctor's experience among his learned friends at Benares. But of this I am certain that not a single instance can be pointed out in Bengal of any sensible man who has studied English as well as Sanscrit being persuaded that "truth is double".

Leave me to teach Sanscrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled if supported and encouraged by the Council to furnish you with a body of young men who

will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the Educated clever of any of your Colleges whether English or oriental. To enable me to carry out this great, this darling object of my wishes I *must* (excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered, so far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises such for instance as his excellent Edition of the Novum Organan in English, I will avail myself of them most readily and cheerfully. But if compelled to adopt all his compilations without any reference to my own humble judgement as to their utility and value or to their adaptation to the peculiar wants of the Institution over which I have the honor to preside, my occupation is gone—such a system would break in upon and interrupt my own plan of instruction and in spite of my sense of duty as a servant of the Council the responsibility which I now keenly feel will be assuredly weakened if not destroyed.

I hope these hints somewhat ramblingly and hastily thrown out, will receive the kind and indulgent consideration of the Council so as to induce them to modify their Resolution of the 14th Ultimo so far as not to make the course of study in the Sanscrit College a compulsory one.—

If required I shall be happy to send in an official and consequently a more formal letter on the subject after the termination of the holidays.—

I remain,
My dear Sir
Yours Very truely
Sd|- Eswar Chunder Surma
the 5th Octr., 1853.

F. J. Mouat Esq., M. Dn.

No. 5.

Report of the Committee appointed in 1866 by the Government of Bengal to Report on the necessity of Legislative measure on the Subject of Polygamy among the Hindoos.

SOURCE: *Legislative Department Proceedings, March 1867,* No. 26 Concluding Paragraph:

On these considerations, we find that it is not in our power to suggest the enactment of any Declaratory Law, neither can we think of any legislative measure that under the restricted instructions given for our guidance, will suffice for the suppression of the abuses of the system of polygamy as practised by the Koolin Brahmins, and we beg to report to that effect.

C. P. Hobhouse.
H. T. Prinsep.
Sutto Churn Ghosal.
Ishwar Chandra Surma.
Ramanauth Tagore.
Joykissen Mookerjee.
Degumber Mitter.

While subscribing to the report generally, we deem it due to record our opinion separately on the following points:-

1.— It is stated in page 6, Clause 4. that among other evils, of Koolin Polygamy the "number of wives is often as many as 15, 20, and 80." Whatever might have been the case in times gone by we can distinctly state that it is not so now. The rapid spread of education and enlightened ideas as well as the growth of a healthy public opinion on social matters among the people of Bengal has so sensibly affected this custom that the marrying of more than one wife, except in cases of absolute necessity, has come to be looked upon with general reprobation. Even among Bhongo Koolins of the 1st and 2nd class, the number of wives nowadays seldom exceeds four or five except in very rare instances, but there is ample reason to believe that this class of people will settle into a monogamous habit like the other classes of the community,

as education will become more general among them and the force of social opinion be more widely felt.

2.— From the report it will appear that polygamy, as an institution, is confined to a certain class of Rarhi Koolins called Bhongo of the 1st and 2nd order and that at present the practice even amongst them obtain in a much more mitigated form than a few years before. We need not notice that the number comprised in that class forms but a fraction of the population of Bengal; the catalogue of crimes, must it can be easily imagined, be infinitesimally small, so far as the same are traceable to polygamy as their immediate cause. However much we deprecate polygamy and lament its abuse we cannot still conceal from ourselves the fact that the evils which are plausibly enough inferred as inseparably associated with it are not wholly ascribable to it. They are seen to exist in full force even where polygamy is not known or is considered a crime, and would appear to be simply the natural consequence of an imperfect knowledge of social laws not confined to India alone. A legislative enactment, however stringent and rigidly enforced, might be effectual in diverting those evils from their original course, but it is quite powerless to stop the source from which they take their rise.

3.— Our countrymen are already awakened to a proper sense of the duties which they owe to themselves and to their offspring to be swayed by those considerations which rendered polygamy at one time an unavoidable necessity. We are accordingly of opinion that this question may, without injury to public morals, be left for settlement to the good sense and judgment of the people. The Government cannot directly interfere with it without producing serious harm in diverse ways. All that it can and ought to do is to assist in the spread of that enlightenment which has already so much advanced the desired reform.

Some explanation is due from Baboo Joykissen Mookerjee, who had signed the petition, praying for a law for restricting the practice of polygamy. He desire (?) to intiated about

ten years ago, he was strongly in favour of it from a belief that the evils flowing from it would not be rooted out without the force of law, and when it was revived last year, he also gave his adhesion. But he is now satisfied by enquiries instituted by himself, as well as from representations made to him by others, that a remarkable change in the opinion of his countrymen has, within the last few years, taken place on this subject that with other signs of social progress not the least is that which marks with strong disapprobation the old custom of taking a plurality of wives as a means of a man's subsistence, and that it would consequently be in accord with the true interests of morality as well as of the cause of improvement for the State to abstain from interfering in the matter.

Ramanauth Tagore.
Joykissen Mookerjee.
Degumber Mitra.

Calcutta
the 1st February 1867.

I sign this report with the following reservations:—

I am of opinion that the evils alluded to in pages 434-5 are not "greatly exaggerated," and that the decrease of these evils is not sufficient to do away with the necessity of legislation.

I would translate the term "speaking unkindly" in page 458 to mean "habitually abusing" and the term "mischievous" to mean "exceedingly cruel."

I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be passed without interfering with that liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage.

Ishwar Chandra Surma
(Vidyasagar.)

The 22nd January 1867.